পবিত্র কোরআন বোধ
শেখ নাসীর আহমদ

পবিত্র কোরআন বোধ

(সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কোরআন বোঝার সহজতম গ্রন্থ)

সূরা বাকারা
বা
গোকুল বনাম মনুষ্যকুল

শেখ নাসীর আহমদ

Scanned with CamScanner

সূরা বাকারা বা গোকুল বনাম মনুষ্যকুল

শেখ নাসীর আহমদ

প্রকাশক

সত্য-সাধনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
কাজী কামরুজ্জামান
গ্রাম ও পোঃ - সমরুক
জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৬

প্রকাশ কাল :

২৭ শে রমযান- ১৪২১ হিজরী
৯-ম বাবরীসন,
২৪ শে ডিসেম্বর' ২০০০

প্রচ্ছদ :

মুজতবা আল্ মামুন

অক্ষর বিন্যাস :

GATI LASER PRINT
30/H/5, Alimuddin Street
CAL-16. Ph. 226 1649.

মূল্য : মাত্র ৭৫ টাকা।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

১. পবিত্র কোরআন ও দলিত সমাজ
২. মুসলমানদের বাঁচার পথ
৩. আর্য রহস্য
৪. ধ্বংসের পথে ভারত
৫. কবি ইকবাল ও শেকওয়া
৬. দেশবন্ধুর পথ
৭. কোরআনে বৈদিক সমাজ
৮. নজরুল কাব্যে ইসলাম
৯. বেজিং সম্মেলন ও নারীসমাজ
১০. কোরআনে বোধিবৃক্ষ

✪ নাসীর সাহেবের পরবর্তী গবেষণালব্ধ ফসল "রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইকবাল"। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে এক সভায় আল্লামা ইকবাল এক ভাষণ দিয়েছিলেন, ভারতের নির্যাতিত মানুষের, বিশেষ করে মুসলমানদের দুর্দিন লক্ষ্য করে। তিনি তাঁর এই মহামূল্যবান ভাষণে মুসলমানদের সঠিক রাজনৈতিক পথ নির্দেশ করেন। আজ পর্যন্ত যা কোন মনীষী করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই রাজনৈতিক বক্তব্যের উপর জ্ঞান-গর্ভ ও সময়োপযোগীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক।

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও যিনি "পবিত্র কোরআন বোধ" — এর মত মূল্যবান বই - তাঁরই মাসে (রমযান) প্রকাশ করার তৌফিক দান করেছেন। এ-পার বাংলার খ্যাতনামা পণ্ডিত মহলে যাঁর খ্যাতি অপ্রতিরোধ্য। তিনি হলেন জনাব নাসীর আহমদ সাহেব। ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক হিসাবে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগণ্য। বাংলার এই সন্তান ভারতের সমাজকে দেখেছেন অতি কাছ থেকে। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উপর চালিয়েছেন নিরলস গবেষণা। ভারতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব হল আর্য কর্তৃক অনার্যদের উৎখাতের দ্বন্দ্ব। কোরআনের আলোকে তিনি এই দ্বন্দ্বকে এমনভাবে দেখিয়েছেন, যা অন্য কেউ দেখিয়েছে বলে মনে হয় না। যার ফলে এর তাৎপর্য মুসলমান, অমুসলমান, সাধারণ শিক্ষিত সমাজ সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। সেই সংগে বিশ্ব-ইতিহাসের আর্যগোষ্ঠীর এক্‌স-রে (X-ray) করেছেন। আর্য-সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস প্রসারের এক অনবদ্য চিত্র তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। ভাষার বিকৃতি আর্য-চরিত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। শব্দগত অর্থের পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা মূল ভাষার মৃত্যু ঘটিয়েছে, তারও রহস্য উম্মোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে, যা সংস্কৃতিমনা পাঠক, জ্ঞান-সন্ধানী সাহিত্যিকদের ক্ষুধা মিটাতে সাহায্য করবে।

বাংলা-ভাষী নাসীর সাহেবের রচনা বাংলা-ভাষায় হলেও, তাঁর চিন্তা চেতনার মান আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের। আর্য-দর্শন, অনার্য-দশন, এবং ইসলামী-দর্শনের পণ্ডিত নাসীর সাহেব জ্ঞানী মহলকে করেছে সমৃদ্ধ, সাধারণ মানুষ তথা জাতিকে তাদের দুর্দিনে দেখিয়েছেন সঠিক পথ। সাম্প্রতিক এই গ্রন্থ জাতির দূর্গতি লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। মানবতার কঠিন সময়ে তিনি কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয়ে, মানবতার পতনের কারণ ও তা হতে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। কিন্তু "অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া" জ্ঞান-দরিয়ায় সন্তরণ না জানার কারণে। সব থেকে অসহায় জাতির তথা-কথিত কাণ্ডারীরা, তারা না ঘরকা, না ঘাটকা। নিজেদেরকে সমাজবেত্তা নেতা, জাতির পথ পদর্শক মনে করলেও, তারা আসলে দীশাহীন, উদ্ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তের দল বারে বারে বিভ্রান্ত করতে এসেছে মানুষকে, সমাজকে, জাতিকে, দেশকে, মানবতাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরা দিক-ভ্রান্ত হয়ে ঘুর-পাক খেয়ে কালের অতল তলে তলিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। সেই অবুঝদের দিকে লক্ষ্য বা গুরুত্ব না দিয়ে এ অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করছি। আমরা এই বইখানা প্রকৃত সত্য সাধকদের উদ্দ্যেশ্যে প্রকাশ করছি, যারা সত্য বুঝতে আগ্রহী।

আজকের নৈতিক চরিত্র, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে ভারতীয় সমাজে মুসলিম সমাজ ঈমান ও চেতনা হারিয়ে সর্বহারা হয়ে পড়েছে। যদি এ বই পাঠ করে একজনও দৃষ্টিশক্তি ও চেতনা লাভ করেন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ্ আমিন্।

আরজ গুজার

কাজী কামরুজ্জামান

সমরুক নাজীরপাড়া, হাওড়া

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বা আবদুর রশীদ ও স্নেহময়ী আম্মা আমেনা খাতুনের রুহের মাগফেরাত কামনায় আল্লার রহম প্রার্থনায় নিবেদিত হল এ গ্রন্থ।

দোয়াপ্রার্থী

নাসীর আহমদ

সূচীপত্র

ঈমানদার লোকদের সকলে বের
হয়ে পড়া জরুরী ছিল না কিন্তু
এমন কেন হল না যে প্রত্যেক
গোষ্ঠীর কিছুলোক বের হয়ে এসে
দ্বীনের বোধ লাভ করে ফিরে
এসে স্ব স্ব গোষ্ঠীকে সতর্ক করে,
যাতে তারা দ্বীন বিরোধী আচরণ
থেকে বিরত থাকতে পারে।

(পবিত্র কোরআন - ৯ ঃ ১২২)

প্রাসঙ্গিক কথা

বাংলায় প্রবাদ আছে 'গোকুল অন্ধকার'। মানুষ যখন গোরু বাছুরের মত জীবনযাপন করবে, যখন পেটদর্শন ও পেটায় নমঃ ছাড়া আর কোন কিছুর কাছে নতি স্বীকার করবে না এবং তৃণভোজন ছাড়া তার আর কোন লক্ষ্য থাকবেনা। তখন সভ্যতা ভোগবাদের কারণে বাজারী অর্থনীতির ফলে বেণেবুদ্ধির কারণে ধ্বংস হবে। মনুষ্যকূল না থাকার কারণে গোকুল অন্ধকার হবে। এটা যুগে যুগে হয়েছে। মানুষ যখন তার সম্ভ্রম ভুলে পশুকে আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান ক'রে তার পূজা করবে তখন মানুষ পশুর সমান না থেকে পশুর অধম পশ্বাধাম হয়ে যাবে। এই পশুদের আসন্ন প্রায় ধ্বংসের জন্য জ্ঞানীদের করুণা হয়। তারা তাদের উদ্ধার করতে পারলে গোকুল উদ্ধার হয়। আর গো-জীবনের ভক্তরা অল্লম বা আল্লার উপাসককে হত্যা করা, দেশান্তরিত করার কাজ করলে সত্যম, শিবম, সুন্দরম এ অসত্য, অমঙ্গল ও কুৎসিৎ আবর্জনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। তখন দেশ হয় মহেঞ্জদড়ো বা মড়ার খুলির দেশ। সিন্ধু সভ্যতা বা সুন্দর সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বলদ ও গাভীপূজা, মাতৃপূজা, যোনিপূজা বা লিঙ্গপূজা। এটা পেটপূজার স্বাভাবিক পরিণতি। মেয়েরা তখন নৃত্যম-নাট্যমে লাস্যময়ী হয়ে কলাবতী হয়ে ছলাকলায় রম্ভা, মেনকা উর্বশী হয়ে যায়। শকুন্তলারা-সীতারা-মাঠে ঘাটে নিক্ষিপ্ত হয়। পরুষ তখন বলিবর্দ বা ষাড় হয়ে যায়, নারীরা হয়ে যায় সারগেট মাদার বা গর্ভ বিক্রেতা। তখন শ্রী কৃষ্ণ হয়ে যায়। এই যাদুগ্রস্তদের যদু বা যাদবদের তখন যদুপতিও উদ্ধার করতে পারে না। তখন রোগ সারাতে গেলে রোগী শেষ করা ছাড়া উপায় থাকেনা। তখন মঙ্গলময় শিব মানবজাতির স্বার্থে রুদ্র হয়ে ওঠেন। গোকুল অন্ধকার হয়ে যায়। পরকালে এরা গো-লোক বা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। আর যারা এহেন ধ্বংসাত্মক পথ থেকে মনুষ্যত্বের পথে সত্য সুন্দরের পথে ফিরে আসার সৌভাগ্য লাভ করে তারা আল্লার পথে ফিরে এসে আলোকপ্রাপ্তদের পথে চলতে শুরু ক'রে দেবতানন্দিত মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে পৌঁছে অমরলোকে অমরনাথের নৈকট্যলাভ করে ধন্য হয়। এধরনের মানুষ দেশ ও জাতির পরিত্রাতা হয়। দেশ তখন ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে দেশ শ্রীলঙ্কা বা স্বর্ণলঙ্কা হয়। সূরা বাকারা বা গো-দেবতা নামক সূরায় এ মহাতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। আমরা পুরন্দর হয়ে ভরতপুর ধ্বংস করবো না দেশকে শ্রীলঙ্কা বা স্বর্ণলঙ্কায় পরিণত করবো সে সিদ্ধান্ত নেবার ভার অল্লম সত্যম, শিবম, সুন্দরম আমাদের হাতে দিয়েছেন। আমরা মরলোকে যাবো না অমরলোকে তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। সুধীজনেরা যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আমার সকল শ্রম সার্থক হবে। অল্ল সবাইকে সুমতি দিন। ইতি বার্তাহ।

—খাকসার নাসীর আহমদ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দয়াল, দাতা আল্লার নামে (শুরু করছি)

ভূমিকা

দয়াবান মেহেরবান আল্লার নামের বরকতে আজ বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ ও ভাষ্যের অভাব নেই তবুও এটা কেন লিখলাম সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। যে সব তফসীর (ভাষ্য) রয়েছে সে সব উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে কিছুটা বোধগম্য হলেও সাধারণভাবে বাঙালী মুসলমান ও বিশেষ ভাবে আর্য বাঙালী কিংবা অনার্য বাঙালীর বোধগম্য নয়। ফলে না বুঝেও বোঝার ভাণ করতে হয় অথবা উদাসীন থাকতে হয়। পবিত্র কোরান পাঠ করে যদি মানবজাতির সভ্যতা সংস্কৃতির পটভূমিকায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বোঝা না যায় তাহলে কোরানের অনুবাদ পড়ার কোন মানে হয় না। পবিত্র কোরানে রয়েছে মানবিক ও মানবেতর মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রাচীন ও আধুনিক রূপের মধ্যে রয়েছে মিল ও গরমিল। পবিত্র কোরান আসলে একটি ঐশী গ্রন্থ নয় বরং সকল ঐশীগ্রন্থের সংকলিত রূপ। এতে রয়েছে বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা, গোপূজা, পশুপূজা, ভগবান, ভগবতী, দেবদেবী পূজার, নরপূজার, নবীপূজার এমনকি সূক্ষ্ম মহম্মদ পূজার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং স্রষ্টার আরাধনার প্রকৃত তাৎপর্য। এ হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থ। এতে বেদ-বাইবেল-রামায়ণ মহাভারত, গীতার সঠিক তথ্য ও ভাষ্য রয়েছে। এতে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ইহুদী, খৃষ্টান, মহমেডান সমাজ থেকে পৃথক প্রকৃত স্রষ্টা প্রেমিক সমাজের পরিচিতি ও বিবরণ। এতে রয়েছে স্রষ্টা ও পরকালে অবিশ্বাসী ও মেকী বিশ্বাসীদের বর্ণনা। এতে বৈদিক বেদুঈন, আদিবাসী ও ধ্বংস প্রাপ্ত জাতির বিবরণ রয়েছে। এ হচ্ছে জ্ঞান গবেষণার মালমশলার এক স্বর্ণখনি বিশেষ। মানব সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও সংহতির মূলসূত্র বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বিরোধ বিসম্বাদ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির সাথে পারলৌকিক মুক্তির সহজ সরল পথের সন্ধান। মুক্তি পথযাত্রী আলোর পথের যাত্রীদের জন্য এ দেশ আলোকস্তম্ভ। কিন্তু একে সেভাবে বোঝা ও বোঝান হয়নি।

এখন মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শাস্ত্রগ্রন্থকে লুকিয়ে রাখা, তাকে কাউকে পড়তে না দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীরা এসবে কতটা হাতসাফাই করেছে, এর শব্দ ও অর্থের কতটা পরিবর্তন করেছে এবং আদতে এসব কি ছিল তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের যুগ এসে গেছে। আমাদের ভাষ্যকারেরা আরবদের ভাষা ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কোরানের ব্যাখা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু অনারব জাতির জানা ইতিহাস ঐতিহ্যের পটভূমিকায় এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি অথচ আরব ও অনারব মুসলমানদের অনুপাত ১ঃ৯ এর। সব অনারব জাতির মধ্যেই মুসলমান রয়েছে। এই অনারব মুসলমানরা যে ইতিহাস ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে পবিত্র কোরানের প্রদত্ত মুল্যবোধের দ্বারা যদি তার বিচার বিশ্লেষণ করা না হয় তাহলে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে, জাতিকে যেমন পথ প্রদর্শন করা যাবে না তেমনি প্রাপ্ত ঐতিহ্যের গ্রহণ বর্জনের কাজও সঠিকভাবে করা যাবে না। ফলে মুসলমান হতে গিয়ে তারা স্বদেশ, স্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় বা বাঙালী মুসলমান না হয়ে আরবী বা হিন্দুস্থানী মুসলমান হয়ে যান। ফলে প্রত্যেক দেশে মুসলমাদের অবস্থা ভাসমান কচুরী পানার মত হয়ে যায়। তারা না ঘরকা না ঘটকা বরং তারা ধোবীর কুত্তার ন্যায় জীবন-যাপন করে। তারা ব্রাহ্মণ, ইহুদীদের মত স্বদেশ, স্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ধর্মের খোলসে আত্মগোপন করে কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করে, স্বদেশবাসীর সন্দেহের শিকার হয়। পবিত্র কোরানের যথার্থ অনুধাবনের ব্যর্থতাই এর কারণ। বাঙ্গালী মুসলমানের কোরানের বোধ অত্যন্ত সীমিত ও ভাসাভাসা। সেজন্য সে কোরানকে নিয়ে চলেনা, কোরানকে পিছনে ফেলে রেখে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে অথবা চলেনা, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। যারাই চলতে চায় তাদের গায়ে কাদা ছিটায়, প্রতিক্রিয়াশীল হয়, নির্বোধ হয়, মৌলবাদী হয়, মানুষ হয়না। মানুষ না হলে মুসলমান হওয়া যায়না। মনে রাখতে হবে ঈমানদার থেকে মানুষ বেইমান হয়েছে, বেইমান থেকে ঈমানদার হয়নি। ঈমানদাররা সব সময় বেইমান হয়েছে কেতাব না বোঝার কারণে। একদিন ঈমানদার ছিল মিশরের মত প্রাচীন সভ্যতার সংস্কার আন্দোলনের পতাকাবাহী। তারা অজ্ঞতার কারণে ব্রহ্মার সাধনা, উত্তরাধিকার ও ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে প্রাচীন আযর সভ্যতা ও মিশরের গো-পূজাকে গ্রহণ করে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক শাসকের চাটুকার হয়ে দেশছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্রাহ্মণরাই ভারতে হনুদ বা হিন্দু হয়ে হিন্দী হিন্দু ও হিন্দুস্থানের দাবী তুলে দিন দিন হীনবল হচ্ছে। এদের একটা শাখা ইহুদী। তারা তাদের স্বগোত্র ব্রাহ্মণদের ভুলে গেছে। ব্রাহ্মণরাও তাদের পরজাতি ভাবে। ইহুদী বা য়ুদী বা যুদী

কিংবা যাদবদের উদ্ধার করতে যে দায়ুদ এসেছিলেন তাদের ইতিহাস ও চরিত্র উভয় জাতিই বিকৃত করেছে স্বার্থের কারণে। ফলে আরও একবার উৎখাত হয়েছে। গ্রীক রোমানদের দ্বারাও তারা উৎখাত হয়েছে। উৎখাত হয়েছে ইরানী ও আফগানীদের দ্বারা। তারা সত্যের সাথে সংঘাত বাধিয়ে স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত হয়েছে। তারা ইবরাহিমী ব্রাহ্মণ সভ্যতা নয়, আযর বা আর্য সভ্যতার পতাকাবাহী হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ বাদ দিয়ে আর্যসমাজ গঠন করেছে। তারা আজও ভারতীয় হয়নি বরং ভারতীয়দের থেকে পৃথক থেকেছে। ফলে ভারতীয়দের কাছে আজ তারা পরিত্যক্ত হচ্ছে যেমন ইহুদীরা আরবীয়দের কাছে পরিত্যক্ত হচ্ছে, পরিত্যক্ত হয়েছে ও হচ্ছে খৃষ্টানরা এমনকি মহমেডানরাও কিন্তু গৃহীত হচ্ছে মানবতাবাদীরা। পবিত্র কোরান মানবতার প্রাথমিক ও চূড়ান্ত রূপরেখা পেশ করেছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কোরানের আধুনিক কোন ভাষ্য বাংলা ভাষায় না থাকায় বাঙালী মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোরান থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলে মানবতার সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে। তাই পবিত্র কোরানের তফসীর নয় তার বোধ যাতে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে সহজ হয়, পবিত্র কোরানের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা যাতে তারা বুঝতে পারে সেজন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যেহেতু এ নতুন প্রয়াস সেহেতু বিতর্কের অবকাশে রয়ে যায়। সুধীজনেরা এ সবের উপরে আলোকপাত করলে তা আমার জন্য ও অন্যদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমার আশা। তবুও যদি কেউ কোন কারণে আহত হন তাহলে আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বিজ্ঞজনেরা অজ্ঞজনকে ক্ষমা করলে তা শোভন ও সংগত হবে। এতে যদি কারও বোধোদয় হয় তাহলে আমি তার দোয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থী।

দয়াময় আমার মনের কথা ভালই জানেন। যদি কিছু ভুলত্রুটি হয় এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক তাহলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন আর যদি আমার এ অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ সঠিক হয় তাহলে তিনি যেন আমাকে মানুষ করেন, খোদাপ্রেমিক করেন।

দয়াময়ের দয়াপ্রার্থী
খাকসার
নাসীর আহমদ

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক

সূরা ফাতেহা হচ্ছে পবিত্র কোরানের ভিত্তি আর বাকী সূরাগুলো হচ্ছে এই ভিত্তির উপর গড়ে তোলা ইমারত। সূরা আল বাকারা হচ্ছে ভিত্তির উপর ঢালাই। সূরা ফাতেহায় যে সেরাতোল মুস্তাকীমের (সহজ সরল দৃঢ় পথ) প্রার্থনা করা হয়েছে তার জবাবে এই সূরায় বলা হয়েছে এই সেরাত বা পথ প্রদর্শন থেকে কারা উপকৃত হতে পারে আর কারা পারবেনা। যারা আল্লাহ ও তাঁর বাস্তব ব্যবস্থাপনা অনুধাবন করতে অক্ষম সেই কালাবোবা অন্ধরা বাস্তববিমুখ হওয়ার কারণে বস্তুবাদী হয়ে ধ্বংস হবে। এরাই গোপাল বা গরুর পাল যারা তাদের রক্ষাকর্তা বা রাখালের নির্দেশ অনুধাবন করতে না পেরে নেকড়ের মুখে গিয়ে পড়ে। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ধর্মের পোষাক পরা বর্ণবাদী ইহুদী ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সূরা বাকারার দ্বিতীয় অংশের উপনাম 'সায়াকুলুস সুফাহায়ো' বা 'নির্বোধদের উক্তি ব্য প্রতিক্রিয়া। এই অংশে মুক্তিপথ প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু নির্বোধরা অনুধাবন করতে পারছে না। তৃতীয় উপনাম হচ্ছে তিলকার রসূল অর্থাৎ রসূলতত্ত্ব। এঁদের স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টি রহস্য জ্ঞাত করা হয়েছে। এঁরা মহাজ্ঞানবান। এঁদের পথ হচ্ছে জ্ঞানীদের পথ। এঁদের পথ অবলম্বনকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। এঁরা উদ্যমী পুরুষ ছিলেন। এঁদের মতো উদ্যমী পুরুষ হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সত্য পথ চিনলেও কোন কাজে আসবেনা। যারা উদ্যমী হয়ে উদ্যোগ নেয়না তাদেরও বোঝান না বোঝান সমান। এরাও গোপাল, চিনির বলদ বা ভারবাহী গাধা। মানুষ কেমন করে পশু হয়, পশুর অধম হয়, পশ্বাধাম হয় তার বিবরণ রয়েছে এই সূরায়। পবিত্র কোরানের আলোচ্য বিষয় আল্লাহ আল্লার নবী, নবীদের প্রকৃত অনুগামী নবীভক্তদের বাড়াবাড়ি, পাপাচার, পরিণতি, মুক্তি সংগ্রামের পথ ও পাথেয় সবই এই সূরায় আছে। এটাকে কোরানের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। সূরা ফাতেহাকে যদি বলা হয় বৃন্ত সূরা বাকারা তাহলে কোরক আর বাকী কোরান হচ্ছে প্রস্ফুটিত কুসুম।

সূরা ফাতেহা হচ্ছে প্রার্থনার সূরা। আল্লাহর কাছে চাওয়া-পাওয়ার সূরা। সূরা ফাতেহায় বান্দা স্বীকার করেছে আল্লাহ আল-ইলাহ বা একমাত্র নমস্য কারণ তিনি সর্বশক্তিমান বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি রব বা সুমহান প্রতিপালক আবার সাধারণ দাতা হওয়ার সাথে বিশেষ দাতাও। তিনি মালেকে ইয়াওমিদ্দিন বা মহাবিচারক। তিনি কাজের বিচার করে ফল দেন অর্থাৎ কাজের মূল্য দেন, যে তাঁর রাস্তায় কাজ করবে তাকে ফল দেবেন। বান্দা তাই তাঁর রাস্তায় কাজ করার জন্য

ইয়াকানা বোদো বলে তার পথে কাজ করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে এবং কাজের ব্যাপারে ওয়ানাস্তাইন বলে তার সাহায্য ও সহায় প্রার্থনা করেছে। অতঃপর আল্লার কাছে উত্তম পথ প্রার্থনা করেছে, এমন পথ যা নেয়ামত ভরা, বাঁচতে চেয়েছে এমন পথ থেকে যে পথে গজব ও গোমরাহী রয়েছে। সূরা বাকারায় আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তৃতীয়-চতুর্থ রূকূতে তাঁর রবত্ব ও করুণা, অতঃপর ইসরাঈল সন্তানদের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও মার্জনার নীতি, অবাধ্যতার শাস্তি, তাদের প্রতি অভিশম্পাত, পাপাচারের জন্য কর্তৃত্ব প্রয়োগ, ফ্যারাওয়ের কবল থেকে মুক্তি ফ্যারাওকে সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এই গজব গ্রস্ত ও পথভ্রষ্টদের অবাধ্যতা ও তার শাস্তি থেকে তারা অবশ্যই বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রার্থনা করেছে। নেয়ামত প্রাপ্তদের পথে যারা চলবার প্রার্থনা করেছে তারা অবশ্যই তিলকার রসুল ইবরাহীম থেকে মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যে সব নবীরসুলদের পথ উল্লেখ করা হয়েছে, তা্দের পথে চলবার জন্য অবশ্যই আগ্রহী হবে। তারা যদি খোদার প্রদির্শিত এ পথে না চলবে তাহলে তারা নামাজ বা প্রার্থনা করতে আসে কেন? যারা নেয়ামত প্রাপ্তদের পথে চলতে রাজী নয়, গজবগ্রস্ত ও গোমরাহদের পথ পরিহার করতে রাজী নয় তারা গরু ছাগলের মতো নির্বোধ নয় কেন? যারা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী হবেনা তারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি একথা বলে কেন? এতো আত্মপ্রতারণা। এর পরিণাম তো দুনিয়া আখেরাতে শাস্তি ও লাঞ্ছনা। যারা নামাজে কেতাব পড়ে অথচ এসবে ধ্যান দেয়না তারা গাই গরু নয়তো কি? তারা তো গরু-ছাগল জন্তু জানোয়ারের পাল। এদের সতর্ক করা না করা সমান। পবিত্র কোরান এদের জন্য নয়। এ কোরান তাদের জন্য যারা সতর্ক বুদ্ধির ধারক। পবিত্র কোরানের শিক্ষা জ্ঞানীদের জন্য, চিন্তশীলদের জন্য, চিন্তাহীন গাইগরুদের জন্য নয়, দুনিয়াপূজকদের জন্য নয়। সূরা বাকারায় মানুষকে গরু-ছাগলের মতো জীবন যাপনকারীদের ইতিহাস থেকে চিন্তাশীল বিবেকবান মানুষেদের শিক্ষার নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই এই সূরার 'আল বাকারা' নামকরণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যারাই খাও, দাও, ফূর্তি কর বা পেলাম থালে দিলাম গালে, পাপপুণ্যি নেই কোনইকালে—এই দর্শনের উপর জীবনযাপন করে নীতিনৈতিকতার ধার ধারেনা তারা কিংবা তাদের অধীন স্থূলদর্শী আনুষ্ঠানিক, গতানুগতিক ধার্মিক লোকেরা তারা যে দেশ ও যে কালের হোক তারা সকলেই গরুছাগলের মতো নিকৃষ্ট জন্তু জানোয়ার মাত্র। তারা সকলেই বাকারা আল-বাকারার মধ্যে শামিল।

সূরা বাকারার বা গো-পূজা নামকরণের তাৎপর্য ঃ

বাকারা মানে গাভী। এই সূরায় গাভী বা গোপূজার প্রসঙ্গ আছে। গোপূজা হচ্ছে চরম আধ্যাত্মিক ভ্রান্তি। প্রাচীন জাতি সমূহ ধর্মের নামে এই বিভ্রান্তির শিকার ছিল। এমনকি পতনযুগের মুসলমানরা পর্যন্ত সর্বশেষে পশুপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই পশুপূজা পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হওয়ার সময় ছিল, কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ছিল, কোরান অবতীর্ণ হওয়ার পরেও মানুষ নতুন করে গোপূজক হয়েছে। ফলে সমস্যাটা সর্বকালীন আধ্যাত্মিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিগতকালের খোদা পূজারী মুসলিম সম্প্রদায় গোপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। নবগঠিত মুসলিম উম্মাহ যেন এ ভ্রান্তিবোধে নিমজ্জিত না হয়। সেজন্য এই সূরা যা কোরানের বৃহত্তম সূরা, তাকে কোরানের ২নং সূরা হিসাবে পেশ করা হয়েছে। প্রথম সূরা ফাতেহায় স্রষ্টা পূজার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় সূরায় এই স্রষ্টা পূজার বিপরীত সৃষ্টি পূজা, পশুপূজার ভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের মানুষ হওয়ার জন্য পশু পূজা তো দূরের কথা নরপূজাও বিরাট অপরাধ কিন্তু মানুষ এত নির্বোধ যে মহান জ্ঞানময় আল্লার পরিবর্তে বোকা গাইগরুর পূজা করে। গাইগরু গায়রুল্লাহর প্রতীক। আল্লাই পূজ্য কোন গাইরুল্লাই পূজ্য নয়, এটা বোঝাবার জন্য এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা বাকারা বা গোপাল। ভারতে গোপাল বলা হয় গোমূর্খদের। মূর্খদের মধ্যে মূর্খতম জ্ঞান করা হয় গোমূর্খদের। তাদের বলা হয় গোবেচারা। তাদের মানুষই মনে করা হয় না। বরং তাদের মনে করা হয় গরু—করণার পাত্র। ভারতের মানুষদের গোপূজক বানিয়ে যখন তাকে গোমূর্খ করে দেওয়া হলো তখন তাদের সম্পদ হরণ করার কাজে ব্রাহ্মণদের সহচর বেনে এগিয়ে এল। ধর্মান্ধ গোপূজক গোমূর্খদের কাছে সোনার বেণেরা ধর্মের ভাণ করতো। তাই ভারতীয় গোবেচারারা সোনার বেণের দোকানে এলে আর্য সোনার বেণের কর্মচারী দোকানের পিছন থেকে 'কেশব' শব্দ করে উঠতেন। ভারতীয় গোবেচারা ভাবতো আহা আর্য বেণেরা কত ধার্মিক। কিন্তু পূর্ব প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সে বেণের কাছে থেকে জানতে চাইতো আগন্তুকরা কারা? কে সব, কে সব? বেণে জবাব দিত গোপাল অর্থাৎ গরুর পাল বা বোকার দল। তখন ভেতর থেকে প্রশ্ন আসতো, 'হরি' হরি অর্থাৎ হরণ করি, চুরি করি? জবাবে বলা হতো, "হর হর" অর্থাৎ সোনা চুরি কর, অসুবিধে নেই। ধর্মীয় পরিভাষাতে ধর্মের

নামে আর্যরা ধর্মান্ধ ভারতীয়দের ঠকাতে পারতো তা গোপাল বানানোর কারণে। এরা গোপাল হয়ে রাধার বস্ত্র হরণ করে অশ্লীলতায় মগ্ন হয়ে মরলো। কেলো আর্যরা (কৃষ্ণ) ফরসা আর্য রাধার পায়ে ধরে, মান ভাঙবার জন্য কিন্তু ন'মণ চাল না হলে রাধার মন ওঠেনা, তার কানে সোনা চাই। তাই সোনার বেণের কাছে আসতে হয়। তাই হরে কৃষ্ণর নামাবলী পরে বেণের দোসর ব্রাহ্মণ ভারতীয়দের হরেকৃষ্ণ জপে গোপাল হবার প্রেরণা যোগায়। বাউলেরা কোন নীতি নৈতিকতার ধার না ধেরে ধর্মের নামে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। নারীরা রাধা সেজে ধর্মের নামে ব্যাভিচারিণী হয়। অনার্যদের এভাবে শরীয়তের বন্ধনমুক্ত করে তাদের পশু বানিয়ে দেওয়া হয়। তাদের আর কোন চিন্তা শক্তি থাকেনা। তারা সত্যি গোপাল হয়ে যায়। এমনকি গাভীর সাথেও পর্যন্ত রমণে লিপ্ত হয়। জাগো হিন্দু জাগো গ্রন্থে বলা হয়েছে " শুধু রমণীর সাথে নয়, গাভীর সাথে মানুষের যৌন মিলনের ভাস্কর্য্য বহু হিন্দু মন্দিরে অঙ্কিত আছে" পৃ-৪৪। এই অবাধ যৌনাচার আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে ফলে শুধু আত্মিক নৈতিক ধ্বংস নয়, এডস্ এর মাধ্যমে জৈবিক ধ্বংসও নেমে এসেছে। তাই মানুষকে বাকারা বা বোকারদল না হওয়ার জন্য সূরা বাকারায় সতর্ক করা হয়েছে।

আদম (আঃ) আল্লাকে ভুলে শয়তানের প্ররোচনায় বৃক্ষপূজায় জড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ইহুদী তাদের পূর্বপূরুষ ব্রম্ভাকে ভুলে গোপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই হযরত মুসার আমলে পুনরায় গো কোরবানীর প্রচলন করা হয়। ভারতে নূহের (আঃ) বংশধররা পশু পূজায় লিপ্ত হয়। তারা আদম (আঃ) ও তাঁর স্রষ্টাকে পশুপতি নাথ ভাবতে থাকে। আর্য ব্রাহ্মণগণ তখনও গোভক্ত হয়নি। রাম ও গৌতম বুদ্ধ উভয়েই গোমাংস ভক্ষণ করতেন। কিন্তু গুপ্তযুগে পুনরায় গোহত্যা বন্ধ করে গোপূজা চালু করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে (দ্রষ্টব্য গোমাংস প্রিয় ব্রাহ্মণগণ নিরামিষ ভোজী হল কেন?—ডঃ আম্বেদকর)। ভারতে ধর্মের ষাঁড়কে মহাদেবের বাহন জ্ঞান করা হয়। অনুরূপভাবে আরবেও উটবিশেষকে পবিত্র জ্ঞান করা হতে থাকে। কালীর পাঁঠারও অনুরূপ মর্যাদা প্রদান করা হয়। বিধবা মেয়েদের এই পাঁঠা পুষতে দেওয়া হয়। আসলে এসবের সাথে অশ্লীলতা যুক্ত থাকে। তাই মা ভগবতী হিসাবে গাভীপূজা শুরু হয়। 'ভগ' বলা হয় যোনীর উপরিভাগকে। 'ভগ' বলতে প্রশস্ত যোনীধারী বুঝায়। প্রশস্ত ভগের অধিকারী বলে গাভীকে পূজ্য জ্ঞান করা হয়। 'ভগ' এর শব্দ বিপর্যয় করে গাভী করা হয়েছে। গাভী তাই ভগবতী। পৌত্তলিকতার শেষ গন্তব্য স্থল যোনীপূজা, লিঙ্গপূজা, মন্দিরে সন্ন্যাসী সেজে দেবদাসী উপভোগ করা হতো হরির নামে। দেবদাসীর সন্তানদের বলা হয় হরিজন। এর অর্থ দাঁড়ায় হরি লম্পট। নিজে অবলা

(ধর্মের নামে যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে) নারীর ইজ্জত নিয়ে নিজেকে ভগবানের প্রতিভূ বানিয়ে একে পাপ নয়, পূণ্য বলে চালিয়ে দেওয়া মানবীয় অধঃপতনের চরমতম ধাপ। ব্রাহ্মণরা বৈদিক যুগে ক্ষত্রিয় রাজরাণীকেও ধর্মের নামে ধর্ষণ করতো। (দ্রষ্টব্য ঃ স্বামী ধর্মতীর্থের History of Hindu Imprialism) ব্রাহ্মণের ক্রোধ অনেক দানধ্যানের পর লিঙ্গে এসে আটকে যেত এবং সে ক্রোধ প্রশমনের জন্য রাণীকে ধর্ষণ করা হতো। রাজাও এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিকার ছিলেন। এমতাবস্থায় সাধারণ নারীর, শূদ্র নারীর অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। তাদের নাম দেওয়া হতো দেবদাসী। স্বর্গেও ব্রাহ্মণদের বেশ্যা থাকতো। মেনকা, উর্বশী সকলেই স্বর্গবেশ্যা। নজরুল ইসলাম লিখেছেন 'স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীপুত্র হলো মহাবীর দ্রোণ'। এই দ্রোণ আবার আচার্য বা ইমাম। ইনি একলব্যের আঙুল কেটে দেন যাতে তারা তাদের মায়ের জাতের ইজ্জত রক্ষা করতে না পারে।

শূদ্র বা দাসজাতিকে সর্বপ্রকার সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত করা ছিল ব্রাহ্মণদের নীতি। তাদের অজ্ঞ রেখে মানবিক দিক থেকে পঙ্গু করে আর্থিক দিক থেকে ধ্বংস করা ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক নীতি। শূদ্রেরা গরু পেলে যাতে উপকৃত হতে না পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তারা খাদ্য হিসাবে গোমাংস থেকে শুধু বঞ্চিত হতোনা, এই গরুগুলো তাদের শস্যও সাবাড় করে দিত। এ ছিল শূদ্রদের ক্ষতি করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। এটাও করা হয়েছিল স্রষ্টার নামে। তারা বানর হনুমানকে পূজ্য বানিয়ে ছিল যাতে ফসলের ক্ষতি হয়। এসব খোদার বিধান নয়, খোদার নামে খোদকারী তা বলার জন্য কোরান অবতীর্ণ হয় যাতে মানুষকে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উন্নীত করা যায়। এজন্য সূরা আনাম বা পশু বিষয়ক সূরাও কোরানে প্রদান করা হয়। মানুষের খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কেও সার্বিক বিধি বিধান দান করা হয়। সূরা বাকারায় গাভী পূজার বিরোধিতা করা হয়েছে। কিভাবে বিগতকালের মুসলমানগণ এতে ফেঁসে যায়, সূরা মায়েদায় তার বিবরণ দেওয়া হয়। সূরা বাকারায় যে গোনীতির সূচনা তারই উল্লেখ দেখা যায় সূরা নেসা, সূরা আরাফ ও অন্যান্য সূরায়। গোপূজার প্রসংঙ্গটা কোরানের বিভিন্ন স্থানে বারবার এসেছে কারণ আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটা একটা মৌলিক বিকৃতি। তাই সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থে এই বিকৃতির কারণ, শাস্তি, ফলাফল ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা মৌলিক সমাধান পেশ করে দেওয়া হয়েছে যাতে আগামী দিনের কোন সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। গাভী আজও আধ্যাত্মিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে না পেরে বহু বড় বড় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে। এ অত্যন্ত

জটিল ও ক্রনিক রোগ। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের দিকে যাত্রা ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন। গোপূজা, লিঙ্গপূজা মনুষ্যত্বের বিনাশ ও পশুত্বের উৎকর্ষ সাধন করে। চিন্তাশীল মনীষী মার্কস গোপূজক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ-

"এই সব শান্ত সরল গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়ণক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা এক একটা হতভাগ্য ভূমি খণ্ডের ওপর পুঞ্জীভূত হয়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকাণ্ড প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে একতিল বেশি বিবেচনা এদের সম্পর্কে করেনি এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি, যেন না ভুলি যে এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদ-সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যাব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানী করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর এবং সুবালাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে"। (ভারতে ব্রিটিশ শাসন পৃ-১১-১২) ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এজন্য তিনি ধর্ম বিবেচনা করেননি, হিন্দু ধর্মের ন্যায় তিনি ইহুদীধর্মেরও প্রশংসা করেননি। তিনি প্রশংসা করেছেন বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের কারণ এসব ধর্ম মানুষকে পশু বানায়না, মানুষ বানায়, মানুষের উৎকর্ষ সাধন করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন এই তিনটে ধর্মই গোপূজার বিরোধী। ব্রাহ্মণরাও আদিতে গোপূজক ছিলনা। তাদের পূর্ব পুরুষ ব্রহ্মা বা ইবরাহীমও গো-খাদক ছিলেন আর তারাও ছিলেন দারুণ গোখাদক। এজন্য তাদের নাম ছিল গোঘ্ন। এত বড় গোখাদক গোষ্ঠী কিভাবে যে গোপূজক হয়ে গেল তা আজও বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে রয়েছে। ডঃ আম্বেদকর এর কিছু কারণ নির্দেশ করেছেন। গোপূজার সূচনা হয়

সামান্য কারণ থেকে। ব্রহ্মার পৌত্র মহাত্মা ইয়াকুব স্বাস্থ্যগত কারণে ব্যক্তিগতভাবে গোমাংস পরিহার করেন। লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে অথচ এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ না স্রষ্টার দিক থেকে ছিল, না হযরত ইয়াকুবের দিক থেকে ছিল। পরে তাদের খোদাদ্রোহিতার দরুণ মেরুদণ্ডের চর্বি ও উজড়ির (ভুঁড়ির) চর্বি ছাড়া সবই হারাম করে দেওয়া হয়েছিল। পরে কোরান যখন তওরাতের এই শাস্তির বিধান রদ করে দিল তখন তওরাতওয়ালারা এই বলে আপত্তি করলো যে, কোরান যদি পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ তওরাতের সত্যতার সাক্ষ্য হয় তাহলে তওরাতের বিরোধী এই আইন কোরানে কেন? জবাবে সব ব্যাপার খোলাসা করে দেওয়া হয়েছিল। যে সব বিধিনিষেধ মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিল পবিত্র কোরানের মাধ্যমে সেসব প্রত্যাহার করে দিয়ে বারহ্‌ম্ বা রহমদীল দয়াবান খোদা মানবজাতির প্রতি বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। সূরা বাকারা বা গাভী অন্যকথায় গোপূজা তাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল।

তওরাতে খোদা ছাড়া অপর কারও পূজা-উপাসনা আনুগত্য বৈধ ছিলনা। ইবরাহীম বা ব্রহ্মার কেতাবে এই কথাই ছিল, মুসার কেতাবেও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। কিন্তু হযরত ইউসুফের (আঃ) পর বনি ইসরাইলরা এর উপর দৃঢ় না থাকায় তারা রাম-রহীমকে মিলিয়ে ফেলে রাম রাজাদের গোলাম হয়ে গিয়েছিল। ফেরাউন বা রামরাজারা তাদের দাস করে অমানুষিক পরিশ্রম করাতো। তারা কোন 'র' মেটেরিয়াল না দিয়েই তাদের ইট তৈরী করতে বাধ্য করতো। তারা কাঠুরে ও ভিস্তিওয়ালা হয়ে গিয়েছিল অথচ আযাদীর যুগে তারা খোদার জন্য সামান্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিলনা। তারা আরও আরাম ও আরও সুখের কারণে রহমানের অনুগ্রহ যা ইবরাহীমের (আঃ) সহীফা বা ব্রহ্মার গ্রন্থ হিসাবে তাদের কাছে ছিল তাকে 'তাকে' রেখে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তার পড়াশোনা, চর্চা, প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পন্থা পরিত্যক্ত হয়। ফলে তাদের ও কিবতীদের বা কপটদের পার্থক্য লোপ পায় এবং তারা কপটদের গোলামে পরিণত হয়। তাদের আরাম আয়েসের নেশা টুটে যায়। শ্রম-শিবিরের জুলুমে তাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য তাদের যুবসমাজকে হত্যা ও পুত্রসন্তানকে সংহারের নীতি গ্রহণ করা হয়। এভাবে নারীদের অবলা বানিয়ে তাদের মিসরীকরণ বা দাসীকরণ করা শুরু হয়। তারা ফ্যারাও বা রামরাজত্বে গো-পূজক হয়ে যায়। তারা মিস হয়ে যায়। মিষ্টারেরা তাদের মিসেস না করেই ভোগ করতে থাকেন।

এই কঠিন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে হযরত মুসা (আঃ) প্রেরিত হন। তিনি

অহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিকৃত ব্রহ্মপূরাণ সংশোধন করার সুযোগ পান। তাঁকে যে প্রত্যাদেশ প্রদান করা হয় তাকে ফোরকান বা ভালমন্দের মিশ্রণ বিদূরণকারী গ্রন্থও বলা হয়। তিনি স্বয়ং ফ্যারাওকে সূর্যপূজা, দেশপূজা, গো-পূজা ও বাউনভজা নীতি পরিত্যাগ করে রাব্বুল আলামিনের আনুগত্যের ডাক দেন। বনি ইসরাঈলীদের ফ্যারাওয়ের আনুগত্য ছেড়ে ব্রহ্মার আনুগত্য ও স্রষ্টাপ্রেরিত নবীর নেতৃত্ব মেনে নিতে বলেন। তিনি তাদের গৌরবময় যুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের উপর বারহম বা রহীমের অনুগ্রহপূর্ণ যুগের কথা স্মরণ করিয়ে সত্য-ন্যায় ও বীরত্বের সবক নেবার কথা বলেন, যাতে তাদের ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। নীতিগতভাবে যারা তাঁর কাজের সমর্থক ছিল তাদের মধ্যে কর্মগত বৈষম্য এতটা রয়ে গিয়েছিল যে যখন তারা ফেরাউনের কবল থেকে খোদার অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছিল এবং তারা এতবড় অত্যাচারমূলক শাসক থেকে আযাদ হলো এবং আল্লাহ এক নয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতির জন্য সংবিধান স্বরূপ তওরাতের মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিধান দিলেন তখন তারা সেই মহা করুণাময় খোদার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে, যে গোপূজায় গোলামী যুগে তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল সামেরী বাউনের প্ররোচনায় তারা পুনরায় সে গোপূজা করে বসলো। তারা সামেরী নির্মিত স্বর্ণ-গোবৎসের পূজা করেছিল অথচ তাদের পূর্বপুরুষ ব্রহ্মা গোবৎস ভাজা করে মেহমানদের (অতিথিদের) সামনে পেশ করতেন। গোপূজার উল্লেখ রয়েছে বাকারা বা গোপূজা নিবন্ধে ৬ষ্ট পরিচ্ছেদের ৫১-৫৪ শ্লোকে, "এবং আমি যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত নির্ধারণ করেছিলাম, তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎসকে নমস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, এজন্য তোমরা অত্যাচারী হয়েছিলে। এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি (এই অপরাধের জন্য) সমূলে বিনাশ করা অপরিহার্য ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি তা করিনি বরং তোমাদের আর একবার সুযোগ দিয়েছি) যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং এ কথাও স্মরণ কর আমি মুসাকে গ্রন্থ ও মানদণ্ড (সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করার মানদণ্ড) দান করেছিলাম, যাতে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও (গোলামী যুগের কলংককালিমা থেকে মুক্ত হও) এবং এ (ইতিহাসও) স্মরণ কর যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যে রূপে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের মুক্তিদাতার পানে প্রত্যাবর্তন কর (তওবা কর) অর্থাৎ গোবৎস পূজার মাধ্যমে পৌত্তলিক হয়ে তোমরা অপবিত্র হয়ে গেছ, এখন অনুতপ্তচিত্তে গোপূজা পরিহার করে এক আল্লাহকে গ্রহণ করে পবিত্র হও) এবং পরস্পরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের মুক্তিদাতার নিকট তোমাদের

জন্য কল্যাণকর। তাহলে তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েও গোপূজা করেছে তারা মুরতাদ হয়েছে, তাদের হত্যা করা তোমাদের জাতীয় মুক্তির জন্য জরুরী। একাজ করলে প্রমাণিত হবে তোমরা নবজীবন লাভ করতে চাও, তোমাদের পচে যাওয়া অংশকে অপারেশন করতে চাও। যদি তোমরা একাজ না কর তাহলে প্রমাণিত হবে তোমরা তোমাদের কল্যাণ চাওনা, আর যদি তোমরা একাজ কর তাহলে বোঝা যাবে তোমরা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত, কৃত অপরাধের জরিমানা সন্তোষ সহকারে আদায় কর। যে অপরাধে তোমাদের সকলের হত্যা ছিল যথার্থ দণ্ড, সেখানে জরিমানা দিয়ে বেঁচে যাওয়া, শুধু অপরাধীদের হত্যা করে জাতির অবশিষ্ট অংশকে বাঁচিয়ে নেবার পারমিশান পাওয়াটা বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে রাজী আছেন যদি তোমাদের মন্দকে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে পৃথক করতে, ছাঁটাই করতে রাজী হও। আল্লার এ নির্দেশ বনিইসরাঈল পালন করেছিল অনিচ্ছাসহকারে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল গোপূজা কোন মামুলী অপরাধ নয়। শুধু তাই নয় গোপূজার দূর্বলতা কাটাবার জন্য তাদের গরু জবাই করে খেতেও হবে যাতে প্রমাণিত হয় যে এটা ভোজ্যপদার্থ, পূজ্য পদার্থ নয়। সূরা বাকারা বা গাভী নামক সূরায় গরু জবায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়, "এবং সেই (ইতিহাসও) স্মরণ কর যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল-প্রকৃতই আল্লাহ তোমাদের গো-কোরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বলেছিল—তুমি আমাদের সাথে তামাসা করছো"? তারা ভেবেছিল গরু পূজা না হয় নাই করলাম, যা করেছি করেছি আর না হয় না করবো কিন্তু তাবলে তা জবাই করে গোপূজকদের বিরাগভাজন হতে যাব কেন? এটা কি সম্ভব? তাই তারা এ প্রস্তাবকে ভেবেছিল মুসা বা শম্বুক একটার পর একটা তালিকা প্রকাশ করেই চলেছে আমাদের নিয়ে মজা করার জন্য নিশ্চয়ই। মুসা আমাদের মূর্খ ভেবেছে, আমরা যেন কিছু বুঝিনা আর কি! জবাবে হযরত মুসা বললেন হাসিঠাট্টা করা মূর্খদের কাজ, এটা কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়—"সে বললো আমি আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি যাতে আমি মূর্খদের সামিল না হই"। অর্থাৎ হযরত মুসার (আঃ) বলার কথা ছিল মূর্খতো তারা যারা মানুষ হয়েও গরুকে পূজ্য ভাবে এবং তা এড়াবার ফিকিরে আছে। পালাবার কোন পথ না পেয়ে "তারা বলেছিল—তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের বর্ণনা করেন—কিরূপ গরু, সে বলল তিনি বলেছেন নিশ্চয় সেই গরু বৃদ্ধও নয়, শাবকও নয়, মাঝবয়সী। অতএব তোমরা আদেশ মত কাজ কর"।(৬৮) তারা এটাও জিজ্ঞাসা

করতোনা, করতে বাধ্য হয়েছিল একটা কারণে। তারা যে পূর্বে তওবা করেছিল তাও সহজে করেনি। তারা দৃশ্য খোদা গরুকে বাদ দিয়ে অদৃশ্য খোদাকে গ্রহণ করতে রাজী ছিলনা। তারা স্থুলদর্শী হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা দাবী করেছিল যে, "হে মূসা আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করবনা। তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর আমি মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"—(সূরা বাকারা-৫৫-৫৬)।

বাজপড়া গোপূজকরা তাই সরাসরি ঐশীনির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারছিলনা। তাই তারা বাহানাবাজী শুরু করেছিল যাতে তার ফাঁক দিয়ে এই গুরুদায়িত্ব পালন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, কিন্তু ফল হয়ে গেল হিতে-বিপরীত। "তারা বললো তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা কর তিনি যেন তার রং কিরূপ আমাদের বলে দেন"। যে কোন গরু জবাই করলেই ফাঁড়া কেটে যেতো কিন্তু তাদের প্রশ্নের ফলে তারা যে গরুকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে পূজা করতো আল্লাহ তাদের সেইখানে পৌঁছে দিলেন। "তিনি বলছেন গরুর রং হবে সোনালী হলুদ বর্ণের যা নয়নমনোহর তারা বললো—তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা কর তিনি যেন তার প্রকৃতি আমাদের জানান কেননা আমাদের নিকট সকল গরুই সমান, আল্লাহ চাইলে আমরা সুপথগামী হবো। সে বললো তিনি বলেছেন তা এমন গরু যা চাষে ও সেচের কাছে ব্যবহৃত হয়নি, একাবারে নিখুঁত"—(সূরা বাকারা-৬৯-৭১) যে গরুকে তারা মহাদেবের বাহন ভাবতো ও দেবতার নামে পূজ্য জ্ঞান করতো সেই স্বর্ণবর্ণ গাভীই তাদের জবাই করতে হলো। বেশী পাকামু করতে গিয়ে তারা বেশী টাইট হয়ে গেল। তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোরবানী করতে বাধ্য হলো। এ ছিলো বাহ্যিক কোরবানী। এতে তাকওয়া ছিলনা। এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ৭১ আয়াতে "তারা বলল—এখন তুমি সত্য বর্ণনা করেছ। অতঃপর তারা তা জবাই করলো যদিও তাদের তা করার আদৌ ইচ্ছা ছিলনা।"

তাও এক ঘটনার সম্মুখীন হয়ে তারা একাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের মধ্যে এক নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। এই হত্যার জন্য তারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করছিল। তারা হযরত মুসার মারফত প্রকৃত অপরাধী কে তা তারা জানতে চেয়েছিল সম্ভবত তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। হযরত মুসা(আঃ) আল্লার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আল্লাহ-পাক এই সুযোগ গ্রহণ করে তাদের গরু জবায়ের আদেশ দিলেন প্রকৃত অপরাধীকে প্রকাশের জন্য। এ থেকে পালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে মুশকিল

ছিল। প্রশ্ন করে তারা ফেঁসে গিয়েছিল। তাই তারা গোকোরবানী করতে বাধ্য হলো। তখন, "আমি বললাম এক টুকরো মাংসা দ্বারা তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর।" ফলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীকে সনাক্ত করেছিল। ফলে তারা ধরাও পড়লো আবার কোরবানী দিতেও বাধ্য হলো। আল্লাহ এই ঐশী ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন এভাবে, 'এইরূপে আল্লাহ মৃতকে (মৃত ব্যক্তির সাথে মৃত জাতিকেও) পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে তোমাদের দেখান তোমরা যাতে হৃদয়ঙ্গম করো"। (সূরা বাকারা-৭৩)

কিন্তু এহেন ঘটনার পরও তারা দৃশ্য খোদাকে (গোবৎসকে) বাদ দিয়ে অদৃশ্য খোদাকে মেনে নিতে রাজী হয়নি, মেনে নিতে রাজী হয়নি বৈষয়িক স্বার্থের কারণে। সেজন্য তারা নবীদের হত্যার ন্যায় জঘন্য সাংঘাতিক কাজও করেছিল। সূরা বাকারার ৯১ আয়াত পর্যন্ত তাদের দুষ্কৃতির বিবরণ দিয়ে ৯২ আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই মুসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল, তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে গোবৎসকে উপাস্যরূপে মেনে নিলে—সত্যই তোমরা মহা অপরাধী ছিলে।" এজন্য তুর পাহাড় মাথার উপর তুলে তাদের কাছ থেকে তওরাত মেনে চলার শপথ গ্রহণ করলেও তারা গোপূজা ছেড়ে এক অদ্বিতীয় আলেমূল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞাতা অদৃশ্য খোদাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই ৯৩ আয়াতে বলা হলো, "তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদের অন্তরে বাছুরের প্রীতি সঞ্চিত হলো"। স্থূলজ্ঞানীরা দুনিয়াপূজক হয় তাই তারা বস্তুপূজা ভালবাসে আর সূক্ষ্মদর্শীরা খোদাপূজক হয়। তাই গোপূজক অর্থাৎ গায়রুল্লাহ পূজক ও আল্লাহ পূজকদের পথ ও পন্থা পৃথক হয় এই মৌল সত্য বোঝানই এই সূরার উদ্দেশ্য। সূরা বাকারার এই মৌল তত্বকে সার্বজনীন রূপ দেওয়া হয়েছে সূরা আরাফে। সূরা আরাফের ১৮ রুকূতে গোপূজা সংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে সত্যপন্থীদের ভূমিকা কেমন ছিল তা দেখানো হয়েছে। অতঃপর ১৯ রুকূতে হযরত মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করেন। আল্লাহ বললেন যারা অন্যায় করবে তারা শাস্তি পাবে আর যারা ন্যায় করবে তারা ক্ষমা ও মুক্তি পাবে। অন্যায়ের কারণে ইহুদীরা কঠিন আযাবে লিপ্ত হয়ে পড়লেও তারা নবী রসূলদের অনুসরণ করলে করুণা প্রাপ্ত হবে। তাদের স্থূল বাহ্যজ্ঞান তাদের কোন কল্যাণ দেবেনা বরং তাদের অহংকারে অন্ধ করে দেবে। তারা যদি অহং পরিত্যাগ করে নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে যাঁর শিক্ষা হবে তওরাত ইঞ্জিলের অনুরূপ তাহলে তারা বেঁচে যাবে। তিনি পবিত্রকে বৈধ ও অপবিত্রকে অবৈধ করবেন এবং তাদের উপর শতাব্দীকালের আরোপিত আবর্জনা যা তাদের কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছে তা থেকে

মুক্ত করবেন। নিরক্ষর নবীকে মেনে নিয়ে তাঁর সাথে সাহায্য সহযোগিতা করলে মুসার কওম নবজীবন লাভ করবে অন্যথায় নৈব চ নৈব চ। কেতাবের গুরুভার বহন না করে দুনিয়াপূজক হলে গরুর ন্যাজ ধরে বৈতরণী পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই সূক্ষ্মদর্শী সত্যপূজকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অদৃশ্য খোদার বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করে নামাজ পড়, জাকাত দাও, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল দিয়ে নেতার নেতৃত্বে সংগ্রাম কর। দুনিয়া ও আখেরাতে এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। বাকারার ব্যাখ্যা করে সূরা আরাফের ১৫২ আয়াতে বলা হলো, "যে কেউ খোদার পরিবর্তে গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে সে খোদার গজবে (ক্রোধে) নিপতিত হবে এবং দুনিয়াতেই লাঞ্ছনার জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে (দ্রঃ ইতিহাসের আলোকে গোপূজা)"। তাই আল্লাওয়ালা লোকেরা যদি গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালকদের সাথে থাকে তাহলে তাদেরও দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ হবে। গোপূজকদের সাথে থাকতে থাকতেই ইহুদীরা গোপূজক হয়ে গিয়েছিল। তাই গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালকদের বিরুদ্ধে ও তাদের অনুগত স্বজাতিদের বিরুদ্ধে হযরত মুসার (আঃ) মতো সংস্কার আন্দোলন করার ইংগিত প্রদান করা হয়েছে এ সূরায়। গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালর্ক শাসককে রাব্বুল আলামিনের গোলাম হবার জন্য ডাক দেওয়া এবং তাতে শাসক সম্প্রদায় গোঁড়ামী প্রদর্শন করলে মোমেনদের স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা এবং কেউ কারও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ না করে এমন সমঝোতায় আসা এবং তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্বদেশ পরিত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়ে। হযরত মুসা (আঃ) একাজই করেছিলেন কিন্তু অন্যত্র স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য ইহুদীরা জেহাদ করতে রাজী না হওয়ায় বরং জেহাদের পরিবর্তে ভোগবাদী হওয়ার কারণে ইহুদীরা অভিশপ্ত হয়। হযরত দায়ূদ ও হযরত ঈশা (আঃ) তাদের জেহাদবিমুখ গাই গরু হওয়ার জন্য বদদোয়া করেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী আসুরিয়া, গ্রীক, রোমানদের আক্রমণে ইহুদীরা রাষ্ট্রবিহীন প্রজায় পরিণত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ যেন এমন গাইগরু হয়ে না যায় তা বোঝাবার জন্য সূরা বাকারায় গোপাল হওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা বাকারার আলোচ্য

(এ সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এটি ৮৭ নং সূরা, এতে ৪০টি রুকূ ও ২৮৬টি আয়াত ও ৬২২টি শব্দ বর্তমান। এর অক্ষর সংখ্যা-২৬,৭৯২)।

'সর্বশক্তিমান অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে' এই বিশেষ বাক্যটি কোরানের প্রায় প্রতিটি সূরার প্রথমে লক্ষ্য করা যায়। এক মৌলিক ভুলের প্রতিবাদ ও আসল সত্য প্রকাশই এর লক্ষ্য। স্থূলদর্শীদের ধারণা বিশ্ব সর্বশক্তিমানের অংশ বিশেষ এবং তাঁর সত্তা থেকেই এটা জাত। পবিত্র কোরান এই অপবিত্র ধারণার প্রতিবাদ করে বলতে চায় এ ধারণা সত্য নয়, মিথ্যা। সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে জাত নয় বরং সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে আল্লাহর নামে, আল্লার আদেশবলে। তাঁর হুকুমে এ অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাঁরই হুকুমে এ চালু আছে। এর অস্তিত্ব ও ধ্বংস তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর অস্তিত্বই তাঁর দয়ার প্রকাশ। এজন্যই তিনি রহমান রহীম, দয়ালু-দাতা। পবিত্র কোরানও তাঁর রহমতের প্রকাশ। আসমান যমীনে যত রহমত আছে তার মধ্যে এ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। এ হচ্ছে 'লওহে মহফুজ' বা খোদার সংরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জাত। তাই তাঁর নামেই এটা পঠিত হওয়া উচিত কারণ এটা তাঁর কাছে থেকেই এসেছে, অন্য কারও কাছ থেকে আসেনি।

এ তথ্য প্রদানের পর বলা হয়েছে আলিফ, লাম, মীম অর্থাৎ মহিমাময় আল্লাহর (ফরমান) এই গ্রন্থ যা সকল সংশয়ের ঊর্দ্ধে। এ সুপথ প্রদর্শন করে স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত চিত্ত বিচক্ষণ মানুষদের (মুত্তাকীদের) যারা গায়েবে বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। এই গায়েব বা আদৃশ্যকেই গৌতম বুদ্ধ শুন্যে বিশ্বাস বলেছেন। এ শুন্য মানে ফাঁকা নয়। শুন্য মানে যা মূর্ত নয়, বিমূর্ত অর্থাৎ যারা স্থূল জগতের অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবনে সক্ষম এ পবিত্র গ্রন্থ তাদের আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রদান করে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করায়। যারা সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টাকে অনুধাবন করে তার প্রতি প্রণত হয়ে প্রণতি জানায় ও স্রষ্টাপ্রদত্ত সম্পদ স্রষ্টার পথে অকাতরে খরচ করে অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসী, নামাজী ও জাকাত দেনেওয়ালা এবং সেই সঙ্গে তোমার (মোহাম্মদের) প্রতি অবতীর্ণ অহী বা প্রত্যাদেশ এবং তোমার পূর্বে অন্যান্য নবী পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ অহী বা প্রত্যাদেশ এবং আখেরাত বা পরকালতত্ত্বেও যাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় যার ফলে তারা বাহ্য ইহকালের উপর পরকালীন জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে সংগ্রাম সাধনায় লিপ্ত হতে পারে তারাই তাদের প্রতিপালকের সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার অনন্ত স্থায়ী ক্রমবর্ধমান কল্যাণের অধিকারী হবে। এই সূক্ষ্মদৃষ্টি যাদের

নেই নেই স্থূলদর্শীদের তুমি সতর্ক কর আর না কর তা সবই সমান কারণ তারা বোকা গাইগরু মাত্র। খাবে আর দুধ দেবে—হয় বাছুরকে নয় অন্যকে। দুনিয়াকে তারা কামধেনুর মত দোহন করবে। একেই মনে করবে সনাতন, আছে ও থাকবে। বারবার মরবে আর জন্মাবে আর এখানে এসে খাবে। গরু যেমন চারণক্ষেত ছাড়া কিছু বোঝেনা এ ধরনের লোকও সেরূপ। তাদের এই ইহসর্বস্ব মানসিকতার জন্য তারা কালা-বোবা-অন্ধ পশুর মতো হয়ে যাবে। তারা দেখেও দেখবেনা, শুনেও শুনবেনা, তারা হৃদয়শুন্য বিবেকশুন্য পাষাণ যেমন শীলমোহর মারা নিরেট অজ্ঞতার ডিবে। এই চেতনাশুন্য জড় পদার্থের জন্য সাংঘাতিক আযাব ছাড়া কিছু নেই কেননা এরা জ্ঞানী হতে অনিচ্ছুক। নাকের ডগার বাইরে কোন কিছু দেখতে ইচ্ছুক নয়। তাই এদের মুক্তি নেই। সূরা বাকারার প্রথম রুকূতে বলা হলো মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকারের লোক বিদ্যমান সৎ আর অসৎ। সূক্ষ্মদর্শীরাই সৎ হয় আর অসৎ হয় মোটাবুদ্ধির লোকেরা। এই অন্ধকারের জীবেদের ছদ্মবেশীরূপ বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় রুকূতে। স্থূলদর্শীরা প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝে ইসলামের পোষাক পরে আল্লাহ ও আল্লাওয়ালাদের প্রতারিত করতে চায়। তারা তাই বলে আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনেছি। এই মৌখিক ঈমানের কোন মূল্য নেই। এতে তারা নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজী করে মাত্র। তাদের মনে আছে কপটতার রোগ। আল্লাহ তাদের এই দ্বিমুখীনতার রোগ বাড়িয়ে দেন। তাদের কার্যকলাপের ফলে দুনিয়াতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় অথচ তারা এটা স্বীকার করতে চায়না বরং তারা বলে আমরা সংস্কারপন্থী। তারা সংস্কারপন্থী নয় বরং প্রকৃত ফ্যাসাদকারী, সংস্কারপন্থী তো আল্লার নবী। মানুষ আল্লাকে ভুলে গায়রুল্লাহর গোলাম হয়ে সংস্কারান্ধতায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ এই সংস্কারান্ধতা থেকে মুক্তির জন্য সংশয়হীন বাণী পাঠিয়েছেন অথচ তারা তা কবুল করতে নারাজ অথচ বলে তারা সংস্কারকামী। তাদের যখন দ্বিমুখীনতা ছেড়ে একমুখী হওয়ার কথা বলা হয় তখন তারা বলে এটা নির্বুদ্ধিতা অথচ প্রকৃত নির্বোধ তারাই কারণ সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের মধ্যে আপোষ সম্ভব নয়। যখন যেমন তখন তেমন তাদের নীতি। এই সুবিধাবাদীনীতি তাদের সত্য বিমুখ হতে সাহায্য করে। তাদের আসল দেবতা স্বার্থপূজা। এ গোপূজকদের নীতি। এ ধরনের লোক সুপথ বঞ্চিত হয়। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা শেষ পর্যন্ত লাভদায়ক হয়না। এদের দৃষ্টিশক্তি সীমিত। সত্যের আলোয় এদের চোখ ধেঁধে যায়। এরা কিছুই দেখতে পায়না। ফলে সামান্য দেখতে পেলেও আসলে এরা দৃষ্টিহীন। আঁধারের জীবদের মতই কালা-বোবা-অন্ধ। তারা সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে রাজী হয়না। সত্যের পথে তারা ঝুঁকি নিতে নারাজ। সত্য বারিধারার ন্যায়।

বৃষ্টির সাথে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ আছে। এসব আছে বলে যারা বৃষ্টির থেকে বাঁচতে চায় তারা ফসল পাবেনা। ত্যাগ-কোরবানী ছাড়া সংস্কার আন্দোলন কামিয়াব হয়না। আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে আল্লার উপর কারণ তিনি সর্বশক্তিমান।

তৃতীয় রুকূতে বলা হয়েছে গায়রুল্লাহকে বাদ দিয়ে একনিষ্ঠভাবে তোমাদের ও তোমাদের পূর্বগামী লোকদের স্রষ্টা আল্লাকে তোমাদের কর্তারূপে মেনে নাও কেননা এ ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। যাদের তোমরা পূজা কর তারা তো কেউ আসমান যমীনের স্রষ্টা নয়, আসমান যমীনের স্রষ্টা তো আল্লাহ। তিনিই বারিবর্ষণের মাধ্যমে তোমাদের রুজীর ব্যবস্থা করেন। এই মহান ব্যবস্থাপক আল্লার সাথে তুলিত হতে পারে এমন কেউ নেই।

হযরত মোহাম্মাদের (সঃ) প্রতি যে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য কিনা যদি তাতে সন্দেহ হয় তবে তোমরা তোমাদের পূজ্য দেব-দেবীর সাহায্য নিয়ে অনুরূপ একটা সূরা রচনা করে আনো। এটা তোমরা পারবেনা কারণ তোমাদের পূজ্য খোদা কেতাব প্রদানে অক্ষম। হয় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো নয় আত্মসমর্পণ কর। অন্যথায় অবিশ্বাসের ফল মারাত্মক হবে। অবিশ্বাসীরা সুবিধাবাদী ও চরিত্রহীন হতে বাধ্য, আর নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীরা চরিত্রবান ও পুণ্যবান হয়। পুণ্যবানরাই স্বর্গের বাসিন্দা হবে। আর অবিশ্বাসীরা ও তাদের ইষ্ট দেবতা পাথরগুলোও জ্বলন্ত কয়লায় পরিণত হবে। যারা যার পূজা করে তারা তার গুণ প্রাপ্ত হয়। পাথর পূজকরা তাই পাথরের মত শক্ত থাকে। স্থূলদর্শিতার কারণে অবিশ্বাসীরা মৌল বিষয় ছেড়ে গৌণ বিষয় নিয়ে টানাটানি করে। তাই তারা প্রশ্ন তুলেছিল কোরানে মৌমাছি, মাকড়সা প্রভৃতি ছোট ছোট জীবের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় কেন? আল্লার কথা হলো উপমা তো বিষয়বস্তু বোঝবার জন্য এতে ছোট বড়র প্রশ্ন অর্থহীন। তাই মোমেনরা জ্ঞানী হওয়ার জন্য এটা সহজেই বুঝতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এতটুকু বুঝতে পারেনা। একই উপমা দ্বারা জ্ঞানী পথ পায়, অজ্ঞানী বিভ্রান্ত হয়। যারা সত্যসন্ধানী না হয়ে চরিত্রহীন বস্তুবাদী তাদের বিভ্রান্ত না হয়ে উপায় নেই। আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে মৌমাছি, মশা, মাকড়সা, পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এতে যারা অলংকার প্রিয় তর্করত্ন, বাক্যবাগীশ যাদের নামই হয় তর্করত্ন বিদ্যালংকার তারা এহেন কালামকে সাহিত্য গুণান্বিত, প্রাসাদগুণসম্পন্ন মনে করতে পারেনা। তারা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করাও পছন্দ করেনা বরং তারা এমন ভাষা ব্যবহার করতে চায় যা High Sounding অথচ শুন্যগর্ভ থাকে। তারা ভাষাকে জনগণের বোধগম্যতা থেকে দূরে নিয়ে

যেতে চায়, তারা চায় যে শুধু তাদের মতো পণ্ডিতরাই তাদের ভাষা বুঝুক। এজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে সংস্কৃতের ন্যায় এক জটিল, দুর্বোধ্য ও কর্ণপীড়াদায়ক কৃত্তিম ভাষা পয়দা করেছেন যাতে কেউ সহজে পড়তে ও বুঝতে না পারে। যাতে এই দুর্বোধ্যতার বদলে তাদের পাণ্ডিত্য বজায় থাকে (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানবার জন্য 'ধ্বংসের পথে ভারত' নামক পুস্তকের ব্রাহ্মণ্যলবীর ভাষানীতি দ্রষ্টব্য) এই কঠিন দুর্বোধ্য ভাষা তৈরী করা হয়েছিল মানুষকে জ্ঞান দান করার জন্য নয়, মানুষকে জ্ঞান বঞ্চিত করার জন্য। তারা উপমা উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রেও সহজ সরল দৃষ্টান্ত দিতনা, দৃষ্টান্ত দিত বড় বড়, যে কারণে উপমা কালিদাসস্য নামক প্রবাদই চালু হয়ে গেছে। সমস্ত শিয়াল পণ্ডিত সেই কাব্য সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য আখ্যা দেয় যাতে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় জটিলতা আছে যা বোঝার জন্য অলংকার শাস্ত্র পড়তে হয়। বাল্মিকীর রামায়ণ, মহাভারত, হোমারের ইলিয়াড ওডেসী প্রভৃতি পড়তে হলে আপনাকে এ্যারিস্টলের পোয়েটিক্স থেকে শুরু করে অনেক কিছু নন্দনতত্ব পড়তে হবে। যা সহজ সরল বোধগম্য তাকে তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলা হয়না। যার ভাব-ভাষা এমন যা হেঁয়ালিপূর্ণ, যা কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায়না, যাতে কোন হেদায়েত বা সুস্পষ্ট পথ পাওয়া যায়না, যা অস্পষ্ট উদ্ভট গোঁজামিল তাকে মনে করা হয় বিরাট সাহিত্যকীর্তি। যেমন হনুমান গন্ধমাদন পর্বতটাই উপড়ে নিয়ে চলে এল। হনুমানের নামে এ ধরনের পাবলিসিটিতে মুগ্ধ হয়ে নির্বোধ জনসাধারণ হনুমান পূজা শুরু করে নিজেরা বানর স্বভাব প্রাপ্ত হলো। শিয়াল পণ্ডিত যা কিছু অদ্ভুদ উদ্ভট কথা বলে, যত বুদ্ধির অগম্য কথা বলে ততই লোকে মনে করে এসব বিরাট ব্যাপার। আমরা না বুঝলেও মেনে নেওয়া দরকার, কেননা বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর অথচ পণ্ডিতরা সব তর্করত্ন বিদ্যালংকার। অর্থাৎ জনসাধারণ তাদেরকে প্রশ্ন করে যাতে বিব্রত করতে না পারে সেজন্য তিনি তর্কশাস্ত্র শিখে জনাসাধারণের মুখ বন্ধ করার জন্য রেডি আছেন। সহজ সত্য নিয়ে তর্করত্নরা মুশকিলে পড়ে গেল। তারা তখন প্রসংগ এড়িয়ে যাবার জন্য বললো এ কেমন করে খোদার কালাম হয় যাতে এত ছোট সহজ সরল দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। মহাকাব্যের উপযোগী নয় এর উপমা উৎপ্রেক্ষা। সাধারণ মানুষ মহান আল্লার এ দৃষ্টান্ত বুঝতে পারে। তারা ভাবে সত্যিই তো যাকে বলা হচ্ছে সত্যম, শিবম, সুন্দরম, যার বউকে বলা হচ্ছে আদ্যাশক্তি তার খাদ্য মাছি খাচ্ছে, তাও তাড়াবার মুরোদ নেই সে আবার সর্বশক্তিমান? পণ্ডিতের পায়ের তলার মাটিই চলে যায়। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শিবরাত্রিতে শিবমন্দিরে শিবকে প্রদত্ত ভোগ ইঁদুরকে খেতে

দেখে শিবের পূজা ছেড়েছেন, ছেড়েছেন সাকার পূজা) আল্লাহ-পাক বলতে চান যে এই তথাকথিত ঠাকুররা মশা-মাছির থেকে হীন। তর্করত্নদের গায়ে লেগেছিল। তারা আত্মজ্ঞান হারিয়ে তাই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে কখনও মহাজ্ঞানবান ও শক্তিমান খোদাকে কাবু করা যায়না, যাবেনা। তর্করত্নের প্রশ্নই তার বিপদের কারণ হয়। আল্লাহ বল্লেন মশা-মাছি বা এ ধরনের দৃষ্টান্ত পণ্ডিত রচিত মহাকাব্যের বা পুরাণের অনুপোযোগী হলেও ঐশীগন্থের জন্য অনুকূল কারণ ঋষি বাক্য ও ঐশীবাক্য এক নয়। বজ্রগর্ভ অসার ভাষণের কোন মূল্য নেই Empty vessels sound much । তাদের ঠাকুরগুলো মশা-মাছির থেকেও হীন। যদি বলা হয় সিংহআসীনা সিংহের থেকেও হীন তাহলে তবুও তার কিছুটা প্রতাপ স্বীকার করে নেওয়া হতো কিন্তু মশা-মাছির দৃষ্টান্ত খুবই যথাযথ হয়েছে। মশা-মাছিকে জানেনা এমন সাধারণ মানুষ কোন দেশেই নেই। তাই-সাধারণ মানুষ সহজেই আসল সত্য বুঝতে পেরে ঠাকুর পূজো পরিত্যাগ করে অদৃশ্য সর্বশক্তিমান আল্লার পূজা করবে। ঠাকুর দেবতার নামে কামাই রোজগার করে যে তর্করত্নের দল, তারা মামলা বুঝেও কায়েমী স্বার্থের কারণে তা পরিত্যাগ করতে পারবেনা। ফলে শিয়ালপণ্ডিতরা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করতে পারবেনা। তাদের পাণ্ডিত্যই তাদের কাল হবে। একই দৃষ্টান্তের দ্বারা পণ্ডিত বদমাশ বিভ্রান্ত হবে আর সরলমনা সাধারণ মানুষ পণ্ডিতের পরোয়া না করে তার শাস্ত্র, কাব্য-মহাকাব্য বাদ দিয়ে আল্লার মহাসত্য খুব সহজেই উপলব্ধি করবে আর জনসাধারণের সত্য বোধগম্য হলে পণ্ডিতের মহাকাব্য ও তার ধর্মব্যবসা লাটে উঠবে। আল্লার মশা-মাছির দৃষ্টান্ত তাই দুধারী ধার শাঁখের করাতের মতো, তা দুদিকেই লাভদায়ক। এটা সৎ মানুষের জন্য লাভদায়ক, অসৎ মানুষের জন্য ক্ষতিকার। আল্লাহপাক এমনভাবে দৃষ্টান্ত দেন যাতে পরীক্ষা নিহিত থাকে। যে পাশ করার সে পাশ করে, আর যে ফেল করার সে ফেল মারে। এই কেতাবের দ্বারা তাই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ পুরোহিত সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু আম-জনতা মুক্তির পথ পায়।

ইতিহাস পাঠে দেখা যায় আল্লাহপাক গোব্রাহ্মণ শাসকদের মাছির থেকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। একটা কাঁনা মাছি দিয়ে তিনি নমরুদের (নারদ খোদা) ন্যায় জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী প্রবল প্রতাপান্বিত ইরাকী চন্দ্রপূজক শাসককে ধ্বংস করেন। মশা মাছির মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধি আমদানী করে তিনি বড় বড় পাপাচারী বস্তীকে পর্যন্ত উজাড় করে দেন। এজন্যে ফেরেশতা প্রেরণ করার দরকার হয়না। আহমদাবাদে ইঁদুরের মাধ্যমে প্লেগ দিয়ে তিনি পণ্ডিত ভক্তদের উজাড় করে দেন। ১৯৯৬ সালে

বেদ-ব্রাহ্মণ প্রতিপালকরাজ্য দিল্লীতে ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপও এর সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত।

মাছি বিরক্ত করে নাকে। একবার খলিফা মনসুর দরবারে বসেছিলেন। তিনি বিখ্যাত খলিফা হারুণর রশীদের বাবা। মাছি তাঁর নাকের কাছে ভন ভন করছিল। তিনি তাড়িয়ে পারছিলেন না। খলিফা মনসুর বিরক্ত হয়ে রাগ ভরে জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ কেন মাছি পয়দা করেছেন বলতে পারো? ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) দরবারে হাজির ছিলেন। তিনি বললেন অহংকারীকে শাস্তি দেবার জন্য। খলিফা লজ্জিত হলেন। যারা মাছির সাথে লড়েতে পারেনা তারা আল্লার সাথে লড়তে চায়। তাদের নির্বুদ্ধিতাকে প্রকট করার জন্য ও জ্ঞানীদের সবক গ্রহণ করবার জন্য আল্লাহ তাই মশা মাছির দৃষ্টান্ত দেন।

২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে কেবল খোদরই আনুগত্য করা যেতে পারে আর কারও আনুগত্য করা যেতে পারেনা। মানবীয় সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং শান্তি বজায় রাখতে হবে এটাই ঐশী নির্দেশ। এর বিপরীতগামীরা ব্যর্থ হবে অর্থাৎ পৃথিবীতেও ব্যর্থ ও পরজীবনেও ব্যর্থ হবে। শেষমেষ আল্লার বক্তব্য হলো তোমরা অস্তিত্বহীন ছিলে আল্লাহ তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন আবার তিনিই তোমাদের প্রাণহীন করবেন অতঃপর পুনরায় হিসাবের জন্য জীবিত করবেন তৎসত্ত্বেও তাঁকে তোমরা অস্বীকার করছো কিভাবে? যাদের তোমরা পূজা কর তারা তো তোমাদের কিছু করেনি, এমনকি তোমাদের মাথার উপর যে আসমান দেখতে পাও সেও তো তাঁরই দান।

তৃতীয় রুকূ পর্যন্ত সাধারণ ভূমিকা দানের পর চতুর্থ রুকূ থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ইতিকথা বর্ণনা করা হয়েছে (মানব-দানব ও দেবতার কথা বলা হয়েছে।) ৫ম রুকুতে বণি ইসরাঈলদের কোরানকে মেনে নেবার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাদের অঙ্গীকার ১০ রুকূতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৭ আয়াতে উল্লেখিত অঙ্গীকারও এটাই। লোকসমাজকে ভয় না করে, স্বার্থপরতার নীতি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র খোদাকে ভয় করার যে নীতি তা গ্রহণ করাই প্রকৃত ধার্মিকদের কাজ অন্যথায় তা হবে বকধার্মিকতা । শুধু খোদাকে ভয় করাই সত্যনীতি। বনীইসরাঈলীরা সত্য মিথ্যা সংমিশ্রিত করে ফেলেছিল। কোরান মিথ্যাকে বাদ দিয়ে শুধু সত্য প্রকাশ করেছে। নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়াই প্রকৃত খোদাভীতি কিন্তু ইহুদীগণ নামাজ পরিত্যাগ করেছিল আর যাকাতও দিতনা অধিকন্তু সূদী ব্যবসা চালু করেছিল। মানব সেবার পরিবর্তে মানব শোষণ তাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই শোষণকারীরা নিজেদের শিক্ষিত ও আলেম হওয়ার গর্ব করতো আর অন্যদের বলতো গোমূর্খ অথচ তারাই

ছিল গোমূর্খ। ৬ষ্ট রুকূতে তারা কতটা গোমূর্খ ছিল তার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তারা গরুর মতই পেট ছাড়া কিছু বুঝতোনা। তাই তারা পেটপূজক গাই গরুর পূজা করে একাবারে গাইগরু হয়ে গিয়েছিল। খোদা প্রদত্ত স্বল্প হালাল রুজী তাদের পছন্দ হয়নি। তারা আরও পর্যাপ্ত রুজী পেতে চেয়েছিল সেজন্য তাদের খোদাবদী হয়ে খোদার পথে লড়াই করে খোদায়ী শাসন বা খেলাফত কায়েম করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তারা খেলাফত কায়েম না করে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা লুটপাট, মারদাঙ্গা ও শোষণের নীতি অনুসরণ করেছিল। তারা পেট-পূজারী হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা শাস্তি পেল। এই অপবিত্রদের আল্লাহ প্লেগ দিয়ে ধ্বংস করলেন।

কেন এমন হলো? এরা ছিল ইসরাঈল বা আল্লার সৈনিক। এঁদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ নক্ষত্রপূজা, লিঙ্গপূজা, পেটপূজা পরিহার করে ঐশী দায়িত্ব পালনে ধৈর্য্য, অধ্যবসায়সহ হিজরত করেছিলেন। ফলে তাঁদের বানানো হয়েছিল মানবজাতির ইমাম। তাঁদের অনুসারীরা আরামপ্রিয়তার কারণে ঐশীদায়িত্ব পালন না করায় ইমামত বা নেতৃত্ব হারিয়ে গোলাম হয়েছিল। ফ্যারাও বা সূর্য পূজারীগণ তাদের নিকৃষ্টতম গোলামীর জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল। তাদের হৃদয় পরকালের স্মরণশুন্য হওয়ার কারণে এ বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তাদের বলা হয়েছিল এমন দিনের জন্য কাজ করতে, যেদিন কেউ কারও কাজে আসবেনা, কারও সুপারিশ কারও জন্য কাজে আসবেনা, কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও গ্রহণ করা হবেনা এবং বার থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবেনা। ৪৮ নং আয়াতের এই মৌলিক মৌল শিক্ষা বিস্মৃত হওয়ায় তারা ফ্যারওদের গোলামীতে পড়েছিল। তারা তাদের যুবসমাজকে হত্যা ও নারীদের দেবদাসী করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এটা তাদের জন্য স্রষ্টার তরফ থেকে প্রদত্ত পরীক্ষা ছিল যাতে তারা তাদের ভ্রান্তনীতির ফল উপলব্ধি করে ইসরালাঈলপন্থী হয়, খোদার পথে সংগ্রামী হয়। এজন্য হযরত মুসাকে (আঃ) পাঠানো হয়। তাঁর নেতৃত্বে তারা ফ্যারাওদের গোলামী মুক্ত হয় ও ফ্যারাওয়ের সলিল সমাধি ঘটে। আল্লার এই বিরাট অনুগ্রহের দরুণ তাদের তাঁর শোকর গোজার হওয়া উচিত ছিল। তারা গোলামী যুগের শের্কে লিপ্ত হয়। তারা বাছুর পূজো করে। তারা এতটা দৃষ্টিহীন পশু হয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও তাদের জাতি হিসাবে বিনাশ না করে তাদের মুক্তিপথ প্রদান করা হলো। হযরত মুসা (আঃ) বা মহাত্মা শম্বুক মারফত তাদের পুরাণ ও কুরানের (ঐশী তওরাত) ফারাককারী ফোরকান (মানদণ্ড) দেওয়া হলো। তাদের শাস্তিদানের মাধ্যমে পবিত্র করা হলো তৎসত্ত্বেও তারা খোদাকে চর্মচক্ষে দেখতে চাইলো। তাদের বজ্রাহত করা হলো এবং তাদের পুনরায় জীবিত করা হলো,

মেঘ দিয়ে ছায়া দান করে তাদের সূর্যতাপ থেকে মরুভূমিতে রক্ষা করা হলো, দেওয়া হলো "মান্না সালওয়ার" রিলিফ কিন্তু তবুও তারা কৃতজ্ঞ হলোনা। তারা আরও রেশন বাড়াবার দাবী করেছিল যাযাবর জীবনে সফরের সময় যা আদৌ সম্ভব ছিলনা। এজন্য তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন ছিল। তাদের জর্ডানের পূর্ব দিকের এক শহরে প্রবেশের অনুমতি অনুমুতি দেওয়া হলো যাতে তারা খোদার শোকরগোজারী করে। তাদের বিনয় নম্রতার সাথে শহরে প্রবেশ করতে বলা হলো যাতে তারা জনগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং তাদের নিকট মুসিবতজাদা ভাই হিসাবে গৃহীত হয়। তাদের দিলে যাতে তাদের জন্য স্থান পয়দা হয়। তাদের পূর্বকৃতকর্ম স্মরণ করে তাদের অনুতপ্ত হওয়া এবং জালেমবস্তী থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা নতুন দেশে লুটপাট শুরু করে দিল। তারা নানা প্রকার অনৈতিক কাজ খুন জখম-হত্যা ধর্ষণ ও শের্ক বেদাতে লিপ্ত হলো। ফলে তারা প্লেগে ধ্বংস হয়ে গেল। তারা একাবারেই গাইগরু হয়ে গিয়েছিল।

৭ম রুকুতে তাদের মধ্যে যারা সদাচারী ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুসা বনিইসরাঈলীদের যে বারোটি গোষ্ঠী তাঁদের সাথে ছিল তাদের জন্য পানি প্রার্থনা করলেন কারণ নতুন দেশে তারা বড় পানির কষ্টে পড়েছিল। মহান আল্লাহ তাদের সংগত দাবী পূরণ করলেন। তাদের খোদা প্রদত্ত রেজেকের শোকর করতে বলা হলো, বলা হলো সর্বপ্রকার দুষ্কৃতিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে। স্বভাব না যায় মলে-ইল্লত না যায় ধুলে—এই প্রবাদ বাক্য তাদের জন্য সত্যে পরিণত হলো। তারা হযরত মুসাকে খোদার কাছে ভূমিজাত ফসলাদি যেমন গম যব ডাল, শাক-সব্জি, পিয়াজ-রসূন, শশা ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান জানালো, তারা কি অবস্থায় ছিল কি অবস্থায় এলো। সে সবের জন্য তাদের রবের কাছে আরও নত-বিনীত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তারা গাই গরুর মতো চারণক্ষেতের উৎপাদন বাড়াবার দরখাস্ত করলো। তারা খোদাকে লক্ষ্মীঠাকুর ও হযরত মুসাকে তার পূজারী হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। এ সেই গো-মানসিকতা যা অদৃশ্যভাবে তাদের মধ্যে কার্যকরী ছিল। আল্লার রাস্তায় পানি খেয়ে সংগ্রাম করতে তারা আদিষ্ট ছিল কেননা উত্থানের পথ এটাই কিন্তু তারা সংগ্রাম না করে ভাল খাওয়া-পরার জন্য উদগ্রীব ছিল। সংগ্রাম ও নেতৃত্ব বাদ দিয়ে যে কোন প্রকারে রুজী-রোজগার তাদের কাম্য ছিল। তাই হযরত মুসা বলেছিলেন তোমরা ভালোকে মন্দ দ্বারা বদল করতে চাও?

এ প্রসংগে আরও দু-একটা কথা বলা আবশ্যক। হযরত মুসা ও হারুণ ছিলেন হযরত ইয়াকুবের (আঃ) বড় ছেলে লেভীর বংশধর। ইনি তাঁর ভায়েদের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন। তারা পুরোহিতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেজন্য রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। পুরোহিত প্রথা বা ব্রাহ্মণ্যবাদের সূচনা সম্ভবত এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। হযরত মুসা ও হারুণ তাদের বারো গোষ্ঠীর পুনর্বাসন করেছিলেন। তাদের রুহানী খাদ্যের অভাব ছিলনা। জৈবিক খাদ্য কম করে দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ভোগী হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে না ফেলে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কবে চর্ব্যচোষ্যলেহ্য ছাড়া বাঁচতে চেয়েছে? তাই হযরত মুসা (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোন টাউনে চলে যাও। তাহলে তোমরা যা চাচ্ছ তা পাবে। তবে গোলামীই হবে তোমাদের বিধিলিপি। গোলামীর চেন পরে পেট মোটা কুকুর হওয়ার থেকে চেনবিহীন পেটরোগা কুকুর হওয়া ভাল। কিন্তু যেহেতু তারা পেটের কুকুর ছিল তাই হযরত মুসা (আঃ) তাদের মিশরে যেতে বলেছিলেন যেখানে গোলামী ছাড়া কিছু নেই। পক্ষান্তরে সামনের দিকে প্রতিশ্রুত দেশ ফিলিস্তিন। তারা প্রতিশ্রুত বরকতময় দেশ ফিলিস্তিন প্রবেশ করলেও তারা খোদাবাদী হলোনা। ভোগবাদীই হোল। ফলে তারা ইরাকীদের আক্রমণের শিকার হলো এবং সেখানে বন্দী হিসাবে আনীত হলো যে দেশ ছিল অভিশপ্ত দেশ। তারা পারস্য কর্তৃক বন্দীদশা মুক্ত হলেও তারা পুনরায় গ্রীকের গোলাম হলো, গোলাম হলো রোমানদের। সূরা বনি ইসরাঈলে এসবের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। সূরা বাকারা এমন মৌলিক সূরা যে অন্যান্য সূরার তা জননীও বটে। এখানে যা সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে অন্যত্র তা রয়েছে বিস্তৃতভাবে। পেটের কুকুর হওয়ার জন্য যাদের নেতা হওয়ার কথা তারা পরাধীনতা গোলামী ও লাঞ্ছনার শিকার হলো। এসবের কারণ হলো তারা আল্লাহর গজবে পড়েছিল, "এটা এজন্য ছিল যে তারা আল্লাহ আয়াত (সত্যসতর্ক) প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করেছিল। তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের ফলে তারা সীমালংঘন করে গিয়েছিল অর্থাৎ স্বৈরাচারী হয়ে গিয়েছিল।"। (সূরা বাকারা ৭৫ রুকূ) যারা আল্লার আদেশ নিষেধ অমান্য করে, নিজেদের কল্যাণকামী সংস্কারবাদী নেতাদের হত্যা করে তারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্থূলদৃষ্টির লোক অর্থাৎ গাই গরু যে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চলে।

অষ্টম রুকূর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যারা কোরানে বিশ্বাসী অথবা তওরাতে বিশ্বাসী, খৃষ্টান অথবা নক্ষত্রপূজক সম্প্রদায় তাদের সম্প্রদায়গত পরিচয় যাই হোক তাদের মধ্যে যে কেউ অদৃশ্য আল্লায় আস্থা স্থাপন করে পরকালের জন্য কাজ করবে যেমনটা ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে ভাল কাজের আঞ্জাম দেবে তারা তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ পাবে। কিন্তু তা না করে আমরা

অমুক সম্প্রদায়ভুক্ত একথা বলে কেউ পার পাবে না। ইসলাম কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এর দ্বার সকলের জন্য খোলা, সকল সূক্ষ্মদর্শী লোক সে যে সম্প্রদায়ের হোক। ইসলাম হযরত মোহাম্মদের (সঃ) উদ্ভাবিত নতুন কোন ধর্ম নয়। মনুর পর এর প্রধান ছিলেন ব্রহ্মা যার জাত নক্ষত্রপূজক ছিল কিন্তু তিনি নক্ষত্র পূজকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং উপলব্ধি করেন যে তারা স্থূলদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী নয়। তাই তারা দৃশ্য বস্তুর পূজা করে। তাঁর বংশধররা কিন্তু স্থূলদর্শী হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয় যার বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। তারা ভাবতে থাকে যে সত্য ধর্ম শুধু তাদের জন্য, অন্যকারও এতে প্রবেশাধিকার নেই। এ তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। এর উত্তরাধিকারী হতে হলে জন্মগতভাবে তাদের সম্প্রদায়ের লোক হতে হবে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ বা ইহুদীবাদ আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত স্থূলদর্শীদের ধারণা মাত্র। এর কোন ঐশী অনুমোদন নেই। খৃষ্টানরা এক অদৃশ্য আল্লায় বিশ্বাস করেনা, তারা বিশ্বাস করে খোদার তথাকথিত জড়দেহী পুত্র ও তার মাতায় আর লোকেদেরও সেদিকে আহ্বান জানায়। এসবই স্থূলদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা হচ্ছে পরবর্তী ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থের পর্যালোচনা করে যা বলা হয়েছে তা অনুধাবন করা কেননা এ সবই এক মৌল উৎস থেকে জাত এবং সকল নবীই সমান শ্রদ্ধেয়। তাঁরা সকলেই এক অদৃশ্য আল্লাহ ও পরকালের জন্য কাজ করে গেছেন। সেই পথই কল্যাণের পথ। উপরোক্ত মৌলিক তত্ত্ব পেশ করার পর পুনরায় ৬৩ আয়াত থেকে ইহুদীবাদের অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবৃত্তিপূজক ইহুদীদের সূক্ষ্মদর্শী বানাবার জন্য তওরাত দেওয়া হয়েছিল এবং তাতে অনেক মৌলিক নীতি সন্নিবেশিত ছিল—১. অদৃশ্য খোদার সাথে অন্য কোন খোদাকে শরিক করা যাবেনা। ২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। অকারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবেনা। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে ইত্যাদি। এসব মেনে চলার জন্য তাদের কাছ থেকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা দুনিয়াপূজক হয়ে গেল। খোদার কেতাবকে তাকে তুলে রাখলো। তাদের দুনিয়াপূজার রোগ প্রতিরোধের জন্য শনিবারে তাদের আয়-উপার্জনের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তাও ঠেলে মারলো। তারা খোশ-খেয়ালের অধীন হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে গেল। তারা বানরের স্বভাবপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল মূর্খ বানরের দল। তারা গোলাম হয়ে অপরের শৃংখলাবদ্ধ বানর হয়ে গেল। তারা রহীম ভক্ত না হয়ে রাম ভক্ত হয়ে গেল। জাতি হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা রইলোনা। এই ঘটনাকে তাদের কাল ও পরবর্তীকালের লোকদের

জন্য চিরন্তন দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে ৬৬নং আয়াতে। প্রাচ্য সাহিত্যে যাদের হনুমান বানর বলা হয় তারা বানর ছিলনা, ছিল অনার্য জাতি আজ তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কেতাবহারা অনার্যজাতিই হনুমান ও বানর সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণরাও এই বানরদের প্রতি প্রীত তাদের বিনাপয়সার চাকর হিসাবে পাওয়ার জন্য। এই বানরদের প্রতি তাদের ঘৃণারও অন্ত নেই। তারা এদের নরাধম মনে করে। তাদের অস্পৃশ্য, বধ্য মনে করে। আজও তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রত্যাখ্যাত। আজও তাদের 'জল অচল'। নিরক্ষর নবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ভিন্ন তাদের পূর্ণমুক্তি ঘটবেনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐশীগ্রন্থ বঞ্চিত বানর গোষ্ঠির মুক্তি ঘটেছে কোরান ও হযরত মোহাম্মদের (সঃ) কল্যাণে। তারা সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, মর্যাদা ফিরে পেয়েছে ইসলামের ছত্রছায়ায় প্রাচ্যেই হোক আর পাশ্চাত্যেই হোক। এ ঘটনা থেকে সূক্ষ্মদর্শী লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বানর-হনুমান পূজা আর গাভী পূজা। তাই বানরদের প্রসংগের পর গোপূজা ও গোকোরবানীর কথা বলা হয়েছে। এসব সাদৃশ্যের কারণে আমি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইহুদীদের শাখা মনে করি। তারা পালিয়ে কেরালায় এসেছিল ও মাছধরার কাজই করতো। তওরাতের কাহিনীর বিস্তৃতরূপই রামায়ণে স্থানলাভ করেছে। যা পূজ্য তা পরিতক্ত হয়েছে যা পূজ্য নয় তা পূজ্য হয়েছে। কোরান প্রদত্ত ঐতিহাসিক তথ্য তাই সব সময় আরবজগতে পাওয়া যেতে পারেনা, এটা পাওয়া যেতে পারে তাদের মধ্যে যারা বারে বারে ভারতে আরব থেকে পালিয়ে এসেছিল। বিবেকনন্দ তার শিকাগো বক্তৃতায় গর্ব করেছেন যে পলাতক ইহুদীদের তারা হিন্দুরা আশ্রয় দিয়েছেন আসলে হনুদরাই ইহুদ যা সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবের কারণে না হনুদরা জানে, না ইহুদীরা জানে, না ব্রাহ্মণরা ও মুসলমানরা জানে। কেতাব ও ইতিহাসের গভীর জ্ঞানের অভাবে এসব তাদের চিত্তে অনুভূত হচ্ছেনা। ব্রাহ্মণ ইহুদীরা চিরদিন কেতাব ও নবীর দুশমন ছিলও আজও আছে এই কারণেই। হিন্দুজাতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই কারণ তাদের খোশ-খেয়ালী মনোভাব। লিঙ্গপূজা,গাভীপূজা, হনুমান পূজা যা মানবতার অধঃপতনের কারণ তা তাদের মধ্যে দেখা যায়। পশুপ্রীতি তাদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের থেকে পশু তাদের প্রিয়। এরা ইহুদীদের নিকৃষ্টতম শাখা বলেই মনে হয়। তারা তওরাত, তার প্রধান পুরুষ মুসাকে ভুলে যায়। ব্রাহ্মণরা অর্থাৎ তাদের পুরোহিত সম্প্রদায় নামধাম সব পাল্টে ফেলে গুপ্তযুগে। তারা সত্যগোপন করে ফেলে যাতে কেউ তাদের পরিচয় জানতে না পারে। সেজন্য সবই বিরাট গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে।

সূরা বাকারায় উল্লিখিত বানর প্রসংগের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সূরা আরাফের ২১ রুকূতে ১৬৩ আয়াত থেকে। বানর ও গরু পশুত্বের প্রতীক। মানুষ পশুপূজক হলে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। বাকারা বা গরু তাই গাইরুল্লার প্রতীক একথা আগেই বলেছি। এ সূরা তাই কোরানের সংক্ষিপ্তসার বললে ভুল হবেনা। এখানে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ই পবিত্র কোরানের বিভিন্নস্থানে বিস্তরিতভাবে বলা হয়েছে। তাই সূরা বাকারা অনুধাবন করতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) আট বছর সময় লেগেছিল।

সত্য গোপন করা ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের কাজ। তারা পাষাণমনাও বটে। তাই ৯ম রুকূতে বলা হয়েছে তারা তোমাদের শান্তির বাণীতে বিগলিত হবেনা। তারা সত্য জেনেশুনে আগেও বিকৃত করতো, এখনও করে। তারা তাদের কাছে যা আছে তা তারা মুসলমানদের জানতে দিতে আগ্রহীও ছিলনা, এখনও নেই কেননা তাহলে তারা বিতর্কের সম্মুখীন হবে এবং অন্যদের যে তারা বোকা বানিয়ে রেখেছে তা ফাঁস হয়ে যাবে। কেননা তারা তো তাদের তথাকথিত শাস্ত্র তাদের আমজনগণকে পড়তেও দেয়না। এই প্রসংগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এভাবে, "এবং তাদের মধ্যে এমন অনেক অশিক্ষিত লোক আছে যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থের বিষয় অবগত নয়-এবং তারা খোশ খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়"। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, "তাদের জন্য আফশোস যারা স্বহস্তে কেতাব রচনা করে এবং অল্পমূল্যের জন্য বলে (ক্ষণস্থায়ী পার্থিব স্বার্থের জন্য) তা আল্লার নিকট হতে সমাগত। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য শাস্তি"। (সূরা বাকারা-৭৯) অর্থাৎ তারা শাস্ত্র বা ঐশীবাণী বলে যা পেশ করছে তা ঐশীগ্রন্থ নয় বরং তা তাদের কবিদের রচনা বা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। উদ্দেশ্য লোকঠকিয়ে পয়সা কামানো। আধ্যাত্মিক ও আর্থিক এই জুয়াচুরির জন্য ঐশী শাস্তি অবধারিত। এই নকল শাস্ত্রের কারবারীরা নিজেদের এই বলে ধোঁকা দেয় যে আগুনের শাস্তি তাদের জন্য নয়। যদি হয় তা অল্প কয়দিনের বেশী হবেনা কারণ তারা ব্রহ্মার সন্তান। কোরান মারফত ঘোষণা করা হচ্ছে তাদের এই দাবী মিথ্যা। আল্লাহ এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দেননি। এ ডাহা মিথ্যা। বরং সত্য কথা এই যে যা আল্লাহর বাণী নয় তাকে আল্লার নামে চালিয়ে দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনিবার্য। তারা নরকগামী হবে এবং সর্বদাই সেখানে থাকবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। যারা মানব রচিত মিথ্যা পুরাণ অগ্রাহ্য করে সত্যগ্রন্থে বিশ্বাসী হয়ে সত্য-সততার জন্য সংগ্রাম করবে সেই সূক্ষ্মদর্শীরা স্বর্গবাসী হবে এবং চিরদিন তারা সেখানে থাকবে। যারা বানর হয়েছিল তারা ছিল নদীতীরবর্তী জেলে

শ্রেণীর লোক। এই স্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে তফসীরকারকরা কিছু বলতে পারেনি। আমার মতে এইস্থান আরব উপকূল থেকে ভারতের দক্ষিণ উপকূল। এখানেই বণি ইসরাঈলদের একটা অংশ পালিয়ে এসেছিল। এদের মধ্য থেকে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা খোদার গজবে প্রবল প্রতিপক্ষের দ্বারা পরাজিত অর্থাৎ চিৎ হয়ে পালিয়ে এসেছিল এবং নিজেদের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ত্রাণকর্তা প্রকৃত ব্রহ্মানুসারী বলে দাবী করেছিল। নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্য ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের ন্যায় বলেছিল ব্যাটা রব্বুল আলামিন বা রাবণকে মেরে চিতায় তুলে দিয়ে এসেছি। সে চিতা নিভবে না অর্থাৎ রাবণের বা রাব্বুল আলামিনের প্রতি তাদের সংগ্রাম চিরদিনের জন্য। রাবণের প্রতি তাদের হিংসা, অন্তরদাহ মনের জ্বালা চিরন্তন। তাই রাবণের চিতা অনির্বাণ। এই মারাঠা চিৎপাবন ব্রাহ্মণরাই আর.এস.এস.-এর নির্মাতা ও পরিচালক। এরা রামের নামে বানরবাহিনী, হনুমানবাহিনী গড়ে, গোমাতা আমদানী করে, আহমদাবাদে আজকের মুসলিম যুবকদের হত্যা করে, নারী নির্যাতন করে আর নিজেদের ভরতের তথা ব্রহ্মার বংশধর ও ত্রাণকর্তা ভাবে। আল্লাহ বলেন এই বানরদের আমি জগতের জন্য দৃষ্টান্তস্থল করে রাখবো। আর মুসলমানদের বলা হয়েছিল এ থেকে সবক গ্রহণ করতে। তারা ইহুদীদের মত হয়ে তাদের মতই সবক গ্রহণ করেছে। ইহুদীদের শাখা-নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণরাই শংকরাচার্যরূপে রাব্বুল আলামিনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে উত্তর ভারত থেকে রাবণপন্থী বুদ্ধ ও তার ধর্মকে উচ্ছেদ করে রাবণের চিতা প্রজ্বলিত করেছিল কিন্তু রাব্বুল আলামিন আরও উত্তর থেকে তাদের থেকে শক্তিশালী জাতি দিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে তাদের মনের জ্বালা বাড়িয়ে দিলেন। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা না নেওয়ার জন্য আল্লাহ মুসলমানদেরও একাংশকে বানর বানিয়ে দিলেন। তারা তাদের মুক্তিদাতাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তারা এখন খোশ-খেয়ালের অধীন। প্রবৃত্তি পরিচালিত হওয়ার কারণে তারাও রামপন্থী বা বামপন্থী। তাদের ভাগ্যে পরাধীনতা, দারিদ্র্য ও লাঞ্চনা ছাড়া কিছুই নেই। এখন রাবণপন্থী ও রাব্বুল আলামিনপন্থীরা পরস্পরকে চিনতে শুরু করেছে। তাই গোপূজকদের চরম সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলেই মনে হয়।

১০ম রুকুতে সেই প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এ সেই প্রতিশ্রুতি যা পালন না করলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা বরং পশু হয়ে যায়। এই প্রতিশ্রুতি লংঘন করে বনীইসরাঈলীরা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের রহীমের সাথে রামকে, গরুকে পূজো করতে নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু তারা সেই কাজই করেছিল, তাদের নরহত্যা করতে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করতে নিষেধ করা হয়েছিল,

নিষেধ করা হয়েছিল দলাদলি করতে কিন্তু তারা দলাদলির কারণে এসবই করেছিল। তারা ভিন্ন দলের লোকদের সাথে ঝগড়া করে তাদের বস্তী থেকে বহিষ্কার করার পর তাদের থেকে দেশে ফেরার বিনিময়ে অর্থদণ্ড নিত অথচ তাদের বহিষ্কার করাই ছিল নিষিদ্ধ। কেতাবের যে দিকটা তাদের অনুকূলে তারা তা গ্রহণ করতো, যেটা তাদের প্রতিকূল তারা তা বাদ দিত। এ ধরনের আচরণ ছিল নীতি নৈতিকতাবিহীন গাই গরুর নীতি। এর পরিণতি ইহকালে গোলামী, অপমান-লাঞ্ছনা ও পরকালে নরক বাস। তারা পরকাল বিক্রী করে দুনিয়ার জীবনকে কিনে নিয়েছিল। সুতরাং এতে প্রতিপক্ষের উপর জুলুম ছাড়া কিছু হয়না। জুলুমের প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে মন্দ হয়। তাদের বলা হয়েছিল দুর্বলদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে, তারা তা করেনি বরং দুর্বলকে সূদের মাধ্যমে শোষণ করার পাকা ব্যবস্থা করেছিল। যাকাত তুলে দিয়ে যারা সূদ কায়েম করেছিল, আল্লার স্মরণ নামাজ বাদ দিয়ে গোরুর স্মরণে গোপূজা করেছিল তারা সব উল্টো করেছিল। কারণ তারা আল্লাকে ভুলে গিয়েছিল। আল্লাকে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই ছিলনা যে আল্লাক তারা জানতোনা। আল্লাকে তারা জানতো কিন্তু মানতোনা কেননা আল্লার আদেশ নিষেধ অনুযায়ী চললে তাদের বাড়তি আরামে ঘাঁটতির সম্ভাবনা ছিল। বাড়তি পয়সা যদি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও এতিম মিসকীনদের জন্য খরচ করা হতো এবং তারপরেও উদ্বৃত্ত অর্থের যাকাত দেওয়া হতো তাহলে তাদের মন মানবিকতাপূর্ণ হতো। আল্লার স্মরণে নামাজে দিল ভরে যেতো। পরকালের জন্য কাজ করতে আনন্দ আসতো। সূদ খাওয়ার ইচ্ছা তাদের জাগতো না, ভায়ে ভায়ে দেনা পাওনা নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ হতো না, ছাড় রফা করে মীমাংসা হয়ে যেতো কিন্তু পাই পয়সা করে হিসাব করার দরুণ তারা বখিল হয়ে গিয়েছিল। তারা শাইলকের মতো রক্তপাত না করে পারতো না। আইনের সুবিধা গ্রহণ করতো, ন্যায়-অন্যায় বিচার বিবেচনা করতো না ফলে তাদের জাতীয় ঐক্য-শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরের আক্রমণের শিকার হয়ে তারা গোলাম হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্ছনা-অপমান তাদের উপর চেপে বসেছিল।

খোদার খলিফা হওয়ার জন্য তাদের খোদাকে মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। খোদার কেতাব পড়া, এটা চর্চা করা, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা, নামাজ ও যাকাতের বন্দোবস্ত করা, আভ্যন্তরীণ সংহতি কায়েম করা, খোদার দুষমনদের খোদার দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের কাবুতে রাখা তাদের কাজ ছিল। তাদের দুর্বলতার সদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে সুশাসন করা ছিল তাদের কাজ। হযরত ইউসুফ মিশরে এটাই করেছিলেন। এটা খোদার খলিফা হিসাবে নিত্যকালের

মুসলমানদের করার কাজ। মানুষকে খলিফা করলে যে বিপত্তির সম্ভাবনা ছিল, ফেরেশতারা যার আশংকা করেছিলেন, তা এভাবে দূর করার ব্যবস্থা খোদা করেছিলেন কিন্তু নবীর কথা মিশরীরা শুনলো না, বণী ইসরাঈলীরাও মানলোনা। তারা ইউসুফের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটিয়ে রামরাজত্বের পথ প্রশস্ত করেছিল, ফলে দুর্বলের রক্তে যমীন সিক্ত হল, বনী ইসরাঈলীদের রক্ত হালাল হয়ে গেল। হযরত মুসা (আঃ) এই কঠিন অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু তবুও তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে তারা বারে বারে গোপূজক হয়েছে। নবীরা তাদের সাবধান সতর্ক করেছেন কিন্তু ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। ইহুদী রাজা বাদশারা গোপূজক জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ও রাজমহিষীদের মন রাখার জন্য রাজদরবারে ও অন্দরমহলে শের্কের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছেন ও তাদের প্রভাবে দেশের অর্থনীতি বিগড়ে গেছে। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। নবীদের দোওয়ার ফলে বারিবর্ষণ হয়েছে কিন্তু নবীরা সমসাময়িক গো-পূজক বাদশা ও তার সমর্থকদের যুক্তিজ্ঞানে পরাস্ত করার পর আল্লাহ ঠিক না গায়রুল্লাহ বা গাইগরু আল্লাহ ঠিক তার মোকাবেলায় স্ব-স্ব- আল্লাকে বারিবর্ষণের জন্য স্মরণ করেছেন। নবীরা বলেছেন আল্লাহ বারিবর্ষণ করলে গোপূজকদের হত্যা করতে বাদশা রাজী হলে তবেই তাঁরা দোওয়া করবেন অন্যথায় নয়। তারা সর্বধর্ম প্রার্থনা করেননি। বাদশা অনন্যোপায় হয়ে অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য এ শর্তে রাজী হয়েছেন এবং শর্তানুযায়ী গোপূজকদের হত্যা ও গোরু কোরবানী করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে রাজার গোপূজক পত্নী গেছেন ক্ষেপে। গোপূজক মোশরেক রাণী রাজাকে নবীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত, প্ররোচিত করেছে। নবীকে বাধ্য হয়ে দেশান্তরী হতে হয়েছে। রাণী নিজের কন্যাকে পরদেশের রাজাকে উপহার দিয়ে সেই রাজার আশ্রয় হতে নবীকে বার করে হত্যা করেছে। রাণীর কারণে রাজা এসবই করেছে। এই মর্মান্তিক ইতিহাসের উল্লেখ করে সূরা বাকারা বা গাভী সংক্রান্ত সূরার একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছি অতঃপর ক্রমাগতভাবে রসূল প্রেরণ করিয়াছি। শেষকালে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহকারে পাঠাইয়াছি এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাহার সাহায্যও করিয়াছি (পবিত্র আত্মা মানে নিষ্কংলক আত্মা অর্থাৎ অতিমাত্রায় সদগুণাবলীতে বিভূষিত আত্মা) ইহার পর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে যখনই কোন নবী তোমাদের মনের লালাসার বিপরীত কোন জিনিস লইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তোমরা নিজদিগকে তাহার অপেক্ষা বড় মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচারণই করিয়াছ, কাহাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছ আর কাহাকেও করিয়াছ হত্যা"। (সূরা বাকারা ১১ রুকূ)

বনি ইসরাঈলীরা হযরত ঈশা পর্যন্ত বারবার গাইরুল্লা বা গাইগরুকে আল্লাহ ভেবেছে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও প্রকটভাবে। সেজন্য কোন সংস্কার আন্দোলনের ফল স্থায়ী হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তারা হযরত ঈশার (আঃ) মতো মহান মানুষকে দুনিয়া থেকে তুলে দেবার জন্য গাইরুল্লা পূজক রোমানদের সাহায্য করেছে। হযরত ঈশা (আঃ) তাদের হযরত মুসার (আঃ) মত মুক্ত করতে এসেছিলেন কিন্তু তারা মুক্তির থেকে গোলামীকে পছন্দ করেছে স্বার্থের তাড়নায়। তাদের নীতি ছিল একেবারে গাইগরু মার্কা। তারা গাইগরুর মত খাবে গলায় দড়ি পরে আর তার বাছুরকে অভুক্ত রেখে অথবা মেরে দুধ খাবে রোমান প্রভুরা। ইহুদীরা গোলামীর কারণে গরীব হয়ে বখিলীর অর্থে সূদের ব্যবসা করে স্বজাতির গরীবীর সুযোগ নিয়ে তাদের আরও গরীব করতো আর তাদের পীর মাওলানারা তাবিজ তুমারের কারবারের দ্বারা নিজের গরীব ভাইকে মেরে নিজের রুজীরুটি কামাই করতো। ফলে তাদের মুক্তির পথ হয়ে গিয়েছিল অবরুদ্ধ। এভাবে তারা স্বার্থান্ধ হয়ে মৃত্যুর পথ ধরেছিল। হযরত ঈশা (আঃ) তাদের স্বার্থ পরিহার করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন কিন্তু তারা সেই সংগ্রামের পথ পরিহার করেছিল আরামপ্রিয়তা ও স্বার্থপরতার কারণে। ফলে তারা রোমানদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উৎখাত হলো। তারা ভারতে, আফগানস্থানে, কাশ্মীরে, মদিনায় ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে পালিয়ে গেলো।

রোমান খৃষ্টান শাসকদের অধীনে ইহুদীরা কি ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল তা আম্বেদকরের ভাষায় শুনুন ঃ "যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর জন্য ইহুদীরাই দায়ী— এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ইহুদীদের অভিযুক্ত করা হয়। মধ্যযুগের সমস্ত ইউরোপীয় শহরগুলিতে ইহুদীরা শহরের স্বতন্ত্র এলাকায় সীমিত আবাসস্থলে বাস করতে বাধ্য হতো এবং ইহুদীদের এই সীমিত আবাসস্থলকে বলা হতো ঘেঁটো। ১০৫০ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার করঞ্জায় অনুষ্টিত একটি পরিষদ এই বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, কোন খৃষ্টান কোন ইহুদীর সাথে এক ঘরে বাস করতে বা একসঙ্গে খাদ্যগ্রহণ করতে পারবেনা। কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তাকে সাতদিনের জন্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে অথবা উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলে তাকে এক বছরের জন্য সমাজ বহির্ভূত করে রাখা হবে। যদি নিম্নপদস্থ কেউ এ নির্দেশ অমান্য করে তবে তাকে একশত চাবুকের ঘা খেতে হবে। আবার ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যালোপিয়ার পরিষদ এই বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, " খৃষ্টানরা ইহুদী ও মুরদের জন্য নির্বাসিত আবাসনে বাস করবেনা এবং যারা তাদের সাথে বাস করবে প্রধান গীর্জায় এই নির্দেশ প্রকাশিত হওয়ার দুই মাসের মধ্যে তাদের সেখান তেকে

আপসারিত করা হবে এবং যদি তারা অসম্মত হয় তবে গীর্জা-আইন বলে তাকে অপসারিত হতে বাধ্য করা হবো"।

মধ্যযুগে ইহুদী সম্প্রদায়কে সকলের সঙ্গে স্নান করতে দেওয়া একটা অনুগ্রহের ব্যাপার ছিল। ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোকের ঐরূপ স্নান করার অধিকার ছিলনা, কারণ যে নদীতে খৃষ্টানরা স্নান করে সে নদীতে স্নান করা ইহূদীদের উপর সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ঔগারের ইহুদীদের নানাপ্রকার কঠিন শর্তে শহরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হলো এই যে তারা মেইন নদীতে স্নান করতে পারবেনা। সরকারও তাদের উপর কিছু কর ধার্য করেছিল।সেগুলি তিনি প্রকারের ব্যক্তিকর, নির্দিষ্ট কোন জরিমানা এবং আদান-প্রদান কর। ইহুদী নারীপুরুষের যে বয়সে ব্যক্তিকর দিতে হয় তা পৃথক পৃথক হলো ও তা হত অত্যন্ত অল্পবয়েসে। স্পেনে যেমন হয়েছিল তেমনি ইংল্যাণ্ডে ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ বছরের উর্দ্ধে যেকোন ইহুদীকে কর দিতে হত। শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সৈন্যদের থাকা খাওয়ার জন্য ইহুদীদের নিকট থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হতো। মধ্যযুগে সর্বত্র ইহুদীদের নিকট থেকে এত বিরক্তকরভাবে জোর করে কর আদায় করা হতো যে তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন।

পবিত্র ৩য় পোপ ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তখন থেকে ইহুদীদের পরিচ্ছদের প্রকাশ্য অংশে একটি সুস্পষ্ট ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে খ্রীস্টানদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হবে। তার স্পষ্ট এবং জোরাল নির্দেশ ছিল যে ইহুদীদের অবশ্যই ব্যাজ পরতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ কিছুতেই এ থেকে সরে দাঁড়াবেনা। এই অপমানজনক চিহ্নটির আকার রং এবং ঢং কেমন হবে তা স্থানীয় রাজ্য শাসকের রুচির উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি রাজ্যশাসক নিজের রুচিমত তার রাজ্যের ধরণ নির্ণয় করবে। তাতে রকমারির সংখ্যা অস্বাভাবিক এবং ব্যাজের আকার এবং গঠন অপ্রচলিত হওয়ায় ইহুদীরা সেগুলি এড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে ব্যাজ প্রায়ই দৃশ্যমান হতনা। তাই ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ৭ম ক্লিমেন্ট ব্যাজের রং পরিবর্তন করেন। তাদের মাথার টুপী বা স্ত্রীলোকদের মস্তকাবরণ হলুদ বর্ণের করে দেন"। (অস্পৃশ্যতার সমতুল্য অন্যান্য ঘৃণ্যপ্রথা-পৃষ্ঠা ৭-৯) মদিনায় ইহুদীদের একটা অংশ বসতি স্থাপন করেছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে এটা জেনেছিল যে তাদের মুক্তি শেষ নবীর হাতে সম্পন্ন হবে। হযরত মুসার (আঃ) প্রার্থনার জবাবে

আল্লাহ তাদের একথা বলেছিলেন। তাই তারা নানাসূত্রে অবগত হয়ে শেষনবীর আগমন স্থল মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। মহানবীও স্বদেশ থেকে উৎখাত হয়ে মদিনায় এসেছিলেন ইহুদীদের সাথে নিয়ে মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনা করতে। তিনি তাদের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও করেছিলেন। অতঃপর কোরানের ভাষায় তাদের গোপূজার মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি সহনুভূতি প্রকাশ করে গাইরুল্লাকে পরিহার করে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বলেছিলেন যেমন পূর্বের নবীরা বলেছিলেন কিন্তু পূর্বেও যেমন কায়েমী স্বার্থের কারণে তারা নবীর কথা শুনেনি তেমনি এবারেও শেষনবীর কথাও শুনলোনা। তারা বললো যে তারা মুসার উম্মত। তাদের কাছে তওরাত বর্তমান। তারা আলেম কাজেই তারা উম্মী নবীর কথা মানতে পারেনা। তারা নিজেদের বলতো পণ্ডিত আর অন্যদের বলতো জাহেল বা মূর্খ। তাদের কাছে পুরো সত্যও ছিলনা, ছিল অর্ধসত্য আর সত্য গ্রহণের পরিবর্তে তারা ছিল সত্যের দুশমন। ফলে অহংকার, জেদ, লালসা প্রভৃতির কারণে তারা সবকিছু নতুন করে ভাবতে প্রস্তুত ছিলনা অথচ সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী Fresh outlook এটা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গোঁড়ামির দাস হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অধঃপতিত মানসিকতার বিবরণ রয়েছে ৮৮ নং আয়াতে "তাহারা বলে আমাদের মন সুরক্ষিত, না বরং আসল ব্যাপার এই যে, তাহাদের কুফরীর কারণে (সংস্কারান্ধতার কারণে) তাহাদের উপর খোদার অভিশম্পাৎ বর্ষিত হইয়াছে এই জন্য তাহারা খুব কমই ঈমান আনিয়া থাকে।"

এজন্য তারা শেষনবীর প্রতিও ঈমান আনতে পারেনি যদিও শেষ নবীর জন্য তারা হন্যে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে ৮৯ ও ৯০ নং আয়াতে। আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কেতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে তাদের কাছে আগে থেকেই যে কেতাবটি ছিল, যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করত, এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেদের মোকাবেলায় বিজয় ও সাহায্যের দোওয়া চাইত। তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে, তখন তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। আল্লাহর লানৎ এই অস্বীকারকারীদের উপর। যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সান্তনা লাভ করে তা কতই না নিকৃষ্ট, সেটি হচ্ছে আল্লাহ যে হেদায়েত নাযিল করেছেন তারা কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তার যে বান্দাহকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ দান করেছেন কাজেই এখন তারা উপর্যুপরি গজবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের

জন্য চরম লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।

তারা এমন গাইগরু ছিল যে শেষ সুযোগও হেলায় নষ্ট করে বসলো। তারা মোশরেকদের সাথে সহযোগিতা করে শেষনবীর ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে মদিনা থেকেও বহিস্কৃত হলো। বিগত দেড়হাজার বছরের ইতিহাসে ইহুদী ও নাসারা (এরা ইহুদীদের শাখা) কোরান, মহানবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এখন তারা এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাথেও হাতে হাত মিলিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে তাদের আন্তর্জাতিক উৎখাতও আসন্ন হয়ে উঠেছে। তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দেবেনা। ফলে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও থাকবেনা।

তারা শেষ নবীকে মানতে পারলোনা এই কারণে যে এ নবী তাদের গোষ্ঠীভুক্ত লোক নয় বরং অ-ইসরাঈলী গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ কিন্তু হযরত ঈশা (আঃ) পর্যন্ত সবাই তো তাদের গোষ্ঠীভুক্ত নবী ছিলেন কিন্তু তারা কি তাঁদের মেনেছে? আসলে এটা ছিল আর এক উপরি বাহানা। তারা আজ হিব্রুন দাবী করছে, দাবী করছে মদিনা কিন্তু হিব্রুন তো ইয়াকুবের বা ইসরাঈলের নয়, এটা তো ইবরাহীমের (আঃ) যা পৈতৃকসূত্রে হযরত ইয়াকুবের বাসভূমি ছিল। এর প্রকৃত মালিক তো ইবরাহীম পন্থী, ইসরাঈলপন্থী, মুসা ও ঈশা পন্থী নবীমোহাম্মদ। তাই এসবই তার উম্মতের হাতে এল ইহুদীদের আর এক শাখা নাসারাদের হাত থেকে (রোমান নাসাবা) আর আল-খলিল থেকে মদিনা পর্যন্ত এই পবিত্র স্থান প্রকৃত ইবরহীমপন্থীদের হাতে আবার আসবে। অজ্ঞতা, গোঁড়ামী, জেদের ফলে তারা পুনরায় ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত হবে। এবার উৎখাত হবে চিরদিনের জন্য। স্থূলদর্শী হওয়ার কারণে তারা ভালোর পরিবর্তে মন্দকে, নবীর পরিবর্তে স্বৈরাচারী শাসককে গ্রহণ করে। তাদের হযরত মোহাম্মদ (সঃ) পূববর্তী ও পরবর্তী আচরণ তাদের দ্বিগুণ শাস্তির উপযুক্ত করেছে। তারা আসলে বর্ণবাদী হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের পরিসীমার বাইরে থেকে তারা কোন জ্ঞান আহরণ করতে প্রস্তুত ছিলনা। তারা যে শুধু হযরত মোহাম্মদকে (সঃ) ইসমাঈলী শাখার লোক হওয়ার জন্য অস্বীকার করছে তা নয় তারা ইতিপূর্বে হযরত মুসাকেও অগ্রাহ্য করেছিল যদিও তিনি ইসরাঈলপন্থী ছিলেন। ৯২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মুসার অনুপস্থিতির সুযোগে গোবৎসের পূজা করেছিল। তারা ছিল এমন সংস্কারান্ধ। তুর পাহাড় মাথায় তুলে তাদের যে দশটি অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল তারা বাহ্যতঃ তা গ্রহণ করলেও অন্তর দিয়ে তারা তা গ্রহণ করেনি, তাদের মন অজ্ঞতার দিকেই ঝুঁকেছিল। তাই তারা গোপূজা ছাড়তে পারলো না তৎসত্ত্বেও তারা নিজেদের ঈমানদার বলেই মনে করতো। তারা মনে করতো তারা সুপথ প্রাপ্ত। তাই যদি হয় তাহলে

তারা জেহাদ ও শাহাদতের পথ গ্রহণ করতে রাজী নয় কেন? আসলে তারা পাপাচারী। তাই তারা গোলামীর জীবনই পছন্দ করে তা যদি হাজার বছরও হয়। হাজার বছরের গোলামীর জীবনের থেকে মুহূর্তের মুক্ত জীবন অনেক ভাল। কিন্তু তাদের এ চেতনা নেই।

দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ইহুদীরা শুধু মহানবী নয়, জিব্রাইলকেও (আঃ) গালাগালি করতো। বলতো ওটা ফেরেশতা নয়, শয়তান। স্যাটানিক ভার্সেস-এ রুশদী সেই পুরানো কথাই পেশ করেছে।

ইহুদীরা নবীর সাথে কৃত চুক্তি যেমন পালন করেনি তেমনি তওরাতের সত্যতা প্রমাণকারী কেতাব কোরানকেও মানেনি বরং তারা ছিল যাদুর কেতাবের ভক্ত। তারা বলতো হযরত সোলেমান জ্বিন পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বশ করেছিল এই যাদু ও জ্যোতিষের জোরে অথচ সোলেমান আদৌ এ সবের চর্চা করেননি। বরং যাদু ও জ্যোতিষ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কারবার। এসব লোকঠকানো তন্ত্র-মন্ত্র, বশীকরণের দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ বাধাতো। তারা ছিল এমন নিকৃষ্ট লোক। একাজ করাকে তারা কামালিয়াত বলে মনে করতো। মূর্খ লোকেরা তাদের বলতো পণ্ডিত, জ্ঞানী ও আলেম। এসব অপ-বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান মনে করা হতো। ভারতের ব্রাহ্মণরা আজও তাই মনে করে। ইহুদী সন্তান নষ্টরামের ভবিষ্যদ্বাণীকে তাই ইহুদী ও ব্রাহ্মণবাদীগণ দারুণ গুরুত্ব দেয়। এই শয়তানী বিদ্যার আদি কেন্দ্র ছিল নক্ষত্রপূজক দেশ ইরাক। তারা আল্লাহর কেতাব যা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাতে বিশ্বাস করেনা, বিশ্বাস করে নষ্টরামে। নষ্টরামদের আদি উৎস হারুত মারুতের প্রদত্ত যাদু ও জ্যোতিষ। এ দুজন ফেরেশতাকে মানুষের আকারে লোকেদের হেদায়েত দান ও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তারা লোকদের যাদু-জ্যোতিষ বাদ দিয়ে সত্য গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিল। যাদু ও জ্যোতিষ দ্বারা যে ফায়দা হাসিল হয় তা পার্থিব স্বার্থ মাত্র এবং তা ক্ষণস্থায়ীও। অপরের ক্ষতি ছাড়া ভালো কাজ যাদু ও জ্যোতিষ দ্বারা সম্ভব নয়। মন্দ লোকেরাই এর খরিদ্দার। তাই তারা যাদু শিখতে মানুষকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তারা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে কাজ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। ইরাকে তারা সম্রাট নেবুকাডনেজারের আমলে বন্দীজীবন যাপন করছিল তখন তারা স্বজাতির পারিবারিক বিরোধ সৃষ্টির জন্য এটা শিখেছিল। যখন তাদের ঐক্যের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক তখন তারা অনৈক্যের তন্ত্রমন্ত্র গ্রহণ করছিল, রপ্ত করছিল, এমনকি তারা স্বামী-স্ত্রীর ঐক্যও পছন্দ করতো না। সেখানেও বিচ্ছেদ চাইতো। এ একান্তভাবে শয়তানী কাজ ছিল। শয়তান কোন ভালো কাজ পছন্দ করেনা, ভাল কাজ করতে

পারেনা। আল্লার অভিশাপে অভিশপ্ত হওয়ার ফলে শয়তান মন্দ ছাড়া কিছু ভাবতে পারেনা। মন্দ ছাড়া কিছু করতে পারেনা। কিন্তু এটা করে ভালোর নামে, ভালো লোকের নামে। অজ্ঞতার কারণে লোকেরা অর্থাৎ গোবেচারা গোপালরা এতবড় অপপ্রচারেরও শিকার হয়ে গেলো।

ইহুদীমূর্খরা জ্যোতিষকেও মনে করে দৈবিক বা বৈদিক। পবিত্র কোরান বলছে এটা হারুত ও মারুত নামক ফেরেশতা বা দেবতাদ্বয়ের সাথে অস্পষ্টভাবে যুক্ত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্ত ছিলনা। পরাজিত, গ্রেফতারকৃত ইয়াহুদীগণকে পরীক্ষা করার জন্য এ টোপ প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তারা খোদাবাদী জামাত হবার মর্যাদা একাবারেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের উত্থানের পরিবর্তে পতনের দিকে ধাবিত হতেই বেশী আগ্রহী ছিল। তারা ইহকালীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেও রাজী ছিল না। পরকালের উন্নতির জন্য কাজ করা তো অনেক দূরের কথা। আল্লার কেতাব ইহ-পরকালীন উন্নতির চাবিকাঠি হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার প্রতি। তারা এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাদের দ্বারা কোন ভাল কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যাদুর দ্বারা কোনো ভাল কাজ হয় না। এটা শেখার অনুপ্রেরণা আসে শয়তানের থেকে আত্মা বা বিবেক ধ্বংস করার জন্য। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে, "সেই সব জিনিষকে তাহারা মানিতে শুরু করিল শয়তান যাহা সোলেমানের রাজত্বের নাম লইয়া পেশ করিতেছিল। সোলেমান কখনই কুফরী অবলম্বন করে নাই। কুফরী অবলম্বন করিয়াছে সেই শয়তানগণ যাহারা লোকদিগকে যাদুগিরি শিক্ষাদান করিতেছিল।" হযরত সোলেমানের ন্যায় মহামানব যিনি জ্ঞানী সোলেমান নামে পরিচিত, তিনি বিবেকহীন-নীতিহীন লোকের ন্যায় কাজ করবেন তা কখনও হতে পারেনা। শয়তানের সাগরেদ নীতিহীন, বিবেকহীন ইহুদীদের একাংশ একাজ করেছিল। সোলেমানী তালেনামা, খাবনামা ইত্যাদি নামে, তাবিজ তুমারের নামে ইহুদীদের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে একশ্রেণীর মুসলমান আলেমধারীদের মধ্যেও এসব অপকর্ম চালু রয়েছে। আজও সোলেমানের দোহাই দিয়ে দুনিয়াপূজক গাইগরুগণ একাজ করছে। ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি তো দূরের কথা মুসলমানদের জাগতির উন্নতিও বহুদিন হলো থেমে গেছে। তারা ইহুদীদের মতো গোলামী ও লাঞ্ছনার জীবনযাপন করছে। হযরত সোলেমান আল্লার কেতাব অনুসরণের ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমস্তরে উপনীত হয়েছিলেন, অন্যের অধীন হওয়া তো দূরের কথা জিন-শয়তানও তাঁর অধীন ছিল। ইহুদী গোপালগণ প্রকৃত ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল যেমন আজ মুসলিম গোপালরা

ভুলে গেছে।

যাদুর উৎস সম্পর্ক ঐ আয়াতেই বলা হয়েছে, 'ব্যাবিলনের হারুত মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তাহারা উহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ তাহারা যখন কাহাকেও এই জিনিসের শিক্ষা দিত তখন প্রথমেই এই কথা বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করিয়া দিত যে, দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হইও না, তাহা সত্ত্বেও তাহারা সেই জিনিসই শিখিতেছিল যাহা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায় অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, খোদার অনুমতি ব্যতিরেকে এই উপায়ে তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হইত না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা এমন জিনিস শিখিত যাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তাহারা ভাল করিয়া জানিত যে, এই জিনিসের খরিদ্দার হইলে তাহাদের জন্য পরকালের কোনই কল্যাণ নাই। তাহারা যে জিনিসের জন্য নিজেদের জীবন বিক্রয় করিয়াছে তাহা কতই না নিকৃষ্ট জিনিস। হায়! এই কথা তাহারা যদি জানিতে পারিত!"—(বাকারা-১০২)

যাদুর কেন্দ্র ছিল ব্যাবিলন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বদৌলতে সেখানে ব্যাবিলনের শুন্যে ঝুলন্ত উদ্যান পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষে পরিণত হলে জাতীয় অধঃপতন শুরু হয়। গডম্যানের নামে গডম্যানদের আবির্ভাব হয়। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যায়। মৌলিক চরিত্র, পৌরুষ বিদায় নেয় কিন্তু পার্থিবপরতার কারণে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার কামনা-বাসনায় মানুষ এই অধঃপতনের পানেই ধাবিত হয়। মানুষ শুকর, বানর, গরুর মতো পশু হয়ে যায় যা ভারতে বর্তমানে হচ্ছে এবং গুপ্তযুগে হয়েছিল। ইহুদীদের শাখা গোত্র হিসাবে ইরাকে-ইরান থেকে যেসব আর্য সন্তান পালিয়ে এসেছিল তারা ভারত থেকে প্রাচ্যজগতে এসব আমদানী করেছিল। এখন এ প্রাচ্য-প্রতীচ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

মারুত হয়েছে ইহুদী সাহিত্যে মিডরাস, ইরাকে যাদুর দেবতা মাডরু ভারতে হয় মার্কণ্ড মুনি এবং রচিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ। মর্কট বা মাকড় মানে বাঁদরও হয়। এই বাঁদর সুলভ আচরণের জন্য তাদের হয়তো অভিশপ্ত করা হয়েছিল যার ফলে ইহুদী ও ব্রাহ্মণগণের ভাগ্যে গোলামী ছাড়া কিছুই মিলেনি। প্রতিপক্ষের ক্ষতি করতে তারা কোন নীতির ধার ধারেনা, কোনো ঐশীবিধানের পরোয়া করেনা। যদি মারুত থেকে মার্তণ্ড হয় তাহলেও ব্যাপার বেশ অর্থবহ। মারুত মানে বায়ু। যার অভাবে মৃত্যু হয় তা মারুত বা বায়ু। যারা ঝাড়ফুঁকের জন্য আসে তারা বলে বাতাস লেগেছে।

মারুত বা পবনপুত্র, বায়ুপুত্র হচ্ছে হনুমান। অর্থাৎ রামভক্ত হনুমান। রাম সূর্যপূজক অর্থাৎ মোশরেক। মোশরেক শাসকের যারা বশ্য তারা তো হনুমান-বানরই। ইহুদীরা খোদাপূজারী অনার্য হয়েও বারবার আর্যপুত্রদের গোলামী করেছে। মার্তণ্ড শব্দের অর্থ আবার সূর্য ও শুকর দুইই হয়। সূর্যপূজক আজরকে শূকর বানানো হবে পরকালে একথা আমরা জানি তাই সূর্যের সাথে শূকর, বানর ও গরু-বাছুর নয়, মুনি-ঋষিও নয়, নরও নয়, নরদেবতাও নয়, প্রকৃত ফেরেশতা বা দেবতাদ্বয় তারা কোনো সুদূর অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গোলাম মোল্লাতন্ত্রী ইহুদীদের পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা এই ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে কোন ভালো জিনিস শিক্ষা করেনি, শিক্ষা করেছে মন্দ আবার মন্দটাকে চালিয়েছে ভালোর নামে, ভালো মানুষের নামে। তারা সত্যকে, ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। ক্ষীর-সর-ননী খাবার জন্য গোপালরা একাজ করেছে। ফলে উচ্ছন্নে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীগণের ধ্বংসের মৌল কারণ বিবৃত হয়েছে এই আয়াত বা শ্লোকে। প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যের উপর এটা একাট উল্লেখযোগ্য সংশোধনী। বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্য সাহিত্য আসলে যাদু ও তন্ত্র মন্ত্রের কেতাব। ব্রহ্মণ্যবাদী ইরাকী আর্য, তাদের গোলাম ইহুদীরা সত্যশিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা শাস্ত্রের নামে যাদুর গ্রন্থ রচনা করেছে। মহান আল্লাহ ১০৩ আয়াতে বলেন, "তাহারা যদি ঈমান আনিত (প্রেরিত ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাস করতো) ও তাকওয়া (নৈতিকতার সীমা মেনে চলতো) অবলম্বন করিত তবে খোদার নিকট তাহার যে প্রতিফল পাওয়া যাইত তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইত। তাহারা যদি ইহা জানিতে পারিত।"

আল্লাহ, তাঁর কেতাব, নবী ও শরীয়ত অবলম্বনে সংগ্রাম না করে গোপাল, ভেড়ার পাল, শূকরের পাল, বানরের পাল হলে অধঃপতন, গোলামী, লাঞ্ছনা ছাড়া কপালে কিছুই জুটেনা। পক্ষান্তরে আল্লাহ, তাঁর কেতাব ও নবীকে অবলম্বন করে সংগ্রাম করলে গোলামী থেকে মুক্তি, আযাদী, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এ জন্য উদর ও যৌনদর্শন পরিহার করে শূন্যদর্শন বা গায়েবে বিশ্বাস অপরিহার্য। উন্নতির আদি সোপানই এই। কিন্তু অধঃপতিত ও বিকৃত মানসিকতার দরুণ ইহুদীরা তা অনুধাবন করতে পারেনি, কারণ তারা গোপূজকদের গোলাম হওয়াকে মেনে নেয়ার ফলে তাদের মন-মানসিকতা ছোটখাট ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোন মৌলবিষয় অনুধাবন করার মত যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল।

এয়োদশ পরিচ্ছদে ইহুদীদের এই নিকৃষ্ট মানসিকতার একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা

হয়েছে যা কোরান ও মহানবীর যুগে তারা করেছিল। তারা সহজ সরল ভদ্রতাসম্মত আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে দ্বৈতনীতি বা দ্বিজত্বের পন্থা অবলম্বন করেছিল। তাদের কথাবর্তা ছিল দ্ব্যর্থক। মহানবীর সভায় তারা উপস্থিত হতো প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবনের জন্য নয় বরং বক্তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলতো 'রায়েনা' বা আমাদের কথা শুনুন কিন্তু এর কয়েকটি কদর্থও আছে। 'কেশব, কে সব' 'হরি হরি' 'হর, হর' প্রভৃতি শব্দের ভাল অর্থও যেমন আছে তেমনি কদর্থও আছে। ইহুদীরা 'রায়েনা' শব্দের দ্বারা এই শয়তানীই করতো। শয়তান তাদের এই অসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দান করেছিল। মুসলমানরা যেন তাদের 'গোপাল' না হয় বরং তীক্ষ্ণ সচেতন হয়, তাদের উদ্ভাবিত পরিভাষা ব্যবহার না করে বরং নিজস্ব পরিভাষা উদ্ভাবন করে এই হচ্ছে নির্দেশ। তাই 'উনজুরনা' বা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিন এ ধরণের মর্যাদাব্যঞ্জক পরিভাষা ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। 'I draw your attention' এই ভদ্র পরিভাষা পবিত্র কোরান থেকেই এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের ভাষানীতি থেকে সতর্ক থাকা দরকার। আর্যরা আজ পর্যন্ত অনার্যভাষা গ্রহণ করেনি। পণ্ডিত নেহেরুর ন্যায় তথা কথিত উদার ব্রাহ্মণ যিনি চোগা চাপকান পরতেন, পকেটে গোলাপ ফুল গুজতেন, উর্দু, ইংরেজী আওড়াতেন কিন্তু মনে মনে ছিলেন আর্য গোপন-ভাষা সংস্কৃতের একান্ত অনুরাগী। পণ্ডিতজী বলেন, "If I were asked'' Pandit Nehru has said, ''what is the greatest treasure which India posses and which is her finest heritage, I would answer unhesitantingly that it is the Sanskrit language and literature and all that it contains.''

সংস্কৃত এমন একটি ভাষা যা কোনদিন ভারতীয়দের পড়তে দেওয়া হয়নি, যা কোনদিন তাদের মাতৃভাষা ছিলনা যাতে ভারতীয় মনীষার কোন অবদান নেই তা হয়ে গেল ভারতের শেষ্ঠ সম্পদ। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান গৌতম বুদ্ধের ভাষা সংস্কৃত ছিলনা। তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতে নেই। অশোকের শিলালিপিও সংস্কৃতে লেখা নয়। ভারতের সম্পদ তো এগুলো। ভারতের আদিবাসী মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পার শিলালিপির ভাষা যা বেদের থেকে প্রাচীন। ভারতে প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মলিপি ও ভাষা। আর্যরা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য ধ্বংস করেছে। তাদের যাদু ও তন্ত্র মন্ত্রের কেতাব যা তারা ভারতে পালিয়ে এসে নতুন ভাবে সংকলিত করেছে তাকে ভারতীয় বলে চালিয়ে দেওয়া এক বড় ধরনের জালিয়াতী। তারা পালি প্রাকৃত ও বৌদ্ধসাহিত্য, আরবী-ফারসী-উর্দু সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্য গ্রহণ করেনি অথচ এগুলো বেদের মতো ভারতেই রচিত হয়েছে। এগুলো সবই হয়েছে অভারতীয় যদিও ভারতে ভারতবাসীর

দ্বারাই তা রচিত হয়েছে। তারা আজ গোটা ভারতীয় ভাষাকেই সংস্কৃতায়িত করছে। তারা রহীমকেও রাম করতে চায় রামের বহুবিধ অর্থ দান করে। তাই তাদের ভাষানীতি থেকে সর্তক থাকা দরকার। (দ্রঃ ব্রাহ্মণ্যলবীর ভাষানীতি)

মোশরেক ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতরা আদৌ প্রগতিশীল নয় বরং তারা পশ্চাদমুখী ও রক্ষণশীল, এমনকি খোদার প্রগতিশীল সত্যকেও তারা গ্রহণ করতে পারেনা, তাদের বর্ণ ও গোত্রের বাইরের কোনকিছুকে তারা গ্রহণ করতে রাজী নয়। ১০৫ আয়াতের এই বক্তব্যের পর ১০৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঐশীবাণী প্রগতিশীল, রক্ষণশীল নয়। সত্য এক হলেও দেশকাল পাত্র ভেদে তার প্রয়োগ ও অবয়বে রদবদল হয়, পরবর্তী কেতাব পূর্ববর্তী কেতাবের হুবুহু কার্বন কপি হতে পারেনা। পূর্ববর্তীকালে যা প্রয়োজন ছিল আজ তার প্রয়োজনীয়তা নাও থাকতে পারে। লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাকটর আসতে পারে। মূল লক্ষ্য আবাদের কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু আবাদের যন্ত্রপাতির পবিবর্তন হতে পারে। ইব্রাহীম বা ব্রহ্মা, মুসা ও ঈশার (আঃ) কিংবা হযরত মোহম্মদের (সাঃ) মৌল শিক্ষার মধ্যে কোন ফারাক নেই কিন্তু দেশকাল পাত্রগত পরিবর্তন অবশ্যই আছে। কোনটা পরিত্যাজ্য কোনটা মূলনীতি এবং তদস্থলে অনুরূপ বা অধিকতর ভাবাদর্শ আনায়ন করা ন্যায় সত্যের দাবী কিন্তু মূর্খ-নাদানরা তা বুঝতে পারেনা। ১০৬নং আয়াতে একথা বলার পর ১০৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে মূলনীতির মধ্যে প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা আনার অধিকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র খোদার। তাই ঈমানদার লোকদের গোঁড়া, সেকেলে, প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের নির্বুদ্ধিতামূলক নীতি পরিবর্তন করে প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তাদের সত্যাগ্রহী হতে বলা হয়েছে। আল্লাহর জ্ঞান সত্য ও সততাপূর্ণ। সেই জ্ঞান ও নীতি গ্রহণীয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীদের গোঁড়ামী নয়। এরা সত্যাগ্রহীদের বন্ধু নয়, সাহায্যকারীও নয়। যারা তাদের তা ভাবে তারা গোপাল নামক অবোধ বালক। তারা সুবোধ ও সুশীল নয়। ১০৭ আয়াতের এই বক্তব্যের পর ১০৮ আয়াতে বলা হয়েছে হযরত মুসার (আঃ) সময়েও এই নির্বোধ গোপালেরা গোপূজায় দৃঢ় থাকার জন্য হযরত মুসাকে নানা বাহানামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল যাতে সত্যের দাবীর সামনে মাথা নত করতে না হয়। মুসলমানরা যেন প্রগতিশীল সত্যাগ্রহী হয়, সুবোধ ও সুশীল হয়, ইহুদী ও ব্রাহ্মণদের মতো গোপূজক ও অবোধ গোপাল না হয়। ধর্মকে যেন চালবাজীতে পরিণত না করে। এই চালবাজীর ফলে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় আর মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করে গ্রহণ করে লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মুসলমানরা যেন এই ইহুদীনীতি গ্রহণ না করে, কিন্তু

অশেষ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার মুসলমানদের কোরান বিমুখ একাংশ কোরানের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও সুবোধ ও সুশীল হয়নি। বাহাস বিতর্ক-কলহ-কোন্দলে তারা সময় কাটায়, সত্য অনুধাবন ও সৎ আচরণ অবলম্বন করতে তারা চায়না কিন্তু গোপূজকদের প্রতি তারা খুবই নমনীয় ও উদার, তাদের বিক্রম, কাদা ছোড়াছুঁড়ি, কুট প্রশ্ন শুধু কেতাবধারীদের বিরুদ্ধে। এতে তারা নিজেদের পথভ্রষ্ট, নেয়ামত বঞ্চিত করা ছাড়া কোন কিছুই করেনা। গোপলরা কোনকিছু অনুধাবন না করে তাদের রাখালদের অধীনে চলে। ১০৮ আয়াতে একথা বলার পর ১০৯ আয়াতে বলা হয়েছে এই গোপালরা সত্যাগ্রহীদেরও মিথ্যার দিকে নিয়ে যেতে চায় তাদের লালসার কারণে। তাদের মনে কাজ করে এক গোপন হিংসা। সত্যাগ্রহীদের উচিত এদের রিরুদ্ধে যথাযথ পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু এভাবে তারা সত্যের গতিরোধ করতে পারবে না।

১১০ আয়াতে কোরানের অব্যাহত চর্চার জন্য, আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য আল্লার সাহায্য পাওয়ার জন্য সালাত ও জাকাত কায়েম করতে বলা হয়েছে। নামাজ ও যাকাত হচ্ছে আল্লার সার্বভৌমত্বের বাস্তব স্বীকৃতি। সালাত মানে সওয়াল করা, প্রার্থনা করা। আল্লাকে সর্বশক্তিমান, নিখুত প্রতিপালক, দয়াল দাতা ও সকল কার্য কলাপের সঠিক বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সুবোধ বালকের মতো ধর্মের নামে অশ্লীল আচার-আচরণ বাদ দিয়ে সুশীল আচরণ গ্রহণ করে প্রার্থনা করা এই দিক দিয়ে যে তাকে যেন কোরানের 'সেরাতল মোস্তাকীম' বা সত্যের সুদৃঢ় রাজপথে পরিচালনা করা হয় যে পথ পরিক্রমা করে নবী ও নবীপন্থীরা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের পথ থেকে যেনো বাঁচানো হয় যারা গজবগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট। এখানে গজবগ্রস্ত গোপূজক ও তাদের গোলাম অবোধ গোপাল ইহুদীদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দানের পর সালাতের কথা বলার অর্থ তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে কোরান পাঠের মাধ্যমে বাঁচার চেষ্টা করো, আমার কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করে, সত্যে দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা কর, সাহায্য চাও। জাকাত দিয়ে এই চাওয়ার প্রতি তোমার ঐকান্তিকতা প্রমাণ কর। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ও ইহুদীবাদীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের অর্থগৃধ্নুতার কারণে। তারা গ্রহশান্তি, কবচ-মাদুলী ও তাবীজ-তুমারের ব্যবসা করেছে গোপালদের ঠকিয়ে অবৈধ কামাই-রোজগারের জন্য। মুসলমানদের ঐ পথ পরিত্যাগ করে স্বোপার্জিত হালাল রুজী জনকল্যাণে ব্যয় করতে বলা হলছে যাতে তাদের হৃদয়ে অর্থের মোহবিস্তার লাভ করতে না পারে। তারা যাতে ন্যায়-সত্যের পতাকাবাহী হয় এজন্যই এ বিধান। এতে তাদের গরীব লোকেরা বেণে-মহাজনদের দ্বারস্থ না হয়েও জাকাত-

ফাণ্ড থেকে রসদ সংগ্রহ করে সত্যের সংগ্রামী সৈনিক হতে পারবে। এ টাকা বিশেষ করে কোরানের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হওয়া উচিত কারণ শয়তান ও শয়তানের শাগরেদদের একান্ত প্রচেষ্টা যাতে কোরানের মহাসত্য দুনিয়াবাসী জ্ঞাত না হয়। তারা নূহ ও ইবরাহীমের (আঃ) ও তাদের বংশাবলীর উপর অবতীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার বরবাদ করেছে আর ধর্মের নামে যৌনশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, যাদু-তন্ত্র-মন্ত্র, বশীকরণ, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি অপশাস্ত্র তৈরী করেছে। বিশ্বকে বেণে-মহাজনী সূদের জালে জড়িয়েছে, ধর্মের নামে বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের জন্ম দিয়েছে, সত্যের জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে আর তপজপ ও ভজনার মাধ্যমে মুক্তির মিথ্যা পথ বার করেছে এবং অজ্ঞতার কারণে এই পথের দিকে লোকদের ডাকও দেয় কিন্তু আসলে এসব বিকারগ্রস্ত মনের কল্পনা মাত্র। তাই তারা ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ প্রচার করে। ১১১ নং আয়াতে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদে মুক্তি নেই একথা বলার পর ১১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে মুক্তির রাজপথ হচ্ছে আল্লার কেতাবে উপস্থাপিত মহাসত্য মেনে নেওয়া, ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিলাভ করে ধর্মের নামে অজ্ঞতা-কুসংস্কার ধাপ্পাবাজী থেকে বাঁচা শোষণহীন ভ্রাতৃত্বমূলক কল্যাণমুখী সমাজ কায়েম করার জন্য আন্তরিকতাপূর্ণ তৎপরতা গ্রহণ করা।

'এয়োদশ পরিচ্ছদে মূলতঃ পথভ্রষ্ট ইহুদীদের (যাদের মধ্যে খৃষ্টবাদীরাও সামিল যদিও তারা পরস্পর বিরোধী) কার্যকলাপ পরিহার করার জন্য ঈমানদার বা সত্যাগ্রহীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। চর্তুদশ পরিচ্ছদে আল্লার গজবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী মোশরেকদের উপর আলোকপাত করে সত্য পথের পথিকদের করণীয় কি তা বলা হয়েছে। চতুর্দশ রুকূর শুরুতেই বলা হয়েছে ইহুদীবাদী, খৃষ্টবাদী ও কেতাবহীন অজ্ঞের দলের পরস্পর বিরোধী দাবী একান্তভাবেই ভিত্তিহীন। ইহুদীদের কাছে তওরাত ও খৃষ্টানদের কাছে ইঞ্জীল বর্তমান। তারা তা পড়ে অথচ অনুধাবন করেনা। বর্তমানে এমনিই হাল মুসলমানদের। শেষ নবীর উম্মত হওয়ার জন্য নাকি তাদের স্বর্গের পাসপোর্ট আছে। যাদের কেতাব নেই যারা ভিত্তিহীন কল্পানার দ্বারা চলে সেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্মহীন নাস্তিক, সমাজতন্ত্রিক, মার্কসবাদী তারাও বলছে মুক্তির পথ শুধু মার্কসবাদ ও লেলিনবাদ, অন্যরা বলছে গণতন্ত্র, মুক্তবাজার, আন্তর্জাতিক সূদযুক্ত অর্থভাণ্ডারের অক্টোপাশই মুক্তির রাজপথ। এরা পরস্পর বিরোধী হলেও স্ব-স্ব দাবীতে অটল অথচ তাদের নিকট কোন ঐশী সনদ বর্তমান নেই। এসব মূলত বাগাড়ম্বর। পরীক্ষার জন্য অবকাশ থাকার জন্য এসব চলছে ও চলবে। প্রকৃত ব্যাপার কেয়ামতের পর সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। ভারতের ডানপন্থী ও বামপন্থী মোশরেকরা

পরস্পরবিরোধী হলেও কেতাব ও নবীর বিরুদ্ধে তারা এক যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা। নিছক দলবাজীতে কিছু হয়না।

যাদের কাছে কোন ঐশীসনদ নেই বরং নিজেরা স্ব-স্ব গ্রন্থ রচনা করে তাকে খোদার নামে চালিয়েছে তারা খোদার ঘর পর্যন্ত ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খৃষ্টান আবরাহার ঘটনা ছিল তখনকার দিনের সাম্প্রতিকতম ঘটনা। ১১৪ নং আয়াতে এর ইংগিত রয়েছে। ইতিপূর্বে আসুরীয়রা, গ্রীকরা, রোমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস বিধ্বস্ত করেছে ধর্মের নামে এই দলবাজীর কারণে। এরা আদৌ ধার্মিক নয়। ব্রাহ্মণরা ভারতে বৌদ্ধ উপসানালয় সমূহ ধ্বংস ও জবরদখল করে। বসনিয়ায় চারশো বছরের পুরানো মসজিদ খৃষ্টানদের একাংশ ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন আবার নয়া আবরাহা জন্ম লাভ করেছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে। ইহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট সুড়ঙ্গ খুলেছে। মতলব তো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কিন্তু মুসলিম গোপালরা এখনও তাদের মুখে রাম নাম, হরিহরি শুনে জাত হারিয়ে বোষ্টম সেজে গলায় কাঁটির শংখল পরে রয়েছে। যারা ইতিপূর্বে এসব কাজ করেছে তারা গোলাম হয়ে বঞ্চনার জীবন যাপন করেছে, পরকালে আরও কঠিন বিপর্যয় তাদের গ্রাস করবে তৎসত্ত্বেও গোপালরা তাদের থেকে পৃথক হতে পারছেনা। ইরাকীরা ও গ্রীকরা যূলকারনায়েনের হাতে খতম হলো। আল্লাহ তাঁকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মালিক করে দিলেন। এহেন খোদানুগত বান্দাকে আল্লাহ বান্দা রেখেছেন পুত্র বানাননি কিন্তু খৃষ্টবাদীরা এ ধরনের জঘন্য দাবী করে। আল্লাহ মালিক। সবাই বান্দা। তাঁর হুকুমে সব হয়। অজ্ঞ লোকেরা এসব বুঝতে না পেরে আজেবাজে কথা বলে। দুনিয়াতেও তিনি বাড়াবাড়ির ফয়সালা করেন, আখেরাতেও করবেন। কেননা তিনিই একমাত্র মালিক। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ইহুদীবাদী, কাবা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী, ও দক্ষিণ আরব ইয়েমেন থেকে খৃষ্টানদের সরে যেতে হয়েছে খোদার হুকুমে আবার তা হবে সর্বত্র, যেখানেই খোদার ঘর ভাঙ্গা হবে।

১১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যারা কোন ঐশীগ্রন্থের ধার ধারেনা তারা স্থূলদর্শী হয় এবং এই ধরনের গোপালরা খোদাকে সরাসরি সাক্ষাৎ দেখতে চায়। এটা একাবারে নিরেট অজ্ঞতা। আল্লাহ অনন্ত অসীম শক্তি তা যদি গোপন না থেকে প্রকাশ্য হয়ে পড়ে তাহলে তো দৃষ্টি লোপ পাবে। হযরত মুসার (আঃ) সময় গোপালরা এ দাবী করেছিল। ফলে আল্লার প্রতাপ তাদের উপর বজ্রের রূপে পড়েছিল। এই ঘটনা সব জাতির সাহিত্যে থাকা সত্ত্বেও অতীতের ন্যায় অজ্ঞের দল বর্তমানেও একই দাবী পেশ করে। এটা তাদের অকাট মূর্খ হওয়ার প্রমাণ। কেউ যদি বলে আমি তড়িতকে

স্বহস্তে বিনা আবরণে ধারণ করতে চাই তাহলে কোন জ্ঞানবানই তাতে রাজী হবেন না, একমাত্র শাস্তি দেওয়ার মানস ছাড়া। যারা সত্যাশ্রয়ী তারা তো আসমান, যমীনে, ইতিহাসের অলিগলিতে আল্লার বাণীর সত্যতা নিত্য প্রত্যক্ষ করছে। ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে সর্বপেক্ষা বড় নিদর্শন শেষ নবী ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরান। ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদীবাদী, খৃষ্টবাদী ও ছদ্মবেশী মুসলমান বা মুনাফেকরা এর মোকাবেলা করতে পারেনি। আগামীতেও অজ্ঞের দল এর মোকাবেলা করতে পারবে না। তারা মোকাবেলা করছে বৈরাগ্যবাদী গোপালদের, সত্যাগ্রহী মুসলমানদের নয়। এতবড় নিদর্শনকে যারা অস্বীকার করে তাদের ভাগ্যে নরক ছাড়া কিছুই নেই।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মুসা (আঃ) বা ঈশা (আঃ) বিরোধী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের আধুনিক উত্তরসূরী কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের অনুসারী বানাতে ব্যস্ত ছিল। ১২০ আয়াতে এই ঐতিহাসিক প্রসংগের উল্লেখ আছে। তাই হযরত মোহাম্মদের (সঃ) বহুকাল পরে জর্জ বার্ণাড শ' মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন "Far from being anti-christ he was the savior of humanity" অর্থাৎ খৃষ্টবিরোধী হওয়া তো দূরের কথা তিনি তো মানবাতার ত্রাণকর্তা। এটা তিনি হতে পেরেছিলেন ইহুদীবাদী ও খৃষ্টবাদীদের আগ্রাহ্য করে খোদাবাদী হওয়ার জন্য। হযরত মোহাম্মদকে (সঃ) এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, যে মহাসত্য তোমাকে দান করা হয়েছে তাকে ভক্তিভরে উপেক্ষা করে তুমি যদি বণি-ইসরাঈল গোপলদের মত স্বার্থপরতার নীতি অনুসরণ কর তাহলে তুমি কল্যাণ বঞ্চিত, রিক্ত হস্ত হবে। তুমি কার্যকালে দেখবে যাদের বন্ধু ভেবেছিলে তারা উধাও আর অদৃশ্যের খোদাও তোমার সাথে নেই কারণ তাঁর সাথে তোমার অদৃশ্য যোগাযোগ তুমি নিজেই ছিন্ন করে ফেলেছ। জ্ঞানময় কেতাব অনুসরণ না করে উম্মতে মুহাম্মদী বর্তমানে এটাই করে বসেছে। নবী ও নবীপন্থীদের কি করা উচিত তা ১২১ আয়াতে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, আমরা যাহাদিগকে কেতাব দিয়াছি তাহারা উহা যথোপযুক্তভাবে পড়ে এবং উহার প্রতি নিষ্ঠা সহকারে আস্থা রাখে। উহার প্রতি যাহারা কুফরী করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

যে পটভূমিকায় কথা বলা হয়েছে তা আর একবার লক্ষ্য করুন। খোদাবিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদীবাদী, খৃষ্টবাদী এবং ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ নিরেটদের সাথে সত্য কেতাবধারীদেরও সতর্ক করা হয়েছে যারা কেতাবের উত্তরাধকারী হওয়া সত্ত্বেও কেতাব যথাযথভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ না করে নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং বাঞ্ছিত ফল থেকে বঞ্চিত হয়। কল্যাণ পাবে শুধু তারা যারা নবী মোস্তফার

উপর অবতীর্ণ কেতাবের সত্যতা গভীরতর অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি করে আস্থা স্থাপন করত সংগ্রামের মাধ্যমে বাস্তব দুনিয়ায় তার সত্যতা প্রতিপাদন করে। যারা একে পড়েনা, বুঝেনা পূর্ববর্তী ঐশীগন্থের সাথে একে তুলনা করেনা, তুলনামূলক অধ্যয়ন করেনা, নিজেদের কাছে যা আছে তাকেই একমাত্র সত্য ভেবে বিভ্রান্ত কিংবা যারা আদৌ কোন ঐশীগ্রন্থ মানতে চায়না তারা শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করতে পারবেনা বরং অজ্ঞতাবশত অহংকারের বশে সত্যের উপর আঘাত হানতে গিয়ে নিজেরাই পথের ধারে ছিটকে পড়বে, ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আখেরাতে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। উম্মতে মোহাম্মাদীও যদি মহাসত্য উপলব্ধির চেষ্টা না করে তার প্রতি মৌখিক বিশ্বাস স্থাপন করে ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদীবাদী, খৃষ্টবাদী, সংশয়বাদী অথবা অদৃশ্যতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ নাস্তিকের প্রদত্ত আপাতসত্যে আস্থা স্থাপন করে ভুল পথে চেষ্টা সাধনা করে তাবে তারাও ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে কারণ মৌখিক নিষ্ঠাহীন বিশ্বাসের কোন বাস্তব মূল্য নেই। উম্মতে মোহাম্মদী যদি খৃষ্টানদের ন্যায় মোহমেডান হয়ে খৃষ্টের নাম জপের ন্যায় দরুদের মাধ্যমে মোহাম্মদের নাম জপে তাহলে পরিণামে ব্যর্থতা ছাড়া কি লাভ হবে? হাকিমউল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) লিখেছেন আল্লাকে নামাজ ও নবীকে দরুদ ঘুস দিয়ে কেউ রেহাই পাবেনা। কেতাব ও নবীকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইহুদীবাদী, খৃষ্টবাদী ও মহমেডানদের নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদের মাধ্যমে ময়দান থেকে উৎখাত করে আল্লার সার্বভৌমত্ব মানবীয় ভ্রাতৃত্ব কায়েম না করা পর্যন্ত কোন গোষ্ঠিই রেহাই পাবেনা। কেননা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আল্লাকে বাদ দিয়ে বিকল্প আল্লা তৈরী করেছে; সেজদাগাহ বা মসজিদ বাদ দিয়ে দেবালয় স্থাপন করেছে এবং শেষপর্যন্ত মসজিদকে দেবালয় বানিয়েছে। এই দেবালয়ে অন্যের প্রবেশাধিকারও বন্ধ করেছে। এই বর্ণবাদীরা আল্লাহ ও মানুষের অধিকার হরণ করেছে। এরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই এদের ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে সত্যানুসারীদের অধীন এই সমাজবিরোধীদের আইনের শাসনের মধ্যে বন্দী করে রাখা উচিত।

ইহুদীবাদীরাও আল্লাহ ও বান্দাদের অধিকার নষ্ট করেছে। খৃষ্টবাদীরা যীশুকে খোদার ব্যাটা বানিয়েছে ও বৈরাগ্যবাদী হয়ে মানুষের অধিকার নষ্ট করেছে আর ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন, দুনিয়াপূজক নাস্তিকরা অজ্ঞতাবশত আল্লার অধিকার তো দূরের কথা আল্লার অস্তিত্বই অস্বীকার করেছে, তারা আল্লার ইবাদতের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেনি, মসজিদ মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেনি, ঐশীগ্রন্থ নিয়ে মাথা

ঘামানোটাই তাদের কাছে নিরর্থক পণ্ডশ্রম, হযরত মোহাম্মদের (সঃ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও অবদানও তাদের নজর এড়িয়ে যায়। মহমেডানরা মৌখিক ভক্তি দেখিয়েই খালাস। এমতাবস্থায় দুনিয়া সত্য বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখন ঐশীগ্রন্থ সমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন, ইবরাহীম (ব্রহ্মা) মুসা, দায়ুদ, ঈশা ও তাঁদের উত্তরসূরী মোহাম্মাদের (সঃ) প্রকৃত অনুসারী প্রকৃত সত্যাগ্রহী, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যের জন্য পূর্বোক্ত দৈত্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া প্রয়োজন। কেতাব যথোপযুক্তভাবে পড়লে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করলে এ মহাসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মসজিদ ভেঙ্গে দিলে, তাকে যাদুঘর অথবা মিউজিয়াম বানালেও সত্যাশ্রয়ীর কিছু আসে যায়না কারণ, 'পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লার। যেদিকেই তুমি মুখ ফিরাইবে সে দিকেই আল্লার চেহেরা বিরাজমান, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশালতাসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ। —(সূরা বাকারা-১১৫)

পূর্ববর্তী নবীদের উপর হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে যে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে তা এই যে তাঁর জন্য সারা বিশ্বই মসজিদ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যেকোন স্থান থেকেই কেবলামূখী হয়ে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে। এ জন্যে দেবালয়ে ওঠার জন্য আন্দোলন, পুরোহিত হবার জন্য বিশেষ কোর্স পড়ে সার্টিফিকেট লাভ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী হবার দরকার নেই বরং আল্লাকে সেজদা করে তাঁর উপর নির্ভর করে সত্যাশ্রয়ী সংগ্রামী হওয়ার দরকার।

যখন মসজিদ মন্দিরে পরিণত হয় সেই পরিবেশে করণীয় কি তা ১৫ রুকূতে বলা হয়েছে। বণি-ইসরাঈলীরা মসজিদ বঞ্চিত হয়েছিল, ফ্যারাওয়ের সূর্যমন্দিরে তাদের প্রবেশাধিকার ছিলনা। গোপূজকদের অধীনে তারা গোবেচারা গোপাল হয়ে গিয়েছিল। এই গোপালদের হত্যা ও তাদের নারী সমাজকে দেবদাসী প্রমোদবালা বানানো হচ্ছিল, ঝি-চাকরাণী করা হচ্ছিল। হযরত মুসার নেতৃত্বে কেতাব অনুযায়ী মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য তারা আযাদী ও নেতৃত্ব লাভ করেছিল। তাদের মধ্যে দায়ুদ ও সোলেমানের মত শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল। ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফের আমলে তারা মিশরের মত প্রচীন সভ্যদেশের অধিপতি হয়েছিল। এ সবই হয়েছিল অহীর যথার্থ অনুসরণের কারণে। এই অনুগ্রহের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে ১২২ আয়াতে। এ সবই ছিল তাদের খোদাভীরুতা, খোদাভক্তি,ঐশীদায়িত্ব পালনের ফল। এ দায়িত্ব পালন না করার ফলে তারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় পালিয়ে এসেছে এখানে হযরত মুসার মতো নবী ও তওরাতের মতো কেতাব তাদের সামনে বিদ্যমান কিন্তু তারা তাদের বর্ণবাদ পরিত্যাগ করতে পারছেনা। ফলে দুনিয়া তো গেছেই, আখেরাতও যাবে। ১২৩ আয়াতের মর্মকথা এই। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ছেলে

ইবরাহীম বা ব্রহ্মা বর্ণবাদ ছেড়ে শিবগাতুল্লাহ বা আল্লার বর্ণ গ্রহণ করার ফলে বিরাট মানবাতাবাদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে আল্লাহ-পাক তাঁকে নয়া ঐশী মানবতার ইমাম বানাবার প্রস্তাব দিলে মহাত্মা ব্রহ্মা অদৃশ্যের জ্ঞাতা পরম সত্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি তাঁর বংশাবলীর জন্যও। আলেমূল গায়েব বললেন তোমার বংশের যালেম ব্যতীত সবার জন্য। সব সত্যাগ্রহী, সত্যাশ্রয়ী সংগ্রামীদের জন্য। ইহুদীরা সত্যাগ্রহী না হওয়ায় মহাত্মা ব্রহ্মার বংশধর হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব হারিয়েছ এবং যেটুকু সম্মান আছে অচিরে তাও হারাবে। ১২৪ আয়াতে এই ভুমিকা প্রদানের পর ১২৫ আয়াতে মহাত্মা ব্রহ্মার ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক অবদান কাবা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ১২৫ আয়াতে এই ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে ইসমাঈল বা বিষ্ণুর ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে। ১২৬ আয়াতে ব্রহ্মার অভিপ্রায় ১২৭,১২৮ ও ১২৯ আয়াতে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর যুগ্ম অভিপ্রায় বিবৃত করা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সেই অভিপ্রায়ের বাণীমূর্তি। তাঁদের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই শেষনবী প্রেরিত হয়েছে অথচ মক্কার ব্রাহ্মণদের ন্যায় মদিনার ব্রহ্মপুত্রগণ তা প্রত্যাখ্যান করছে। এটা কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়? ষোড়শ পরিচ্ছদে বলা হয়েছে ইবরাহীম (আঃ) মহাজ্ঞাণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁর নমস্য পরম সত্তাকে, অদৃশ্যের জ্ঞাতাকে চিনতেন। তিনি স্থূলদর্শী ছিলেন না, ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী। কিন্তু তাঁর বর্তমান বংশধরগণ স্থূলদর্শী। তাই তারা ব্রহ্মা ও মোহাম্মদের (সঃ) অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারলো না। মোহাম্মাদ (সঃ) তো ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দৈহিক ও মানসসন্তান। তিনি আলেমুল গায়েবের একান্ত অনুগত ছিলেন। ১৩১ আয়াতে একথা বলার পর ১৩২ আয়াতে বলা হয়েছে ব্রহ্মা তাঁর সন্তানদেরও স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণরা ইতিহাসই লোপাট করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত খোদাকে বাদ দিয়ে উলঙ্গ সাধু হয়ে কাবা পরিক্রমা করছে, পশুপূজক হয়ে পাশ্বাধম হয়েছে।

ইহুদীরা ব্রহ্মার পৌত্র হযরত ইয়াকুবের বংশধর। হযরত ইয়াকুবও তার দ্বাদশ পুত্রকে তাঁর পূর্বপুরুষ ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বরের (ইসহাক) ন্যায় এক খোদার আনুগত্যের কথা বলেছিলেন। সে ইতিহাস ইহুদীরা বিস্মৃত হয়েছে। এই পূর্বগামী দলটিই ছিল সঠিক পথের অনুসারী। ১৩৪ আয়াতে এ তথ্য প্রদানের পর ১৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে তাদের অধস্তন বংশধররা খোদাকে বাদ দিয়ে ইহুদীবাদী ও খৃষ্টবাদী হয়েছে। এরা সত্যবাদী নয়। এরা অংশীবাদী আর মহাত্মা ব্রহ্মা অংশীবাদী ছিলেন না। ১৩৬ আয়াতে অংশহীন বর্ণহীন মানবতাবাদীদের আদর্শ গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে নিম্নভাষায় "ঘোষণা কর আমরা বিশ্বাস এনেছি আল্লার

প্রতি, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি, যা মুসা, ঈশা ও অন্যান্য সকল নবীকে খোদার তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন ফারাক করিনা এবং আমরা একমাত্র আল্লারই অনুগত। —সূরা বাকারা-১৩৬) এটাই হলো শৈবধর্ম বা মঙ্গলাচরণ।

স্রষ্টা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের জীবনপদ্ধতিই সর্বোত্তম জীবনপদ্ধতি। এঁদের জীবনপদ্ধতির মধ্যে দেশকাল-পাত্রগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিলনা। ব্রহ্মা থেকে নয়া ব্রহ্মা মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল গোষ্ঠীই মূলত একই গোষ্ঠী যদি তারা অংশীবাদী না হয় কেননা নবীরা অংশীবদী ছিলেন না। অংশীবাদী হলেই সত্যাশ্রয়ী না হয়ে মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে যাবে। আবার যদি ব্রহ্মাকে মানে কিন্তু পরবর্তী নবীকে না মানে তাহলে আধ্যাত্মিক প্রগতিশীলতার প্রবাহ নষ্ট হবে। তাই যদি সমকালীন নবীর প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয় আর যদি পূর্ববর্তী নবীদের অমান্য করা হয় তাহলে খোদাকেই অমান্য করা হয়। নবীরা একই খোদার কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করেছেন। তাই সেই নির্দেশ খোদার নির্দেশ। তাকে মান্যতা দান ঐশী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা উপলব্ধির সহায়ক হয় আর পূর্বগামী সত্যাশ্রয়ী লোকেদের সংগ্রামকাহিনী পরবর্তীকালের লোকেদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়। সব নবীই পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তারা ব্রহ্মাকে মনে করতেন নবীদের জনকের ন্যায়। সকলকে মেনে নিলে মানসিক সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়, গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা দূর হয়ে সার্বজনীন মানবীয় ঐক্যানুভূতি সৃষ্টি হয়। মানবীয় বিকৃতির হাত থেকে সত্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বারবার নবী পাঠিয়ে বিকৃতির সংশোধন ও প্রগতিশীলতা রক্ষা করা হয়। সামাজিক অগ্রগতির সাথে তাল রেখে পূর্ববর্তী নির্দেশের রদ্দবদল করা হয়, প্রয়োজনে নয়া নির্দেশ দান করা হয়। শেষ নির্দেশনামা পবিত্র কোরানে তাই পূর্ববর্তী নবী, তাঁদের বিবরণ, তাঁদের গোষ্ঠীসমূহের বিকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষ সংশোধনী হিসাবে কোরানকে কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটা তাই এক মহা সনদ। নবীদের সঠিক জীবনী সংরক্ষণও প্রয়োজন। পূর্ববর্তী কেতাব ও নবীদের কার্যকলাপের সঠিক সংরক্ষণ না হওয়ায় যে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল পবিত্র কোরান ও শেষ নবীর বাণী ও ইতিহাস সংরক্ষিত হওয়ায় মানবজাতি আধ্যাত্মিক শুন্যতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। কোরানের উপর নির্ভর করে যে সমাজ রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়েছিল তাই সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র। ইতিহাসে তা সংরক্ষিত রয়েছে। নবীর জীবনে যে গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল তাই ছিল সভ্য গোষ্ঠী।

আদর্শ গোষ্ঠী ছিল ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গোষ্ঠী, ইয়াকুবের বনি-ইসরাইল গোষ্ঠী। এরই এক শাখা যীশুর গোষ্ঠীসমূহ যেমন বিকৃত হয়ে যায় তেমনি দেড় হাজার বছরে হযরত মোহাম্মাদের (সঃ) গোষ্ঠীও বিকৃত হয়ে যায়। ভারতে তথা প্রাচ্যজগতে বিকৃত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর গোষ্ঠী, মধ্য প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিকৃত ইসরাঈল গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। এখন এই গোষ্ঠীসমূহ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিহার করে সহাবস্থান ও সমন্বয় করতে চাইলে তার অনেক সুযোগ বিদ্যমান। তারা তাদের কাছে রক্ষিত বা উত্তরাধিরাসূত্রে প্রাপ্ত বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থাকে ঐশীবাণীর আলোকে পর্যালোচনা করে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

১৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে কোরানের আগমনকালে যারা নবীর কাছে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে এই মহাসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তেমন করে যারাই আস্থা স্থাপন করবে, তারাই সঠিক পথগামী, তারাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী এবং তারা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে কিন্তু এটা করতে রাজী না হলে তারা যে রক্ষণশীল গোঁড়া সেকেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ যথেষ্ট। তাদের কাছে এই মহাসত্য পৌঁছে দেয়া ছাড়া সত্যসাধকদের করণীয় কিছু নেই। যারা সত্য বিমুখ হবে, প্রাচীনপন্থী হবে তারা জড় ও স্থাণু ও প্রস্তরবৎ হবে। তাদের সভ্যতা হবে কুসংস্কারের অচলায়তন। তার ভারেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করলে না খোদার না খোদাবাদীদের কিছু করার আছে। তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে যাওয়া ছাড়া খোদা তাদের জোর করে অনুগত হতে বাধ্য করবেন না কারণ জোর করে মুসলমান করা যায়না। এটা নিয়ম নয়।

১৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হও, তাঁর অনুগত প্রতিনিধি হও। এটাই সর্বোত্তম আধ্যাত্মিকতা। ইবরাহীম (আঃ) ইয়াকুবের (আঃ) মত কর্মতৎপর হও। দুনিয়াতে রাষ্ট্রক্ষমতা ও পরকালে স্বর্গ পাবে।

১৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে নিরঙ্কুশভাবে এক খোদাকে মানাই সত্যনীতি কারণ এটা পূর্ববর্তী সত্যসাধকদেরই নীতি। তিনি সকলের খোদা। এখন তাঁকে যদি কেউ লা-শীরক হিসাবে মানতে না চায় তাদের পথ পৃথক আর যারা মানে তাদের পথ পৃথক। মুসলমানরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাকে মাননেওয়ালা। ১৪০ বক্তব্য ইহুদীবাদ খ্রীষ্টবাদের পরবর্তীকালের সংযোজন। এদের আদি পুরুষরা কেউ ইহুদী বা খ্রীষ্টান ছিলেন না। ছিলেন একান্তভাবে আল্লাহপন্থী। কিন্তু ইহুদীরা আঞ্চলিকতাবাদী ও খ্রীষ্টানরা ব্যক্তিপূজক। একদল দেশপূজক অন্য দল নরপূজক। এরা তাদের মত

খোদা পূজক নয়। আল্লাহ পাকের নিজস্ব বিশ্লেষণ হচ্ছে এই। কে আল্লাহপূজক আর কে আল্লাহ পূজক নয় তা আল্লাহর চেয়ে কেউ বেশি জানার দাবী করতে পারে না। করলেও তা সর্বদা অগ্রাহ্য হবে। তা ছাড়া স্বয়ং খোদার সাক্ষ্য অনুসারে পবিত্র কুরআন বর্তমান। জেনে শুনে এ সত্য গোপন করা যেতে পারে না। এ সত্য গোপনকারীরা নিজের ও মানবতার প্রতি অত্যাচারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। ইহুদীবাদী ও খ্রীষ্টবাদীরা যা করছে তা আল্লাহ অবগত আছেন। এর পরিণাম তাদের ভোগ করতে হবে।

১৪১ আয়াতে বলা হয়েছে পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে কেউ রক্ষা পাবেনা। নিজেদের কাজের মধ্যেই নিজেদের পরিণাম নির্ভরশীল।

সারসংক্ষেপঃ

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকৃত সাধকদের গুণাবলী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কপট বা দ্বিজদের ভূমিকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানবতার প্রতি সত্যগ্রহণের আহ্বান, চতুর্থ পরিচ্ছেদে মানব সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতা ও দানবের বিবরণ। ৫ম পরিচ্ছেদে ইসরাঈল সন্তানদের মানবাতাবাদী হওয়ার আহ্বান, ৬ষ্ট পরিচ্ছেদে তাদের অতীত ইতিহাসের উপর পর্য্যালোচনা ও তাদের খোদবিমুখতা, স্বার্থপরতা, ৭ম পরিচ্ছেদে তাদের শৃঙ্খলাহীনতা, ৮ম পরিচ্ছেদে তাদের বানরসুলভ মানসিকতা ও গোপূজা, ৯ম পরিচ্ছেদে তাদের পাষাণমনা হয়ে খুন-খারাবীতে লিপ্ত হওয়া, তাদের সংস্কার আন্দোলন বিমুখ মানসিকতা, তাদের মধ্যে কেতাব সম্পর্কে একাবারে অজ্ঞ লোকের আবির্ভাব হওয়া এবং বর্ণবাদী হয়ে যাওয়া ১০ম পরিচ্ছেদে অজ্ঞতার দরুন ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, দুনিয়ার জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকা, একাদশ পরিচ্ছেদে তাদের সংস্কারকামীদের হত্যা, অজ্ঞতার প্রতি তাদের গভীর আসক্তির জন্য অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত কোরান গ্রহণের সুযোগ নষ্ট করা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খোদার কেতাবের পরিবর্তে তাদের যাদু ও অন্ত্রমন্ত্রের প্রতি আসক্তি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে তাদের প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি, সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা চতুর্দশ পরিচ্ছেদে তাদের ইহুদীবাদী ও খৃষ্টবাদী হয়ে যাওয়া, নবীদের খোদার আসনে বসিয়ে মসজিদে খোদার পরিবর্তে নবীপূজা শুরু করা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তাদের পূর্বপুরুষ ন্যায়-সত্য ও আধ্যাত্মিকতার ইমাম ইব্রাহিমের (আঃ) অবদান ও প্রার্থনার উল্লেখ, ষোড়শ পরিচ্ছেদে যে পূর্বপুরুষের নামে তারা পরিচিত সেই ইসরাইল বংশের আদিপুরষদের কার্যকলাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের নসিহত করা ও ইহুদীবাদ ও

খৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করে সত্যাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতসব কিছুর ব্যর্থতার পর তাদের মানবতার নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

এই দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব থেকেই জাগতিক নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়। ঐশীজ্ঞান আয়ত্তের মধ্যেই থাকে জাতির জীবন ও উত্থান আর ঐশীজ্ঞান পরিত্যাগ করে পার্থিবপরতায় লিপ্ত হলে মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, চারিত্রিক পতন, খোদাপূজার পরিবর্তে পশুপূজা, অশ্লীলতা, খুন-জখম-হত্যা, বর্বরতা দলাদলি, নরপূজা, নবীপূজা প্রভৃতি যাবতীয় খারাবী আত্মপ্রকাশ করবে। এসব ধর্ম নয়, ধর্মীয় বিকৃতি। এতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় নেতৃত্বই হারাতে হয়। দুনিয়ায় গোলামী ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করতে হয়। এমতাবস্থায় নতুন কেতাব নতুন নবীর আত্মপ্রকাশ হয় এবং পুরানো উম্মতদের পুনরায় সত্যগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সে আহ্বান উপেক্ষিত হলে নতুন উম্মতকে স্বতন্ত্র উম্মত হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সপ্তদশ পরিচ্ছদ থেকে তাই আলোচনার ধারা অন্যদিকে ঘুরে গেছে যা আমরা পরে আলোচনা করবো। স্থুলদর্শিতার কারণে বনিইসরাঈলরা বরবাদ হলো। তারা শেষ পর্যন্ত তাগুতের গোলাম হলো এবং আলোর থেকে অন্ধকারের দিকে ফিরে গেল। যারা মুক্তি পেল তারা নবীর অনুসরণ করে অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথের পথিক হলো। যারা এ মহাতত্ত্ব বুঝতে পারে না তারা গরুছাগল ছাড়া কিছুই নয়।

সায়াকুলুস সুফাহায়ো

(ধর্মের মুখোশধারী নির্বোধদের প্রতিক্রিয়া)

সপ্তদশ পরিচ্ছদ থেকে আলোচনার ধারা নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। এজন্য একে সূরা বাকারায় ২য় পারা বলা হয়। প্রথম অংশ শেষ হবার পরে দ্বিতীয় অংশের শুরু। এই অংশের নাম সাইয়াকুলুস সুফাহায়ো অর্থ্যাৎ মূর্খদের বা মৌলবাদীদের উক্তি। ইহুদীরা গোপালে পরিণতি হয়েছিল তাই প্রগতিশীল যাবতীয় পরিবর্তনে তাদের আপত্তি দেখা দিতে লাগলো। এই আপত্তিগুলো এখানে খণ্ডন করা হয়েছে।

হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের কেবলা বা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। কেননা নবী নতুন ধর্ম নয়, ইব্রাহিমী ধর্মেরই পুনঃ প্রচারক ছিলেন। হিজরতের পরেও ষোল সতেরো মাস পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তেন। অতঃপর কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এখন কাবাকে কেবলা বানানো হয় যা ছিল প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। ইসরাঈলীদের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। কেবলা পরিবর্তনের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি ছিল তা স্থুলদর্শী ইহুদীদের চোখে ধরা পড়লো না। এজন্য এদের নির্বোধ বলা হয়েছে। তারা যে বোধশক্তিহীন বানরে পরিণত হয়েছিল তা প্রথম পারায় উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় পারায় তা আবার সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তাদের উত্থান পতনের কারণ যখন তাদের বুঝে আসেনি তখন তারা উম্মতে মোহাম্মদীর উত্থানের কারণ বুঝবে কি করে? নির্বোধরা কিছু বুঝতে পারেনা। প্রকৃত কারণ হলো আল্লাহ কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবই আল্লার। সেরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ যে পথ খোদা পর্যন্ত চলে গেছে সে পথের পথিক পবিত্র কোরানের বাণীবাহক ও তাঁর অনুগামীরা। তারা বর্ণবাদী, গোত্রবাদী, জাতীয়তাবাদী নয়, তারা সার্বজনীন সত্যের পতাকাবাহী, দেশ কাল পাত্র নয়, সত্যই একমাত্র বিবেচ্য কিন্তু নির্বোধদের কাছে সম্বল কেবলমাত্র পরম্পরা জাতীয় ঐতিহ্য। ইসলাম নির্বোধদের ধর্ম নয়, জ্ঞানীদের ধর্ম। কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাস উভয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেন্দ্রের গুরুত্ব জ্ঞানীদের কাছে প্রতিভাত। ইহুদীবাদী ও খৃষ্টাবাদীরা সত্যবাদী না হয়ে বিকৃত ঐতিহ্যবাদী হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের অনুসরণ রদ করা হলো এটা দেখার জন্য যে মুসলমানরা তাদের মতো ঐতিহ্যবাদী না খোদাবাদী। কেবলা পরিবর্তনের আদেশ সহসা আসে। এ ব্যাপারে পূর্বে কিছু বলা হয়নি। বায়তুল মুকাদ্দসমুখী হয়ে নামাজ পড়াকালীন অবস্থায় এ নির্দেশ

আসে। কোন কিছু বলার অবকাশ ছিল না। ইমাম হিসাবে মহানবী উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যান আর মুসলমানরা ইমামের পিছনে উত্তরে চলে যায়। এতখানি রদবদল নিশব্দে সম্পাদিত হয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় যে মুসলমানরা কোন দিকের গোলাম হয়নি, গোলাম হয়েছে আল্লার। তাদের মানসিকতায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তারা গোলামী মানসিকতা বর্জন করতে শিখেছিল। তারা ইহুদীদের মতো ধর্মান্ধ না হয়ে প্রকৃত ধার্মিক হয়েছিল। তাদের সমঝবুঝের মধ্যে ভারসাম্য এসে গিয়েছিল। তারা খৃষ্টানদের নরপূজা ও ইহুদীদের পশুপূজার ভ্রান্তি বুঝতে পেরেছিল। তারা ইহুদীদের পার্থিবপরতা ও খৃষ্টানদের পার্থিবজীবনের প্রতি অনীহার প্রান্তিকতার উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারা সুক্ষ্মদর্শী হয়েছিল। তারা ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে পেরেছিল। তারা ইহজীবনের জন্য পরজীবন আবার পরজীবনের জন্য ইহজীবন বরবাদ করতে রাজী ছিল না। তারা আল্লার দ্বীনের মধ্যে গভীর বাস্তবতা খুঁজে পেয়ে ছিল। তারা ইহজীবনের উপর পরজীবনকে প্রাধান্য দিতে শিখেছিল, শিখেছিল নিজেদের মনস্কামনার উপর খোদার মর্জীকে প্রাধান্য দিতে। আল্লাহ পাক তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, তারা সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তাদের বিশ্বনেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছিল। তাদের সত্যের পতাকাবাহী বানানো হয়েছিল যেহেতু তারা খোদার মনোনীত নবীকে সত্যের বাণীমূর্তিরূপে মেনে নিয়েছিল। নবী ঘুরে গেল তো তারাও ঘুরে গেল। নবীকে বাক্য ব্যয় করতে হয়নি। এতে মহান আল্লাহ যারপরনায় খুশী হয়েছিলেন। ১৪৩ আয়াতে তাই মোমেন বা বিবেকবানদের কার্যকলাপের প্রশংসা করা হয়েছে আর তাদের বিরোধীদের তাই নির্বোধ বলা হয়েছে। কারণ তারা স্পষ্টতই বুঝতে অক্ষম। ইহুদীরা বস্তুতই গোপাল ছিল। ১৪৪ আয়াতে কাবাকে কেবলা করার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৪৫ আয়াতে এ ব্যাপারে আপোষ করতে নিষেধ করা হয়। ১৪৬ আয়াতে বলা হয় কাবা যে বায়তুল মুকাদ্দসের পূর্বে কেবলা ছিল তা ইহুদীদের অজানা নয়। ১৪৭ আয়াতে এ ব্যাপারে মুসলমানদের মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হতে নিষেধ করা হয়।

অষ্টাদশ রুকূতে আনুষ্ঠানিকতা নয় কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানান হয়েছে। তারা আল্লার কতটা নিষ্ঠাবান অনুসারী আল্লাহ তা দেখতে চান। ১৪৯ আয়াতে মুসলমানদের কাবাকেন্দ্রিক উম্মত হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। ১৫০ আয়াতে এ ব্যাপারে মদভেদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মূর্খ গোপালরা নানা কথা বলবে। তাদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া চলবে না, গুরুত্ব দিতে হবে আল্লার কথায়। তাহলে তারা

আল্লার তরফ থেকে নেয়ামতের পর নেয়ামত পেয়ে ধন্য হবে। ১৫১ আয়াতে নবীকেও কল্যাণ বলা হয়েছে। সুতরাং কল্যাণের প্রতিযোগিতা বলতে খোদা ও তার নবীর আদেশ পালনের প্রতিযোগিতা। কেতাব ও নবীর শিক্ষার ফলে জীবনে উৎকর্ষতা আসে, অজানা জ্ঞান লাভ হয়। ১৫২ আয়াতে তাই কল্যাণের উৎস আল্লাকে স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। তারা যেন ভোলানাথ না হয়। গোপাল না হয়। আল্লার আদেশ কার্যকরী করে আল্লার নেয়ামতের কদর করতে বলা হয়েছে। শোকরগোজার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে বলা হয়েছে। গোপালদের মতো অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ ও নবী অন্যকথায় কেতাব ও সুন্নাহকে মেনে আল্লার কাছে প্রার্থনা ও ধৈর্য্যসহকারে কাজ করার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। মূর্খদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে কাজ করে গেলে আল্লার সাহায্য পাওয়া যায়। সেরাতুল মুস্তাকীম আল্লার নির্দেশ। প্রার্থনা বা নামাজ হচ্ছে আল্লার নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য শক্তিভিক্ষা। যার সে আকাঙ্খা আছে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। ধৈর্যশীল বা স্বাবলম্বী লোক যে নিজের কাজ নিজে করে নিজেকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে তাউন বা সাহায্য করেন। আল্লার কাজে নিজেকে যে উৎসর্গ করে সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য জীবন দান করে সে মৃত নয়, অমর। সে আমরধাম জান্নাত লাভ করে। আল্লার নাফরমানির মাধ্যমে অমরতা লাভ করার আকাঙ্খা হযরত আদমের পূরণ হয়নি বরং এই স্থূলজ্ঞানের পরিণাম খারাব হয়েছিল। অমরতা লাভের মাধ্যমে হচ্ছে স্বাবলম্বী হয়ে সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া, শহীদ হওয়া। এটাই সেরাতাল মুস্তাকীম। এটাই হচ্ছে কল্যাণ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা। ১৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে অধ্যবসায়ের পথে বাধা হচ্ছে ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি, আমদানী হ্রাস। এ সবের ভয়ে লোক আল্লার পথের পথিক হতে চায় না। আল্লার পথে সংগ্রামে এসব ধৈর্য সহকারে বরদাস্ত করলে তবে সবর করা হয়। সংগ্রামের পথে যে বিপদ আসে তা বরণ করে সংগ্রাম করার নাম সবর। ১৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লার কাছে এ সবরের বদলা পাওয়া যাবে ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়ার নাম নির্ভরতা। সবর ও তাওয়াক্কুলের বিনিময়ে রহমত লাভ হয়। এই অনুগ্রহধন্য লোকেরাই সঠিক পথগামী। প্রথম রুকুতে মুত্তাকীদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে এগুলো তার ব্যাখ্যা। ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো কোন পৌত্তলিক কাজ নয় কারণ এ দু পাহাড়ের মাঝে মা হাজেরার মত পুতচরিত্রের মহিলা খোদায়ী পরীক্ষার কারণে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। পরবর্তী কালে লাত মানাত নামক ব্যভিচারী ব্যভিচারকারিনীর মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়েছিল বলে সত্যাশ্রয়ীদের মনে স্বাভাবিক কুণ্ঠাবোধ ছিল। এখানে এই

সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে। কাবাতেও বহু বদমাসের মূর্তি ছিল। এজন্য কাবার মৌলিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। লাত-মানাতের মূর্তি অপসারণের পর এখানকার পবিত্রতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫৯ আয়াতে ঐশী নির্দেশ গোপন করার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হবে বলে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। ১৬০ আয়াতে অবাঞ্ছিত আচরণ সংশোধনের মত্তকা দেওয়া হয়েছে। সত্য গোপন না করে সত্য প্রকাশের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এসব উপদেশ সাধারণ ভাবে সকলের জন্য হলেও বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য। ইতিপূর্বে ইহুদীরা সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী ছিল। তারা সত্য বাস্তবায়িত করতো না। ১৬১ আয়াতে যে মহাসত্যের বিবরণ প্রথম থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাকে যারা স্বীকৃতি দিবেনা বরং নরপূজা থেকে পশুপূজার মতো কাজ করে মনুষ্যেত্যর জীবন-যাপন করবে যেমন ইহুদীবাদী ও খৃষ্টবাদীরা করেছে। তারা তাদের মূর্খতার দরুণ অভিশপ্ত ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন মুক্তিই তারা পাবে না। এমনটা হওয়ার কারণ বিশ্বভুবনের নিয়ন্ত্রক এক আল্লাই। ১৬৩ আয়াতে এই মৌলসত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ রুকুতে এই মহাসত্যের প্রমাণ স্বরূপ ১৬৪ আয়াত প্রদান করা হয়েছে যা বিজ্ঞান বিষয়ক। মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হলে অনুভব করবে যে মানুষ, পশু কিংবা অন্যকিছু খোদা হতে পারে না। কোন সৃষ্ট পদার্থ, দৃশ্য পদার্থ খোদা হতে পারে না। খোদা হতে পারে একজনই এবং তিনি দৃশ্যজগতের অন্তরালস্থিত অদৃশ্য সত্তা। সেই অদৃশ্য সত্তাই দৃশ্যজগতকে পরিদৃশ্যমান করে রেখেছেন। কিন্তু যাদের জ্ঞান নেই সেই স্থূলদর্শীরা দৃশ্যমান সৃষ্ট বস্তুকে নিজেদের ধ্যানজ্ঞান, ইষ্টদেবতা মনে করে। সুক্ষ্মদর্শী একত্ববাদীরা এক আল্লাকে সবকিছুর উপর স্থান দেয়। এজন্য স্থূলদর্শী ইহুদীরা মুসলমানদের (*২য় রুকু দ্রষ্টব্য*) নির্বোধ আখ্যায়িত করতো আর নিজেদের বাহ্যিক ধার্মিকতাকে বুদ্ধিমত্তা মনে করতো। আল্লাহ এই চালাক চতুর দ্বিজ স্থূলদর্শীদের দ্বিতীয় পারার প্রথমেই নির্বোধ বলেছেন, প্রকৃত বোধহীন, চেতনাহীন আখ্যা দিয়েছেন। গোটা প্রথম পারাতে তাদের বোধহীনতার বিবরণ পেশ করেছেন। তারা সত্য কার্যকরী করতে পরাঙ্মুখ হয়েও নিজেদের সত্যবাদী ভেবে গর্ব অনুভব করেছে। তাই নির্বোধরা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও আখেরাতে আযাবের সম্মুখীন হবে। তাদের প্রতারণামূলক ধার্মিকতা তাদের নিজেদের প্রতারিত হওয়ার কারণ হবে। ১৬৫ আয়াতে বলা হয়েছে যখন তারা এটা বুঝতে পারবে তখন কোন ফল হবে না। ১৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে-সব ধর্মব্যবসায়ী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনসাধারণকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করেছিল তারা

তাদের অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না। ১৬৭ আয়াতে অনুসরণকারীদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ভেড়ার দলও শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। অনুসরণকারীরা বলবে তাদের আর একবার দুনিয়াতে পাঠানো হোক। তারাও নেতাদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে দেখিয়ে দেবে তারা এই শয়তানদের মানে না। তাদের এই নির্বুদ্ধিতামূলক কথাবর্তা ও কাজকে আমল দেওয়া হবে না বরং তারা যে রামের বানর হয়ে বানর সুলভ কাজ করেছে তা তুলে ধরা হবে। তারা লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হবে কিন্তু কোন ফল হবে না। তারাও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে কারণ তাদের সমর্থন ব্যতীত কেউ রাম হতে পারতো না। তাই বানররা কোন দিক থেকেই রেহাই পাবে না। যেভাবে ইচ্ছা উপায় কর, খাও দাও ফূর্তি কর (Eat dirnk and be merry) এই ছিল গোপালদের নীতি। তারা চুরি করে ক্ষীর সর ননী খেত বৈধ-অবৈধের কোন ধার ধারতোনা। তাদের নীতি ছিল যো আতা হ্যায় আনে দো। অন্যদিকে তারা কতক হালাল বস্তুকেও হারাম করে দিয়ে জনজীবনে সংকট সৃষ্টি করেছিল। পূর্বের কারবারটা ছিল ইহুদীবাদী শাইলকদের আর পরের কারবারটা ছিল তাদের মধ্যেকার বৈরাগ্যবাদীদের। দুনিয়াপূজক ও তথাকথিত পরহেজগাররা মানবজীবনে প্রান্তিকতা এনেছিল। এ সবই ছিল ভারসাম্যহীনতার পরিণতি। এই সবই ছিল নির্বুদ্ধিতার নীতি। উম্মতে মোহাম্মদীকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানানো হয়েছিল। সুতরাং এই প্রান্তিকতাধর্মী নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। একুশ পরিচ্ছেদে নব নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে পবিত্র দ্রব্যাদি যা হালাল উপায়ে অর্জিত তা খাও। শয়তান অপবিত্র দ্রব্যাদি খাত্তয়াকে বৈধ করে দিয়েছিল, বৈধ করে দিয়েছিল অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদকে। ফলে মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সে পাপাচার ও অশ্লীল কাজকেও বৈধ বানিয়ে দিয়েছিল। লিঙ্গপূজা, উলঙ্গপনাকেও সে আধ্যাত্মিক মর্যাদা দান করেছিল যদিও এসবের পিছনে কোন ঐশী অনুমোদন ছিল না। ১৬৮-১৬৯ আয়াতেই এই মৌলনীতির বিরুদ্ধে ঐতিহ্য ও পরম্পরার গোলামরা আপত্তি তুলেছিল। ১৭০ আয়াতে তাদের আপত্তি ও তার খণ্ডন করা হয়েছে। ১৭১ আয়াতে নির্বোধতন্ত্রের উপাসকদের জন্তু জানোয়ারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এরা একাবারেই গরুর পাল। রাখাল বা রক্ষাকর্তা এদের বাঁচাবার জন্য যতই চেষ্টা করুক, যে নির্দেশই দিক তা তারা বুঝতে পারে না। এরা কালা-বোবা অন্ধ। এরা কোন কিছু পর্যালোচনা করতে পারে না। গঠনমূলক সমালোচনা করতে জানে না। অন্ধভাবে শুধু তকলীদ করে চলে। অন্ধ অনুসৃতি ব্যতীত তারা

কোন কিছু বুঝে না। ১৭২ আয়াতে মুসলমানদের এই সংস্কারন্ধদের পথ পরিহার করতে বলা হয়েছে। পবিত্র দ্রব্যাদি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু অপবিত্র কি তা বলা হয়নি। ১৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে অপবিত্র হচ্ছে মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে বধ্যপ্রাণী। কঠিন ঠেকা অবস্থায় খোদাদ্রোহিতার মনোভাব না থাকলে হারাম বস্তু ভক্ষণের সাময়িক অনুমতি নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। ১৭৪ আয়াতে কেতাবে প্রদত্ত বিধিনিষেধ পালন করার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বৈষয়িক স্বার্থে এই আদেশ-নিষেধ বর্জন করলে ও হারাম জিনিস খেলে আগুন খাওয়ার মতো কঠিন কাজ করা হবে অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে পেট জ্বলবে। এটা আল্লার এতটা ক্রোধের কারণ হবে যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্রতার সার্টিফিকেট দেবেন না। কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি তার ভাগ্যলিপি হবে। ১৭৫ আয়াতে এই সীমালঙ্ঘনকে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৭৬ আয়াতে এত কঠোরতার কারণ আল্লাহপাক কেতাবে অত্যন্ত সিদ্ধান্তকর কথা বলেছেন। এব্যাপারে তাই মতবৈষম্যের কোন অবকাশ নেই।

কেবলা বা দিক পরিবর্তন কোন পুণ্যের ব্যাপার নয়। প্রকৃত পুণ্য হলো আল্লার আদেশ পালন, পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া, ফেরেশতাদের সম্মান দেওয়া, ঐশী কেতাব ও নবীদের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ। এজন্য অর্জিত বৈধ সম্পদ আত্মীয় স্বজন, এতিম-মিসকীন, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য ব্যয়। এছাড়া নামাজ ও জাকাত তো আছেই। খোদা ও বান্দার সাথে ওয়াদাও অবশ্য পালনীয়। যেহেতু পরীক্ষামূলকভাবে অভাব অনটন ও দারিদ্র্য সত্যের সৈনিকদের সাথী তাই এসব ব্যাপারে ধৈর্য-সবর প্রয়োজন। বিপদ আপদেও ধৈর্য ধারণ জরুরী। বাতিলের মোকাবেলায় যে দ্বন্দ্ব সংঘাত তাও ধৈর্য-সবর ও অধ্যবসায় দাবী করে। এসব দাবী যারা পূরণ করে তারাই সত্যের সেবক ও মুত্তাকী। পবিত্র কোরানের প্রথমেই বলা হয়েছিল কোরান মুত্তাকীদের পথ দেখায়। এই হচ্ছে সেই জ্ঞানের রাজপথ যা দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবায় কেবলা পরিবর্তন বড় কথা নয়, বড় কথা সত্যের বোধ, সত্যের জন্য কোরবানী ও সংগ্রাম এবং সেজন্য কষ্ট স্বীকার। ২২ রুকুতে এই মৌলতত্ত্ব ব্যক্ত করার পর ১৭৮ আয়াতে নরহত্যার ব্যাপারে কেসাসের আইন প্রদান করা হয়। ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধিও অবশ্য পাল্য।

চল্লিশ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে দুনিয়ার যে কল্যাণ হয় কেসাসের আইন কার্যকরী করলে সেই কল্যাণ হয়। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ইসলামের মৌলনীতি। এও

একটি মৌল সিদ্ধান্ত। তবে ইসলামে রক্তের বিনিয়ম মূল্যের বিধান আছে যা আধুনিক আইনে নেই। ১৮০-১৮২ আয়াতে অসিয়ত সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের ইহলৌকিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা না করে তাকে সুষ্ঠতা দান করেছে।

২৩ রুকুতে রোজার বিধান দেওয়া হয়েছে। এখানে ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইহকালের উপর পরকালকে প্রধান্য দিলে তবেই কেতাবওয়ালা হওয়া যায়। রমযান হচ্ছে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার মাস। তাই এই মাসে সকল ঐশীগ্রন্থ নাজিল করা হয়েছে। প্রথম রমযানে ইব্রাহিমী কেতাব, ৬ই রমযানে তওরাত, ১৪ই রমযান যব্বুর, ১৮ই রমযান ইঞ্জিল, লাইলাতুল ক্বদরে (২১-২৯শে রমযান) পবিত্র কোরান নাজিল হয়। পূর্ববর্তী উম্মত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ইহুদী যাদব, খৃষ্টানরা কেতাব হারায় ইহসর্বস্বতা ও পরকাল সর্বস্বতার কারণে। তারা দিকভ্রষ্ট হয়। তাই তারা আওয়াল কেবলা হারিয়ে ফেলে এবং শেষপর্যন্ত মাঝের কেবলা হারায় ইহুদীরা, খৃষ্টানরা সঠিকনীতি অনুসরণ না করায় ইহুদীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বায়তুল মুকাদ্দাস হারায়। মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবরি মসজিদ, চারারে শরিফ হারিয়েছে কেবলাবিমুখ হয়ে একদল ভোগবাদী ও অন্যদল বৈরাগ্যবাদী হওয়ার জন্য। দাজ্জালের যুগে কাবাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যেত যদি না আল্লাহ পাক ফেরেস্তা দিয়ে একে রক্ষার গ্যারান্টি দিতেন। কাবার ন্যায় কোরানও অক্ষুণ্ণ থাকবে তবে মুসলমান জাতি না কাবামুখী হবে না কোরানমুখী হবে ইহসর্বস্বতা ও পরকাল সর্বস্বতার কারণে তবে তাদের মধ্যে কতিপয় লোক থাকবে যারা কাবা ও কোরানের কথা ভুলবেনা এবং তা থেকে কিছুতেই বিছিন্ন হবে না ইসলামী মোজাহেদ হওয়ার জন্য। মহানবী ইবরাহিমী কেতাব ও কেবলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন। এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের যোগদান করা জরুরী ছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করার কারণে তারা এ সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। রজব মাসে মিরাজ ও শাবান মাসে কেবলা পরিবর্তনের পর রমযানের রোযা ফরজ হয় জেহাদের বাতাবরণ তৈরীর জন্য। দুনিয়াপরস্ত জাতি জয়ী হতে পারে না। মহানবীর জাতি ছিল ব্রাহ্মণ্যজাতির লোক। মূর্খতার কারণে পশুপূজক ও পাশবিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন। মহরমে হিজরতের পর মদিনায় যখন নবী দারুল আমান মদিনায় প্রবেশ করলেন তখন কাবার পর দারুসসালাম বায়তুল মুকাদ্দাস তাঁর প্রিয় ছিল কারণ কাবা থেকে তাঁকে এখানে আনা হয়েছিল কিন্তু ইব্রাহীমী (আঃ) কাবার প্রতি তাঁর মন টানছিল। মদিনার মসজিদে নববী ছিল তাঁর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের মতো। একদিন ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্বোধরা তাঁকে উপেক্ষা করেছিল তাই কাবা থেকে

তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে আনা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাকে কাবার হত্যার চেষ্টা করলে আল্লাহপাক তাকে দারুল আমান মদিনায় আনেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসপন্থীদের প্রতি বুকভরা আশা নিয়ে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্বোধদের মতই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো তখন তিনিও আল্লাহ আদেশে তাদের প্রতি আস্থা হারালেন এবং কাবাকে কেবলা বানাতে চাইলেন তখন আল্লাহ পাক তাকে মদিনায় মসজিদে নববী থেকে কাবা উদ্ধারের ইংগিত দিয়ে কেবলা পাল্টে দিলেন। কাবা উদ্ধারের জন্য কেবল নামাজ যথেষ্ট নয়, রোজা প্রয়োজন, জান ও মালের কষ্ট প্রয়োজন। জেহাদে এ দুটো জিনিস চাই। সংগ্রামের আদেশ নিয়ে তওরাত ও যব্বুর এসেছিল। মদিনায় জেহাদের আদেশ নিয়ে সেই রমযানেই কোরান এল। আগের কোরান ছিল দাওয়াতের কোরান। এখন এল জেহাদের কোরান। এই উভয় দিকে ইংগিত করে বলা হলো এখন শুধু দাওয়াতে হবে না দাওয়াতের সাথে জেহাদও যুক্ত করা হলো যা হযরত দাউদের কাল থেকে পরিত্যক্ত রয়েছে। তাই ১৮৬ নং আয়াতে বলা হলো রমজান মাস যাতে কোরান নাজিল হয়েছে। এ ব্রাহ্মণ, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সহ গোটা মানবজাতির জন্য হুদা বা সুপথের দিশা দেয়। এ বাইয়েনাত মিনাল হুদা অর্থাৎ পূর্ববর্তী যে হুদা এসেছিল যাকে বাস্তবায়িত করা হয়নি তারও স্পষ্টীকরণ করেছে এবং এ এখন ফোরকান বা কষ্টিপাথর তুল্য কাজেই রমযানে রোজা রেখে যুদ্ধে যাও। যুদ্ধের জন্য সফর প্রয়োজন। সফরের জন্য ও যুদ্ধের জন্য রোজা ভাঙলে পরে পূরণ কর। অসুস্থ হলেও ছাড় নেই কারণ ত্যাগ জরুরী। যদি সফর ও জেহাদে রোজা ভাঙার বিধান না থাকতো তাহলে তা কঠিন হতো। তাই কনসেসান দেওয়া হল। ১৮৭ নং আয়াতেও কনসেসান রাত্রে স্ত্রীসহবাসের ছাড়পত্র কিন্তু এতেকাফে এটা পূর্ণভাবে বর্জন করে দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা হল। কিন্তু পরস্পরের ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে হরণ করার কোন অবকাশ দেওয়া হলো না। ১৮৮ নং আয়াতে রোজাদারদের সমাজ কেমন হবে তা বলা হয়েছে। এ ট্রেনিং না হলে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করলে কারও ঝি-বউ ও মাল আস্ত থাকবেনা।

খোদপ্রাপ্তির পথ বা জ্ঞানবানদের পথ

তাই এই পর্যায়ে সুক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। ১৮৬ আয়াতে আল্লার নৈকট্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আল্লাকে পাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ ভ্রমণের দরকার নেই, শুদ্ধচিত্ত গৃহী হলেই হবে। ১৮৭ আয়াতে রোজার নিয়ম কানুন। ১৮৮ আয়াতে অবৈধ সম্পদ থেকে আত্মরক্ষার কথা বলা হয়েছে। যারা রোজা রেখে নিজের বৈধ সম্পদ ভোগ থেকে বিরত থাকে তারা যদি পরের অবৈধ সম্পদ অসদুপায়ে ভোগ করে তো সবই অর্থহীন। পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকাই ধর্ম। ইহুদীরা অবৈধ শোষণের কারবার চালাতো। মুসলমানরা যেন তা না করে কারণ তাদের বৈধ সম্পদ সমাজের দুর্বলদের দান করতে বলা হয়েছে। প্রকৃত পুণ্য কি তা ২২শ রুকুর প্রথমেই বলা হয়েছে। এ পথের পথিক হওয়ার জন্যই রোজার প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং।

২৪ রুকুতে হজের কথা বলা হয়েছে। নামাজ রোজার মতো এরও লক্ষ্য তাকওয়া অর্জন, এ আনুষ্ঠানিকতা নয়। মুত্তাকী লোকেরাই মোজাহেদ হওয়ার উপযুক্ত। তাই ১৯০-১৯৫ পর্যন্ত জেহাদ সংক্রান্ত বিধান দান করা হয়েছে, তথাকথিত ধার্মিক লোকেরা বৈরাগ্যবাদী হয়, সংগ্রামী হতে চায় না। তাই বাতিলের হামলার প্রতিরোধকে আবশ্যিক করা হয়েছে। বাতিল তাই ইসলামের এ বিধানের প্রতি রুষ্ট হয়েছে। বনিইসরাইলরা যখন গোপাল হয়ে গেল তখন তারা মুক্তিসংগ্রাম পরিত্যাগ করেছিল। ফলে তারা ফেরাউন, আসুরীয়, গ্রীক, রোমান, জালুত প্রভৃতির গোলাম হয়ে লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। ফসে তারা নিরীহ গোবেচারা গোলাম, অপরের করুণার পাত্র হয়েছিল। তাই মুসলমানদের মক্কার ব্রাহ্মণ্যলবীর বিরুদ্ধে Assertive হতে ও সংগ্রামের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে আহ্বান জানান হয়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের গোলাম হওয়ার প্রধান কারণ বৈদান্তিক বা বেদাতী তাসাউফ বা বৈরাগ্যবাদ। আজও ইসলাম দুশমনরা সুফী সাহেবদের খুব প্রশংসা করে আর মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামকে আখ্যা দেয় সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীপনা ইত্যাদি। ইহুদীরা জেহাদ ও মুক্তিসংগ্রামে অর্থব্যয়ে বিমুখ ছিল। সত্যাদ্রোহীদের মোকাবেলায় এই গাধার নীতির সংশোধন করা হয়েছে। প্রকৃত পূণ্য হক বাতিলের সংগ্রামে আর্থিক কাঠিণ্য

ছাড়াও সংগ্রামী দৃঢ়তা, একথা '২২' রুকুর শুরুতেই বলা হয়েছে। এখানে সেই নীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বৈরাগ্যবাদ জালেমকে প্রতিহত করতে উৎসাহিত করেনা বরং বৈরাগ্যবাদী জালেমের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়। ইসলাম জামাতবদ্ধ জীবন ও জালেমের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে উৎসাহ দেয়। নির্যাতিত জনগোষ্টির লড়াইয়ের অধিকার স্বীকার করলেও ইসলাম বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না কেননা এতে জন সমর্থন নষ্ট হয় এবং যুদ্ধ ন্যায়ের জন্য না হয়ে অন্যায়ের জন্য হয়ে দাঁড়ায়। অন্যায় যুদ্ধকারীরা সীমালঙ্ঘনকারী তাই তাদের হত্যা অন্যায় নয়। মক্কার ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে জুলুম নিপীড়ন চালায়। দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন কিন্তু মদিনায় দারুল আমানে সকল ধর্মের সম অধিকার ছিল। এই গণতান্ত্রিক সর্বধর্ম সমঅধিকারযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মেনে নিতে মক্কার ফ্যাসিষ্টরা রাজী ছিল না। তারা মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ নিলে মদিনার যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়। আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্টরা যখন অন্যায়ভাবে কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে তাদের স্বদেশ থেকে উৎখাত করেছে তখন তাদেরও এই সরকারকে স্বদেশ থেকে উৎখাত করে সসম্মানে দেশে ফেরার অধিকার আছে। মক্কায় তখন বাদবাকী মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার অব্যাহত ছিল। তাদের মুক্ত করাও ছিল মুক্তি সংগ্রামের দাবী। এই সংগ্রামে তারা যদি কাবাতেও অস্ত্রসম্বরণ না করে তাহলে কাবাতেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অবৈধ হবে না। যারা ভাল.মানুষের উপর শুধু ধর্মগত মতপার্থক্যের কারণে জুলুম অত্যাচার ও খুন-জখম চালায় তখন তাদের দয়া করার প্রশ্ন নেই কারণ ফ্যাসিষ্ট রাষ্টীয় সন্ত্রাস হত্যার থেকেও ভয়ানক। নরহত্যা যদিও ভাল কাজ নয় কিন্তু জালেমকে প্রতিরোধের জন্য গত্যন্তর না থাকলে যুদ্ধাবস্থায় নরহত্যা বৈধ। কেননা তারা ভিন্নধর্মের উপর দমনপীড়ন চালায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের দমনপীড়নের ক্ষমতা খতম করা যায় ততক্ষণ যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। ফ্যাসিষ্টদের রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎখাত করে তদস্থলে মুক্তিসংগ্রামীদের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু ক্ষমতাহীন হওয়ার পর তারা যখন সম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী সংগ্রাম পরিত্যাগ করবে তখন তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করা যাবে না। কাবায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ কিন্তু তারা যদি সেখানে যুদ্ধ করে তবে মুক্তি সংগ্রামীদেরও সেখানে যুদ্ধ না করে উপায় নেই। আরবে হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফ্যাসিষ্টরা তো কোন নিয়মকানুনের ধার ধারেনা। তাই বলা হলো তারা যদি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম না মেনে যুদ্ধ শুরু করে তাহলে মুক্তিসংগ্রামীদের হাত-পা গুটিয়ে

বসে থাকার প্রয়োজন নেই। সব সময় সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং ধৈর্য-সবরের সঙ্গে কাজ নিতে হবে, নীতিনিষ্ঠ থাকতে হবে,জিঘাংসার দ্বারা প্ররোচিত হলে চলবে না। সংগ্রামকে অহিংস গণসংগ্রামে পরিণত করতে হবে যাতে বিপ্লব রক্তপাতহীন বিপ্লবে পরিণত হয়। যতদূর সম্ভব কম রক্তপাত হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। মুক্তিসংগ্রাম যেন লুটপাট, মারদাঙ্গায় পরিণত না হয়। শান্তিপ্রিয় নাগরিক, শিশু, বৃদ্ধ, যারা যুদ্ধবাজ নয় তারা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যুদ্ধ যখন নৈতিকতা মণ্ডিত হবে কেবল তখনই আল্লাহর সাহায্যের আশা করা যেতে পারে।

১৯০-৯৪ নং আয়াত পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের নীতি বর্ণনার পর বলা হয়েছে মুক্তিসংগ্রামের জন্য ফাণ্ড চাই। যুদ্ধ যদি আল্লাহর জন্য হয়, ন্যায় যুদ্ধ হয় তাহলে মুক্ত হস্তে এই ফাণ্ডে দান করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বখিলি করা আর নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করা একই ব্যাপার। এ ব্যাপারে মুক্তহস্তে দান করার কথা বলা হয়েছে।

হজ ইসলামের আন্তর্জাতিক এবাদত। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিভাবে হজ আদায় করা হবে তার বিবরণ দান করা হয়েছে ১৯৬ আয়াতে। হজের মৌল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে ২৫ রুকুতে। কিছুলোক আছে হজের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থলাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হজকেও আভিজাত্যের নিদর্শন ও বাপ-দাদার প্রথায় পরিণত করেছিল বর্ণবাদী জাহেলরা। আগামীতেও মুনাফেকরাও হজকে পার্থিব স্বার্থের কাজে লাগাবে সে ইঙ্গিত আছে ২০৪-২০৬ আয়াতে। উমাইয়া যুগ থেকে ফাহাদের যুগ পর্যন্ত অনেকবার আমরা এর বাস্তব সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করেছি। হাজ্জাজের সময়, ১৯৭৯ সালে, ১৯৮৮ সালে কাবার ঘটনা ও হাজীদের হত্যায় আরব জাহেলিয়াতের প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যাহোক ২১৬ আয়াত, ২১৮ আয়াত আবার জেহাদের আলোচনার দিকে ফিরে গেছে। ২১৬ আয়াতে বলা হয়েছে জেহাদ মানুষের কাম্য না হলেও কল্যাণকর। তাই একে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। শুধু কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপার নয়। নেতৃত্ব এমনি এসে যাবে না। নেতৃত্ব শুধু দিক পরিবর্তনের ব্যাপার নয়। নেতৃত্ব সাধনা ও সংগ্রামের ব্যাপার। কাবাকে কেবলা করার উদ্দেশ্য একে পৌত্তলিকদের হাত থেকে উদ্ধার করার ইঙ্গিত। পৌত্তলিকরা কাবায় মুসলমানদের অধিকার স্বীকার করেনা বরং তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করেছে। যে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করার জন্য এখন সে কেন্দ্র থেকেই মানুষকে খোদার পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এমন কি খোদাকেও কাবাতে পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের শত্রু। এই ফ্যাসীবাদীরা নিজেদের স্বৈরাচার ছাড়া কোনকিছু স্বীকার করেনা, এমনকি তারা পলাতক সত্যাশ্রয়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করা ও তাদের উদ্বাস্তু-শিবিরে আক্রমণ হানতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তারা মানুষকে কোনপ্রকার ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার দিতে রাজী হয়না। বরং তাদের বিশ্বাসের পরিবর্তনই তাদের কাম্য। শুধু সেকালেই নয়, একালেও জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের চোখের সামনে এ তামাসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় গোপালদের তসবী জপা ধর্ম হতে পারেনা বরং প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে স্বৈরাচারীদের অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়ে দেওয়া। ২৭ রুকুতে তাই মানবতার মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের সংগ্রামীরাই খোদার রহমত পাওয়ার হকদার। ২১৭-২১৮ আয়াতে মানবতার মৌলিকতত্ত্ব বর্ণনা করার পর ২১৯-২২০ আয়াতে মদ ও জুয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে কেননা আবহমান কাল থেকেই যুদ্ধের সাথে মদ যুক্ত থেকেছে। তাই জেহাদের হুকুম দেওয়ার সাথে মদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাতিলের মোকাবেলা করার জন্য সত্যের সংগ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা সত্যাশ্রয়ীদের জন্য ফরজ। যুদ্ধের ফলে ইহকালে গোলামীর অবসান ও পরকালে অমরধাম লাভকরা সহজ হয়ে যায়। যুদ্ধে কিছুলোকের শহীদ হওয়া ও শহীদানদের সন্তানাদির অনাথ-এতিম হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এ সম্পর্কে বিধান দান করা হয়েছে।

২২১ আয়াতে মুশরেক পৌত্তলিকদের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়েছে কারণ প্রতাপশালী চিরন্তন শত্রুদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থ তাদের বশ্যতা স্বীকার করা। এমতাবস্থায় যুদ্ধ অপ্রাসংগিক। অন্যায়কারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। হযরত আবু হোরায়রার জামাই খলিফা আব্দুল মালিকের ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। এ থেকে বোঝা যায় তখনকার মুসলমানগণ কতটা বিপ্লবাত্মক মানসিকতার অধিকারী ছিল।

২৮-২৯ রুকুতে দাম্পত্যজীবন, তালাক ও বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে। ৩১ রুকুতেও এ প্রসঙ্গের জের আছে। সাংসারিক জীবনে মানুষ আল্লার স্মরণে গাফেল হয়। সেজন্য ২৩৮ আয়াতে ফরজ নামাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ২৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে নামাজ কাজা না হয়।

৩২ রুকুতে আবার মুক্তিযুদ্ধের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। ইহুদীরা মুক্তিসংগ্রামে রাজী হয়নি। ফলে তাদের একটা প্রজন্মই শেষ হয়ে গেল। তাদের জাতীয় উত্থান বিলম্বিত হলো। তারা হযরত মুসার নেতৃত্বে জেহাদের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার

করেছিল। ২৪৪ আয়াতে মুসলমানদের এই ভুল করতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৪৫ আয়াতে মুক্তি সংগ্রামে দান করতে তাকিদ করা হয়েছে। ২৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে হযরত মুশার পর তারা লড়াই করতে উদগ্রীব হয়েছিল কিন্তু যখন আদেশ দেওয়া হলো তখন অল্পলোক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ট প্রদর্শন করলো। জালুত, তালুত ও দায়ুদের (আঃ) প্রসঙ্গে ২৪৭ আয়াত থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তালুতকে নেতা হিসাবে মেনে নিতে ইহুদীদের নির্বুদ্ধিতামূলক আপত্তি, খোদার মর্জী পালনে তাদের অনীহার বিবরণ রয়েছে।

কোন জাতি যখন জানমালের জন্য সংগ্রাম বিমুখ হয় তখন সেই সংগ্রামবিমুখ জাতি জান ও মাল উভয়ই হারায় কিন্তু তৎসত্ত্বেও জেনারেশনের পর জেনারেশনকে উত্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। জানমাল দিয়ে এই সংগ্রামের মাধ্যমে এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত কিন্তু **ইহুদী**রা তা করেনি। হযরত মুসার পর ইউশা বিন নুনের নেতৃত্বে তারা একবার সংগ্রাম করেছিল এবং ২৫ বছর যাবৎ তারা রাষ্ট্রনায়ক ছিল কিন্তু অতঃপর ৩২০ বছর যাবৎ তারা নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয় সহবস্থানে তাদের আগ্রহ এমনকি তারা পৌত্তলিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করে। খোদার আদেশ নিষেধকে তারা অগ্রাহ্য করে। এভাবে তারা গাধায় পরিণত হয়। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে ঐতিহ্যবাদী নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়ে যেতো। স্যামুয়েল নবী বাদশাহী থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের অন্তবর্তীকালীন নেতৃত্ব দেন। স্যামুয়েল নবী ইসলামী গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন কিন্তু জনতা সে দায়িত্ব পালনে রাজী ছিল না। তারা চাইতো একজন বাদশা যিনি তাদের কাজ করে দেবেন যেমন আজকের মুসলমানরা চায়। আল্লাহপাক তাদের দাবী অনুযায়ী তালুতকে বাদশা নিযুক্ত করেন। তিনি গরীব ছিলেন। তাই তাঁদের ধনীদের পছন্দ হয়নি। আসলে তারা নিজেরা কর্তৃত্ব পেতে চেয়েছিল, নবীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। হারানো গাধার খোঁজে এসে তালুত যখন স্যামুয়েল নবী কর্তৃক বাদশা বনে গেলেন তখন তারা নানা আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। এ সব প্রমাণ করে সংগ্রাম নয়, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ইতিপূর্বে তারা যখন তাদের শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিল তখন তারা ঈমান ও আমলের উপর নির্ভর না করে তাদের বরকত পূর্ণ সিন্দুক যাতে হযরত মুসার কাছে অবতীর্ণ কেতাব ছিল, ছিল মুসা ও হারুণের স্মৃতি চিহ্ন,

ছিল তাদের খোদার সাথে অঙ্গীকারপত্র তা তারা শত্রুবাহিনীর সামনে পেশ করেছিল যুদ্ধজয়ের আশায়। ফলে তা শত্রুর হস্তগত হলো। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্মোদ্যোগ নয়, তন্ত্রমন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের হাস্যস্পদ করে তুলেছিল অথচ তারা নিজেদের মনে করেছিল খুবই খোদাপ্রেমিক। বুদ্ধিমত্তা নয়, নির্বুদ্ধিতাই ছিল তাদের সম্বল। তারা একান্তভাবে মৌলবাদী, ভাববাদী হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের নামে তারা বাস্তববাদী না হয়ে অবাস্তব কল্পনা বিলাসী হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম একটা বিজ্ঞান ছিল কিন্তু তারা ধর্ম-বিজ্ঞানী ছিল না বরং ধর্ম-বিজ্ঞান সিন্দুকে তোলা ছিল। তার কোন সূত্র তারা জীবনে প্রয়োগ করেনি। তারা ধর্মবিজ্ঞানী কর্মী হয়ে, মোজাহেদ হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়নি বরং ধর্মবিজ্ঞানটাকে সিন্দুকের ভিতরে রেখে পেশ করেছিল তার বরকতে শত্রুবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার আশায়। তারা কতটা গোপাল হয়েছিল বুঝুন। স্মরণীয় 'তলোয়ার রেখে খাপে এরা ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে রণজয়ী হবে দন্তবিহীন বৈদান্তিকী চালে অথবা 'ওরা কাফু রের মত যাইবে উড়িয়া অভিশাপ যদি হানেন পীর' ফলে তারা তাদের একটা মূল্যবান জাতীয় সম্পদ হারাতে বাধ্য হলো। সাত মাস যাবৎ এটা শত্রুদের হাতে ছিল। তারা তাদের অযোগ্যতার শাস্তি পেল। মহান আল্লাহ অলৌকিক উপায়ে তার কেতাব ও নবীর মীরাসকে রক্ষা করলেন। কাফেররা দেখলো এই সিন্দুকের কারণে ইহুদীরা হেনস্থা হচ্ছে। কাজেই এটা অশুভকর তাই তারা এটা ফেলে রেখে ছিল। বিশ বছর যাবৎ এটা অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে রইলো। তালুতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এটা উদ্ধারের ফয়সালা করলেন। ২৪৮ আয়াতে নবীর মাধ্যমে এই ফয়সালার কথা জানানো হলো যাতে গাধাওয়ালা কর্মী তালুতকে গোপালরা বাদশা হিসাবে মেনে নেয়।

৩৩ রুকুতে এই ভেড়ার পালদের ছাটাই-বাছাই করার জন্য লংমার্চ করানো, পানি পান থেকে বিরত রেখে যোগ্যতা প্রমাণের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এ পরীক্ষায় মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সবাই ফেল করলো। খোদা নির্ভর কর্মী এই মুষ্টিমেয় বাহিনী যারা ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিল, তারা বিজয়ী হলো। এই প্রসংগের উল্লেখ রয়েছে ২৪৯-২৫০ আয়াতে। শেষপর্যন্ত তালুতের অন্তবর্তীকালীন সময়ের অবসানে রাজত্ব দায়ুদ নবীর হাতে এল। ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপিত হলো। ফ্যাসিষ্টদের হাত থেকে দুর্বলদের রক্ষার জন্য খোদাবাদী দল কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে মহান আল্লাহ এই অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা করেন। ভারতে আল্লামা ইকবাল জিন্না যথাক্রমে স্যামুয়েল, তালুতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিভক্ত ভারতে খোদাবাদীদের ব্যর্থতা ও অব্রাহ্মণ্যবাদীদের উত্থান এমনই এক অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা যার সুযোগে সত্যাশ্রয়ীরা

আপন যোগ্যতা নিয়ে ময়দানে হাজির হতে পারে। বর্তমানে অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করা না করা সংশ্লিষ্ট জাতির ইচ্ছাধীন। আল্লাহ মহানবীর মাধ্যমে এই ঐশী ইতিহাসের তথ্য মুসলমানদের জ্ঞাত করলেন যাতে তারা ধর্মবিজ্ঞান রপ্ত করে বাস্তববাদিতার পন্থা অবলম্বন করে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তাই কেতাব, নবী, নামাজ, রোজা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুষ্ঠতা, আর্থিক কোরবানী ও জেহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শত্রুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, সংগ্রামী দৃঢ়তা ইত্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধির বিষয়। অন্যথায় বাহ্যিক ধার্মিকতা একটা অর্থহীন ব্যাপার। ফ্যাসিষ্টদের কর্তৃত্বের আসন থেকে উৎখাত করার সংগ্রামী উদ্দেশ্য ছাড়া কেতাব, নবী নামাজ, রোজা, হজ-জাকাতের কাণাকড়ি মূল্য নেই। বৈরাগ্যবাদ নয়, ভাববাদ নয়, স্যামুয়েল তালুত-দায়ুদের ফর্মুলার অন্ততঃ কাজ হওয়া উচিত একথা থেকে তৃতীয় পারা তিলকার রসুল শুরু হয়েছে। রসূলরা জানমাল দিয়ে আল্লার পথে সংগ্রাম করেছেন। ২৫৩ আয়াতে বলা হলো আল্লাহ সব যুগেই নবী রসুল পাঠিয়ে তাদের অধীনে সংগ্রাম করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা কাজ না করে নেতৃত্বের জন্য পারস্পরিক লড়ায়ে কলহ-কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে অথচ হেদায়েত বর্তমান ছিল। লোকদিগকে জোর করে বিরোধ-বিসম্বাদ থেকে বিরত রাখা খোদার নীতি নয়। তারা হেদায়েত অনুযায়ী বিবেক প্রয়োগ করে কাজ করে কিনা তা দেখাই উদ্দেশ্য। নবীর পর উম্মত খেলাফত নিয়ে দুঃখজনক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কেউ হেদায়েতের পথে থেকেছে, কেউ সীমালংঘন করেছে।

৩৪ রুকুতে এই মৌলিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে যারা হেদায়েত পেতে চায়, হেদায়েতের পথে থাকতে চায় তারা যেন অকাতরে আল্লার রাস্তায় মাল দিয়ে দ্বীনের পথকে প্রশস্ত করে। ২৫৫ আয়াতে আয়াতুল কুরসীতে আল্লার সার্বভৌমত্ব, ২৫৬ আয়াতে এটার প্রয়োগতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলেও ফ্যাসিষ্ট নন। জবরদস্তী মানুষকে তাঁর গোলাম করা তাঁর নীতি নয়।

হেদায়েত দান করা হয়েছে। হেদায়েত অনুযায়ী চলা না চলার ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ বিবেক প্রয়োগ করে কাজ করুক এটা আল্লাহ চান। অন্যের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে যে খোদায়ী সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করবে সে হেদায়েতের প্রশস্ত আলোকে পথ পরিক্রমা করতে পারবে। আল্লার পৃষ্ঠপোষকতা

সে লাভ করবে। আর ভিন্ন পথের পথিকরা হেদায়েত বঞ্চিত হয়ে ফ্যাসিষ্ট হয়ে জাহান্নামে যাবে যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আঁধারের জীবেদের এছাড়া আর কি পরিণতি হতে পারে?

৩৫ রুকুতে বলা হয়েছে এ ধরনের আঁধারের জীব ছিল নমরুদ বা নারদ আর হেদায়েতের আলোর পথের পথিক ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বা মহাত্মা ব্রহ্মা। নারদ ছিল ঝগড়াটে চরিত্র। সে ছিল ফ্যাসিষ্ট। ফাসাদ সৃষ্টি করা ছিল তার মূল লক্ষ্য। সে ব্রহ্মার সাথে হুজ্জুতে নেমেছিল কারণ নারদ প্রাচীন সভ্যদেশ ইরাকের শক্তিশালী শাসক ছিল। প্রাচীন ইরাক জ্ঞানবিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানে তারা এত উন্নত ছিল যে তার ব্যবিলনে শূন্যোদান নির্মাণ করেছিল। রাজনৈতিক শক্তি ও বিজ্ঞানের বলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। তারা নিজেদের সর্বশক্তিমান ভাবতে শুরু করেছিল। সব রহস্যের ব্যাখ্যা তাদের করায়ত্ব বলে তারা মনে করতে শুরু করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হওয়ার ফলে তারা জীবনমৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিল কিন্তু এইসব বৈজ্ঞানিক থিওরী কালক্রমে মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবন মৃত্যুর রহস্য চিরদিনই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। বিজ্ঞানের উৎস সৌরবিজ্ঞান। এই সৌরবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞান চিরদিনই মানুষকে বিমোহিত করেছে এবং নির্বোধরা নক্ষত্র জগতকে আরাধ্য জ্ঞান করেছে। ইরাকী জাতির এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা মহাত্মা ব্রহ্মার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। তিনি এই দৃশ্য জগতের অন্তরালস্থিত পরম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন এবং প্রত্যাদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর জাতির অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ফলে এই নক্ষত্র পূজক সম্রাট বিচলিত হয়েছিল। ইব্রাহিম বা ব্রহ্মাকে তাই রাজদরবারের ডাক পড়েছিল। প্রশ্ন ওঠে ছিল ইব্রাহিমের আরাধ্য কে? তিনি কার অনুগ্রহধন্য? ইরাকীরা বিশ্বাস করতো বিশ্বসংসার চন্দ্র সূর্যের অনুগ্রহধন্য। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী গ্রহ-নক্ষত্রই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। এরা কুষ্ঠি লেখে জন্মের পর, জন্মের আগের বিবরণ তাদের জানা নেই, মরণও না তাদের বিজ্ঞান, না গণনার অধীন। তাই জীবন মৃত্যুর ব্যাপারটা কোন কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যার মৃত্যু নিশ্চিত দেখা যায় সে দিব্যি বেঁচে গেছে। আবার যার মরবার কোন সম্ভাবনা নেই দেখা গেল সে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। তাই এ প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে রাখে আল্লাহ মারে কে? মারে আল্লাহ রাখে কে? জীবন-মৃত্যুর রহস্য জ্ঞানে জ্ঞানী মহাত্মা ব্রহ্মা বলেছিলেন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে থাকলেও তা সীমিত, সীমিত বিজ্ঞানের ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ

অসীম শক্তির মালিক। জন্মের আগের ও পরের ব্যাপার বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। জীবন-মৃত্যুর উপর রাজনীতিকদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। মানুষকে জেলে পাঠানো ফাঁসী দেওয়া খুন করা এসবই ফ্যাসিষ্টদের হাতে থাকে। ফ্যাসিষ্ট নারদ এই হুমকী দিয়েছিল। মহাত্মা ব্রহ্মা বলেছিলেন তিনি তো দূরের কথা তাঁর আরাধ্য সূর্যদেব বা মহাদেবের ঝুঁটিও আল্লার হাতে। এ হলো হুমকীর জবাবে হুমকী। নারদ নিরুত্তর হয়ে গেল কিন্তু ঈমান আনতে পারল না তার অহং-এর জন্য। আরও অপমান তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিজ্ঞান যদি অসীম ক্ষমতার মালিক হয় তাহলে বিজ্ঞান বলে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষ পরিবর্তন সম্ভব হয় না কেন? যে ক্ষমতা গ্রহ-নক্ষত্রকে পরিচালিত রেখেছে তা আল্লার শক্তি। আরাধ্য কেবল তিনি। যুক্তিতে হেরে গেলেও সত্যের সামনে মাথা নত করবার সৌভাগ্য নারদের হলোনা কারণ সত্য অনুধাবন করবার জন্য সে ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। তাঁকে ডেকেছিল তার প্রতাপ দেখাতে কিন্তু এই প্রতাপের সামনে খোদা বিশ্বাসী ব্রহ্মা মাথা নত করেননি। এতে শেষ নবী তথা সকলের জন্য সবক রয়েছে। খোদা নির্ভর ব্যক্তি কোন শক্তির পরোয়া করেনা। সে একাই মাথা তুলে দাঁড়ায়। ২৫৯ আয়াতে আর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যাতে একটা মৃত জাতি কিভাবে শতাব্দীর পরে জেগে উঠেছিল সে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ব্যক্তি ও জাতির জীবন-মৃত্যু আল্লার হাতের মুঠোর মধ্যে।

২৬০ আয়াতে বলা হয়েছে জীবন-মৃত্যুর রহস্য যা বারহম বা রহমশীল খোদা ব্রহ্মাকে দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি ইবরাহীম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অর্থাৎ খোদার অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আল্লাহ সুপ্রীম ক্ষমতার মালিক ও সুপারবিজ্ঞানী। নারদ বাকচাতুরীতে পটু সীমিত ক্ষমতা ও স্বল্প বিজ্ঞান শক্তির মালিক। তাই তিনি প্রাণবাজী রেখে সত্যের জন্য দৈত্যের সাথে সংগ্রাম করেছিলেন। ইহুদীরা জ্ঞানী না হওয়ায় একাজ করেনি। হযরত দায়ুদ করেছিলেন। ফলও পেয়েছিলেন। কেতাবের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে জাতীয় জাগরণের জন্য সত্যের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিতে উদ্যমী হওয়া উচিত। কাঁটা দেখে কমল তুলতে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

পূর্বোক্ত ভূমিকার পর ৩৬ রুকূতে বলা হয়েছে আল্লার পথে সংগ্রামের জন্য অর্থ দিলে জাতীয় জাগরণের ফলে জাতির জীবনে বিজয় ও সমৃদ্ধি আসে, আসে আল্লার সন্তোষ যা পরকালের পাথেয়। আল্লার পথে প্রদত্ত সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি হয়। এই রুকূতে দানের সুষ্ঠ পন্থা প্রদান করা হয়েছে। সম্পদ চিরদিন থাকবেনা। তার সদ্ব্যবহারে দেরী করা উচিৎ নয়, উৎকৃষ্ট মাল মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে দেওয়া উচিত। ৩৭ রুকূর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই কিন্তু এ পথে বাধা হচ্ছে শয়তান। ২৬৮

আয়াতে বলা হয়েছে শয়তান দান করলে গরীব হবার ভয় দেখায় ও বখিলীর বা সঞ্চয়ের উপদেশ দেয়। ইহুদীরা তাই সূদী মহাজন হয়েছিল। সূদী বেণে মহাজনরাই সারা পৃথিবীতে অসচ্ছলতার কারণ। ইহুদীরা জানমালের গোলাম হওয়ার ফলে তাদের নেতৃবৃন্দ মুক্তি সংগ্রাম করতে পারেনি। ফলে তারা গোলাম হয়ে স্বদেশ থেকে উৎখাত হয়ে সারা পৃথিবীতে ভূমিহীন দাসে পরিণত হয়ে যাযাবার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা যেন এ ভুল না করে সেজন্য এ ব্যাপারে এতবেশী তাকীদ দেওয়া হয়েছে। কৃপণতার নীতি হচ্ছে গাইগরুর নীতি। বাছুরের জন্য দুধ চুরি করলে চাষী তাকে কসায়ের হাতেই তুলে দেয়। আল্লাহ তাই গোপালদের দুনিয়ার কশাইদের হাতে তুলে দিয়েছিল। ২৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানরা যাতে বুদ্ধিমান হয়। মুক্তি সংগ্রামে উদার হস্তে দান করে। ২৭০ আয়াতে বলা হয়েছে ইহুদীদের মতো তাদের যেন কশায়ের হাতে তুলে দিতে না হয়। শাইলকী মনোভাব অর্থগৃধ্নুতা, পার্থিবপরতার দরুণ ইহুদীরা ধ্বংস হয়েছিল। মুসলমানরা যেন তাদের মনমানসিকতা এই বিপদ থেকে মুক্ত রাখে। পার্থিবপরতা নয়, খোদাপরস্তীর নিদর্শন হিসাবে যেন খোদার রাস্তায় গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। ২৭১ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। দুনিয়া পরস্ত গোপালরা এতে আপত্তি জানাবে কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ নয়। ২৭২ আয়াতে বলা হয়েছে দান হতে হবে নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লার জন্য। মানুষকে গোলাম করার জন্য নয় বরং মুক্ত করার জন্য। আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্থা ত্রাণের নামে মানুষকে গোলাম বানাচ্ছে, মুসলমানরা যেন এমনটা না করে। টাকা, চাকরী, পোষ্ট-পজিশন দান করা হয় দলবাজির জন্য। এতে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই হয় অধিক। মানুষের হেদায়েত জ্ঞানগত ব্যাপার। মানুষ যদি হেদায়েত তালাস করে আর তার তালাস যদি যথার্থ হয় তাহলে হেদায়াত আল্লাহ করবেন। যে হেদায়েত চায়না তাকে হেদায়েত করা আল্লার নীতি নয়। মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা দানের উদ্দেশ্য নয় কেননা কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলপ্রয়োগ খোদার অনভিপ্রেত। মুসলমানদের জোর করে মুসলমান করাও খোদার নীতি নয়। অমুসলমানদের উপর জোর করার তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আল্লাহ পাক ইহুদীরা কুফরী নীতি অবলম্বন করলেও তাদের তা থেকে বিরত করেননি। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত। তিনি চান যে তাঁর সত্যিকার বান্দারাও উদারহস্ত হোক। এ হচ্ছে শিবগাতুল্লাহ বা আল্লাহর রং বা গুণ। মুক্তি সংগ্রামে লোক অর্থব্যয় করলেও মুক্তি সংগ্রামের পথে সংগ্রামীর কথা লোক ভুলে যায়। ২৭৩ আয়াতে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। লোক কাজ ভালবাসে কাজের লোকের কথা মনে

রাখেনা। এ ভুল যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে বলা হয়েছে।

৩৮ রুকূতে পূর্বোক্ত বক্তব্যের জের টেনে ২৭৫ আয়াতে ইহুদীদের শাইলকী নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এরা অর্থ পাগল ছাড়া কিছুই নয়। এরা উন্মাদ। এরা সুস্থ বিবেকবর্জিত পাষাণমনা লোক (দ্রষ্টব্য সর্বগ্রাসী অক্টোপাশ) ২৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে সূদের ফলে মন্দাবস্থা দেখা দিতে বাধ্য আর দান-খয়রাত আর্থিক স্বচ্ছলতার বার্তাবহ। ২৭৭ আয়াতে কল্যাণের উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে সত্যোপলব্ধি সত্যপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, আত্মসংশোধন মূলক নামাজ আত্মসংশোধনীমূলক দান বা যাকাত। এ সবই করতে হবে খোদার জন্য। পরকালীন বিপদ থেকে বাঁচার বা মোক্ষলাভের পথ এটাই। মোক্ষলাভের জন্য তপজপের প্রয়োজন নেই। সূদী সমাজব্যবস্থা থেকে সূদবিহীন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের নিয়মাবলী দান করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতগুলিতে। ২৮১ আয়াতে খোদাভীতিই যে Best Policy তা বলা হয়েছে। ৩৯ আয়াতে ঋণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি বর্ণনা করা হয়েছে যাতে পারস্পরিক বিরোধ এড়ানো যায়।

৪০ রুকূর শুরুতে মহান আল্লার সার্বভৌমত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৮৫ আয়াতে খোদানুগত বান্দার চিত্র অংকণ করা হয়েছে। ২৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য যে নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে তা তার ক্ষমতার বাইরে নয়। তাই একে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। যে এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইবে তার দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। তবে বোঝা বেশী ভারী মনে হলে আল্লার কাছে শক্তি ভিক্ষা করা যেতে পারে। আল্লাহ বান্দার প্রার্থনা অবশ্যই শুনবেন তবে এজন্য বিনয়-নম্রতা আবশ্যক যা ইহুদীদের ছিলনা। ইহুদীরা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে অধিকতর বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের উপর আরও অধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লার করুণা ভিক্ষাই বান্দার প্রকৃষ্ট নীতি। এটাই সত্যিকার বন্দেগী। দায়িত্ব পালন না করে করুণাভিক্ষা এবাদত নয় যা বৈরাগ্যবাদীরা করে থাকে। হ্যাঁ ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট পন্থা কিন্তু ভুলত্রুটি হবে বলে কাজই করবোনা এমন বান্দা ও বন্দেগীর কোন মূল্য নেই। আল্লামা ইকবাল বলেন—"শত সেজদার ঈর্ষার কারণ জাগ্রত চিত্তের অনুশোচনা হে নির্বোধ সুফী তুমি এসব বুঝবেনা, বুঝবে না। তিনি আরও বলেছেন" হে মানুষ দায়িত্বের বোঝা বহন করতে কোরনা অস্বীকার তাকেই মানতে হয় অপরের শাসন যে শাসন করতে পারেনা তারা নিজেকে"।

আত্মানুসন্ধান, আত্মানুশোচনা, নম্রতা, আত্মশাসন, আত্ম সংযম, আত্মবোধ, আত্মশক্তি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এ মহতী আলোচনার সমাপ্তি সাধন করা হয়েছে। আদি, মধ্য ও অন্তপর্বের মধ্যে অপূর্ব সংযোগ, মানব ইতিহাসের উত্থান-পতনের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও সদর্থক পথ-নির্দেশ, সংগ্রামের পথে প্রেরণা দান যেমন ভারসাম্যমূলক তেমনি বাস্তব। অবাস্তব দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, আকাশচুম্বী কল্পনাবিলাস, নীতি কথার শুষ্ক কচকচানি, জটিল দার্শনিক হেঁয়ালি কিংবা বস্তুবাদের তামাসিকতা থেকে মুক্ত এ জলদগম্ভীর ভাষণ মুক্তি পিয়াসী মানুষের জন্য এক বিরাট আলোকস্তম্ভ সূরা বাকারার 'তিলকা রসূল' বা রসূলদের পথ, খোদা প্রেরিত মহামানবদের পথ। এটাই মানবতার পথ। খোদাপ্রাপ্তির খোদাপ্রদত্ত পথ।

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

২য় সূরা
সুরাতুল বাক্কারাহ

রুকূ-৪০ মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত-২৮৬

মদনী সূরা। বর্তমানে ২নং সূরা, ছিল ৮৭ নং। এতে আছে ৪০টি পরিচ্ছদ। ২৮৬টি পবিত্র বাক্য, এই সূরার সূচনা হয়েছে আলিফ, লাম, মীম প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে। এ হচ্ছে গুঢ় অর্থ নির্দেশক শব্দ। যারা সূরা ফাতেহার মহানামমন্ত্রের উপলব্ধি করবেনা তারা সত্য ও সংহতি হারাবে; বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হয়ে লণ্ডভণ্ড হবে। পশুর অধম মোশরেক হবে। নেয়ামত প্রাপ্ত না হয়ে গজবগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হবে। রহমানুর রহীমের অনুগত না হয়ে তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে ও নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনবে। উত্থিত না হয়ে অধঃপতিত হবে। আল্লাহপাক জিব্রাইলের মাধ্যমে মোহাম্মকে (সঃ) যা দিয়েছেন তা না মানার ফল মারাত্মক হবে।

প্রথম রুকূ (পরিচ্ছদ)

পরম (দয়াময়) দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। ১. আলিফ লাম মীম ২) এ কেতাব সংশয়হীন ৩) মুত্তাকীদের (ভক্তদের) পথ প্রদর্শক ৪) যারা গায়েবে (শুন্যতত্বে) আস্থাবান এবং নামাজে যত্নবান এবং আমার প্রদত্ত রূজী করে দান যারা তোমার উপর অবতীর্ণ সবকিছুতে আস্থাবান, আস্থাবান তোমার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ বিষয়াদিতে আর আখেরাতে (পরকালে) দৃঢ় প্রত্যয়শীল ৫) তারাই তাদের রবের (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা) সুপথপ্রাপ্ত আর তারাই কল্যাণপ্রাপ্ত ৬) (কিন্তু) যারা (এসবে) আস্থাহীন তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা, না করা সমান। তারা হবে বেঈমান। ৭) আল্লাহ তাদের কলব (হৃদয়-মন) শ্রবণকে (কানকে) বন্ধ করে দিয়েছেন আর চোখকে ঢেকে দিয়েছেন গীতায় (পর্দায়) আর তাদের জন্য (সংরক্ষিত) রয়েছে কঠোরতম শাস্তি।

নোট ঃ

সদাচারী ঈশ্বরপ্রেমিক হওয়ার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত নির্ভেজাল সদগ্রন্থ প্রয়োজন। পবিত্র কোরানের পূর্বে বিভিন্ন বাণীবাহকের উপর যেসব ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় তার সবগুলিই কালক্রমে বিনষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায়। ফলে কোন চিন্তাশীল গবেষক সত্য-সন্ধানীর পক্ষে এ সবকে অকুণ্ঠচিত্তে ঐশীগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। সেই জন্য এই সন্দেহ-সংশয়হীন সুস্পষ্ট সত্য গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়েছিল। গ্রন্থহীন ও বিকৃত গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সুস্পষ্ট সত্যগন্থ না পেয়ে নাস্তিক কাফের আজীবক, চার্বাক হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য এ গ্রন্থ প্রেরিত হয়েছে এবং এ গ্রন্থের প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রেরিত পুরুষকেও পাঠান হয়েছে। এসবই করা হয়েছিল জিব্রাইল, গ্যাব্রাইল বা গরুড় নামক দেবতা মারফত। আলিফ, লাম, মীম মানে হলো আল্লাহ কর্তৃক জিব্রাইল মারফত মহম্মদ (সঃ) এর কাছে যে কেতাব প্রেরিত হয়েছে তা খোদা প্রদত্ত সুস্পষ্ট সত্য গ্রন্থ। এতে কোন হেঁয়ালী গোঁজামিল নেই। যারা সত্যগ্রন্থের অভাবে সংশয়বাদী হয়ে গিয়েছিল, পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বন করেছিল তাদের ফিরিয়ে আনা গ্রন্থ পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল। বিকৃতির কারণে বিকৃত কেতাবধারীরা একত্ববাদ ভুলে এককে বহুর অনলে আহুতি দিয়েছে। তাই সত্যগ্রন্থ ও সত্য সংস্কারক হযরত মুহম্মদ (সঃ)কে পাঠান হয়। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা বাইয়েনাহ বা সুস্পষ্ট সনদ নামক ঘোষণায় একথা বলা হয় এভাবে 'গ্রন্থধারী ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা কাফের (অমান্যকারী) সুস্পষ্ট সনদ ছাড়া তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় যদি না তাদের কাছে খোদা প্রেরিত পুরুষ পবিত্র গ্রন্থ আবৃত্তি করে শোনায়, এমন গ্রন্থ যাতে মিথ্যাকে ছাঁটাই করে সত্যকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ করা হয়নি) কেতাব আসার পর কেতাবধারীরা কেতাবে একত্ববাদের সাথে বহুত্ববাদ ঢুকিয়েছে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে দ্বীনকে (সদাচারকে) একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করে তা মেনে চল, নামাজ পড়, যাকাত দাও এটাই সঠিক আচরণ বা সদাচার। পৌত্তলিক ও গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা এটা অমান্য করবে তারা চিরকালের জন্য নরকবাসী হবে এবং তারা সৃষ্টির অধম, পশ্বাধাম। এরা গীতাধারী হবে। গীসা বা গীতা একই শব্দ। গীতা মানে পর্দা। দেখুন সূরা কাহাফের ১০১ আয়াত। গীতাধারীরা আল্লাহর পরিবর্তে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হয়। তারা কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ইতিহাসেও গোরক্ষনাথদের করুণ পরিণতির কথা জানা যায়।

মুত্তাকী বা সত্যপথের পথিক হওয়ার জন্য প্রয়োজন সংশয়হীন সত্যগ্রন্থ যাতে

থাকবে সদাচারী ও কদাচারীদের বিবরণ। সদাচারীকে বিশ্বাস করতে হবে শুন্যলোক থেকেই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেই নিয়তি-নির্ধারক অদৃষ্টের মালিকের কাছে প্রণত হতে হবে, তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পদ দান করতে হবে। শেষনবী ও তার পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ কেতাব মানতে হবে। পরকালের জন্য দুনিয়াকে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় রুকূ (পরিচ্ছদ)

৮) মানব সমাজের মধ্যে কিছু লোক দাবী করে যে তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আস্থাবান কিন্তু তারা বেঈমান ৯) আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের তারা ধোঁকা দিতে চায় কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে ধোঁকা দেয় না যদিও সে সম্পর্কে তাদের কোন চেতনা নেই ১০) তাদের হৃদয়ে রয়েছে রোগ আল্লাহ তাকে জিয়াদা (বৃদ্ধি) করেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি কারণ তারা মিথ্যা দাবী করে ১১) যখন তাদের বলা হয় আর যে (পৃথিবীতে) ফ্যাসাদ (ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ) করো না তখন তারা সংস্কার সংশোধনের ধূয়া তুলে ১২) সাবধান প্রকৃত ফ্যাসিস্ট এরাই কিন্তু এরও কোন চেতনা তাদের নেই। ১৩) আর যখন বলা হয় মানুষের মত ঈমান আন তখন তারা বলে আমরা কি বোকাদের মত ঈমান আনব? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই বোকার দল কিন্তু এরা তাও জানেনা ১৪) তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো (ঈমানদারদের) তামাসা করি ১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাসা করেন, খোদাদ্রোহীতার ব্যাপারে তাদের ঢিল দেন তারা অন্ধের ন্যায় চলে ১৬) হেদায়েতের (সত্যপথের) পরিবর্তে যারা পথভ্রষ্টতার খরিদ্দার হয় এরা সেই লোক। এদের এই ধর্মব্যবসা লাভজনক হয়না। এরা আদৌ সত্যপথের পথিক নয় ১৭) এদের দৃষ্টান্ত এরকম ঃ এক ব্যক্তি আলো জ্বালালো অতঃপর যখন চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি (অনুধাবনের ক্ষমতা) হরণ করে নিলেন এবং তাদের অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পেলনা ১৮) তারা শম্বুক (কালা, বোবা, অন্ধ) তারা আর ফিরবে না। ১৯) অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ, আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে, সাথে রয়েছে অন্ধকারময় মেঘমালা, বজ্রগর্জন ও বিদ্যুৎচমক, মৃত্যুভয়ে তারা কানে আঙ্গুল দেয় (বাঁচার জন্য) অথচ আল্লাহ তাদের চারধারে ঘিরে আছেন ২০) বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, আলোতে সামান্য চলে

আর অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে হরণ করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

নোট ঃ

যারা আন্তরিকাভাবে কোরান মানেনা তাদের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসের দাবী অর্থহীন। তারা ধার্মিক নয়,বেইমান। তারা জগতকে ধোঁকা দিতে চায়। তাদের কাছে খোদার সত্যগ্রন্থ, সদাচারের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাই নেই, তারা খোদাপ্রেমিক, সত্যপন্থী হবে কি করে? অনার্যদের কাছে কেতাব নেই। আর্যদের কাছে আছে বেদ-বাইবেল রামায়ণ-মহাভারত গীতা অর্থাৎ তওরাত ও যবুর কিন্তু সবই বিকৃত, অর্ধসত্য, সত্যমিথ্যার সংমিশ্রণ, সংকর। সংকরাচার্যগণ এটা করেছেন। গুপ্তযুগে আবার গীতা বা পর্দাবৃত করে সত্যকে লোপাট বা রহস্যাবৃত করা হয়েছে। তওরাত বা তালুমুদ পুরাণ (ওল্ড টেষ্টামেন্ট) ইঞ্জিল (নিউ টেষ্টামেন্ট) বাইবেল (সংকলন) কিন্তু কোনটাই প্রামাণিকতার দিক দিয়ে সংশয়হীন নয়। সবই মিথ্যা পুরাণ বা পুরানো উপাখ্যান বা আষাঢ়ে গল্পে পরিণত হয়েছে। তাই কোরানের আলোকে পুরাণকে গ্রহণ বর্জন না করলে সত্যপ্রাপ্তির দাবী অর্থহীন। অনার্যরা আনাচারী, আর্যরা সদাচারী-এ দাবী সত্য নয়। অনার্যরা গ্রন্থধারী নয়, আর্যরা বেদকে ঐশীগ্রন্থের দাবী করলেও এ কোন নবীর কেতাব নয় বরং পরবর্তীযুগের বাইবেলের মতো সংকলন যাতে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ এত বেশী যে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গোতম বুদ্ধ একে ঐশীগ্রন্থ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি একে লোকাচার হিসাবে দেখেছেন। লোকাচার আর সদাচার এক নয়। যে সদাচার বুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শংকরাচার্যরা তার সংকরায়ন ঘটিয়েছেন। দ্বৈত-অদ্বৈত তত্ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র কোরানের কঠোর একত্ববাদ গ্রহণ না করলে আল্লাহ ও আখেরাতকে মানার দাবী ধর্মের নামে আত্মপ্রতারণা অথচ ধর্মের বড় বড় দাবীদাররা এটা বুঝতে অক্ষম। তারা এতটা চেতানাহীন। তাদের হৃদয়ে রয়েছে সংস্কারান্ধতার ব্যাধি। কোরান আসার পরে জেদের বশে তাদের এ ব্যাধি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ধার্মিকতার এ মিথ্যাদাবীর ফলে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মূলতঃ তারা স্বৈরাচারী। তাদের স্বৈরাচার বর্জনের আহ্বান জানালে তারা সংস্কারের আওয়াজ তোলে। তারা সংস্কারের নামে সংকরায়ন চায়। এজন্যে তাদের প্রকৃত ফ্যাসিষ্ট বলা হয়েছে কারণ আল্লাহ পাক নবীকে তো সংকরায়ন দূর করে প্রকৃত খোদাপ্রেম ও পরকালপ্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যারা সংস্কার আন্দোলনে সাড়া দেয়না, বেদাহ পরিত্যাগ করে নবীরসূলদের সুন্নাহ গ্রহণ করেনা তাদের ধর্মাধর্মের

কোন চেতনাই নেই। বেদাতের কারণে তারা জ্বালালার বা পথভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে। পথভ্রষ্ট অমানুষদের মানবতাবাদী হওয়ার আহ্বান জানানোয় তারা মানবাতাবাদীদের নির্বোধ আখ্যা দেয় অথচ মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মানুষ না হওয়াটাই যে নির্বুদ্ধিতা তাও তারা বোঝেনা। তারা যখন খোদাবাদী সংস্কারপন্থী মানুষদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা ইসলামী মানবতার প্রশংসা করে কিন্তু যখন খোদাদ্রোহী মানুষ্যবেশী শয়তানদের (ইসলামবিরোধী নেতাদের) সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা সংস্কারপন্থীদের বোকা বানাবার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক তাদের বোকা বানান এই চালাকীর খেলা খেলবার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে। তারা অন্ধের ন্যায় চলে। সুপথের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতার পথে তীব্র গতিতে ধেয়ে চলে। ধর্মের নামে তারা ধর্মব্যবসা করে। এ আদৌ লাভজনক ব্যবসা নয় অর্থাৎ অলাভজনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা। সংস্কারের আলোর আন্দোলনে যাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে তাদের দৃষ্টিলাভ সম্ভব হয়না। তারা কালা-বোবা অন্ধ। তারা শম্বুক তারা সব সময়ে গজবে পরিবেষ্টিত থাকে কারণ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আল্লার হাতে। তিনিই তো সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান। তকদীরের মালিক তিনি। ভাগ্যবিধাতা তিনি। সত্যবিরোধীরা তাই ভাগ্যহত হবে। তারা নিজদেশে পরবাসী হবে, নয় উৎখাত হবে আর পরকালে নরকের বাসিন্দা হবে।

তৃতীয় রুকূ

২১. হে লোকসমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার দাসত্ব স্বীকার কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা যাতে তোমরা মুত্তাকী বা খোদাভীরু হতে পার (প্রকৃত ধার্মিক হতে পার)।

২২. সেই তিনিই (তোমাদের পালনের জন্য) পৃথিবীকে তোমাদের জন্য ফরাস (বাসপোযোগী শয্যা) এবং আসমানকে বেণায়া (ছাদ) বানিয়েছেন এবং আকাশ হতে বারিবর্ষণ করে তার সাহায্যে তোমাদের জন্য নানাপ্রকার ফল ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের রুজীর ব্যবস্থা করেছেন (অর্থাৎ সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং করেছেন) কাজেকাজেই আল্লার সমকক্ষরূপে কাউকে গ্রহণ করোনা (অর্থাৎ দেশমাতার বন্দনাগান করোনা, বন্দেমাতরম বলোনা। বঙ্গমাতা, ভারতমাতা, মা বসুমতী, গোমাতা প্রভৃতি গায়রুল্লার আমদানী করোনা) যেহেতু এসব তোমরা জান (অর্থাৎ এসব পালনকর্তার দান, অন্যের নয় এ তোমাদের সবার জানা)।

২৩. আমার বান্দার প্রতি যাকিছু অবতীর্ণ করেছি (তা আমার প্রেরিত কিনা) এ বিষয়ে তোমাদের যদি সন্দেহ হয় তবে এর অনুরূপ একটা সূরা রচনা করে আনো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সমর্থকবৃন্দকে জমায়েত কর।

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না পার, নিশ্চয় তা কখনই করতে পারবেনা তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা কাফের (সত্যদ্রোহী) লোকদের জন্য (সংরক্ষিত)।

২৫. ঈমানদার সংস্কারকামীদের জন্য সুসংবাদ, তাদের জন্য স্বর্গোদ্যান যার নিম্নদেশে প্রবাহিত থাকবে নহর (ঝরণা), দেওয়া হবে রেজেক হিসাবে ফল-ফলাদি যা পৃথিবীর ফলাদির অনুরূপই হবে। যখনই তাদের সেটা খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে ইতিপূর্বে তাদের এরূপ খাবারই দেওয়া হতো। তাদের জন্য থাকবে পবিত্র রমণীরত্ন এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী (বাসিন্দা) হবে।

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। অতঃপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় ঈমানদার লোকেরা। তারা জানতে পারে এ মহাসত্য তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত। কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীরা (মিথ্যাবাদীরা) শোরগোল তুলে এই বলে যে আল্লার এ ধরনের দৃষ্টান্তের কি মানে হয়? বহুলোককে এ দ্বারা বিভ্রান্ত ও বহুলোককে এ দ্বারা সুপথ প্রদর্শন করা হয়। বিভ্রান্ত করা হয় শুধু ফাসেকদের

২৭. যারা আল্লার সাথে কৃত পাকা চুক্তি ত্যাগ করে, আল্লাহ যাকে যুক্ত রাখার আদেশ করেছেন তাকে ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ (বিরোধ বিসম্বাদ রক্তপাত) সৃষ্টি করে। এরা ক্ষতিগ্রস্ত (গজবগ্রস্থ, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত, নরকগামী)

২৮. তোমরা মৃতপদার্থ হয়ে আল্লার (সর্বশক্তিমানের) বিরুদ্ধচারী হও কিভাবে অথচ তোমাদের প্রাণবন্ত করে তিনি আবার প্রাণ হরণ করবেন আবার প্রাণদান করবেন এবং তাঁর দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য যাবতীয় পার্থিব সম্পদ সৃষ্টি করে অতঃপর মহাশূন্যলোকে সপ্তস্তর সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

নোট ঃ

সৃষ্টির ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লার। মৌলিক সৃষ্টি অন্যের কর্ম নয়। আসমান-যমীন সৃষ্টি ও এতদুভয়ের মাধ্যমে রুজী রোজগার প্রদান তাঁর মৌলিক অবদান। আসমানকে 'বেণ' বলা হয়েছে। বেণ মানে ছাদ। আল্লাহ হচ্ছেন রাজা 'বেণ', ঢাল বা প্রটেকসান। কে এই বেণ রাজা তা নিয়ে আজপর্যন্ত যে বিতর্ক ভারতীয় পণ্ডিতগণ করে চলেছেন তার সূত্র রয়েছে এখানে। রাজা বেণ আসমানেরও রাজা যমীনেরও রাজা। রাজা বেণ মায়ান (সংক্ষেপে মা) বা পানির দ্বারা যমীনের সবকিছু সৃষ্টি করেন। রাজা বেণ এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা। সেই অদ্বৈতসত্তার সাথে অপরকে শরীক করে, অংশীদারিত্ব প্রদান করে যে দ্বৈত তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে আসমান ও যমীনের কর্তাকে যে পৃথক ভাবা হয়েছে তা কাল্পনিক, বাস্তব নয়। আসমানের কোন স্বতন্ত্র দেবতা নেই, সেই দেবতার কোন বংশ নেই, তার অবতার হয়েও কেউ ভূদেবতা নয়। আসমানের অধীশ্বরই যমীনের অধীশ্বর। তিনি নরাবতাররূপে ধরণীতে অবতরণ করেন না। দুনিয়ার শৃংখলা প্রবর্তনের জন্য কেতাব অবতীর্ন করেন নবীর মাধ্যমে। অবতার হচ্ছে কেতাব। এ প্রকৃত অবতার কিনা অর্থাৎ প্রকৃত অবতীর্ণ কেতাব কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে তার সমাধান হলো কোরানের অনুরূপ এক সংশয়হীন কেতাব মানবদানবের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা উচিত। এ ধরনের এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তো দূরের কথা এক পূর্ণাঙ্গ সূরা বা ফরমান পেশ করা আল্লাহ ব্যতীত অপর সকলের সাহায্য নিয়েও সম্ভব নয়। সুতরাং বুদ্ধিও যুক্তির দাবী এই সংশায়হীন সত্য কেতাবকে মেনে নেওয়া, মেনে নেওয়া যাঁর উপরে এ অবতীর্ণ হয়েছে সেই মহামানবের নেতৃত্বকে। যদি তা না মানা হয় তাহলে সেই আগুনকে ভয় করা দরকার যার ইন্ধন হবে নিরেট পাষাণ হৃদয় গায়রুল্লার উপাসকরা। আল্লাহ তো তাদের ঘিরে রেখেছেন। আসমান যমীনের বাইরে তো তারা যেতে পারবে না। মোশরেক ও আহলে কেতাবদের সংস্কার-সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে সংশয়হীন কেতাব প্রেরিত হয়েছে তাকে গ্রহণ করে যারা সংস্কার আন্দোলনে শামিল হয়ে সুসভ্য হতে চায় না তারা তাদের অসভ্যতা বর্বরতার শাস্তি এড়াতে পারবে না। কিন্তু যারা এ কেতাব ও নবীকে মেনে নিয়ে মনুষ্যত্বের নীতি গ্রহণ করেছে পরিণামে তারা শান্তিধামে স্থান পাবে, পাবে এখানকার মতো রুজী ও জীবনসঙ্গিনী।

পবিত্র কোরান ও তার বাহককে অগ্রাহ্য করে সত্যাগ্রহী হওয়ার মিথ্যা দবীদাররা আল্লাহর কাছে মশার ও মাছির ন্যায় কিংবা তদপেক্ষাও তুচ্ছ। এ ধরনের দৃষ্টান্ত মিথ্যাধর্মের ধ্বজাধারী নকল সত্যাগ্রহীদের গাত্রদাহের কারণ হয়। যারা আল্লাহ ও মানুষকে তারা প্রাপ্য অধিকার দেয়না বরং আল্লাহ ও মানুষের সাথে অসভ্য ও অশালীন আচরণ করে, মানবতার বন্ধনকে ছিন্ন করে, অহিংসার নামাবলী পরে স্বৈরাচারমূলক আচরণ করে, ভিন্নধর্মাবলম্বীদের স্বনেতৃত্ব ও স্বাধিকার প্রদানে রাজী হয়না বরং দুনিয়াতে ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চায়, কৃষ্ণ সেজে গোপীলীলা ও লড়াই করতে চায় তার গজবগ্রস্ত হওয়ার কারণে যদুবংশ ধ্বংস করে যায়। তাদের ইহকাল পরকাল দুই-ই ধ্বংস হয়।

মানুষ তো নশ্বর জীব। অবিনশ্বর তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন আবার হরিরূপে প্রাণ হরণও করবেন আবার প্রাণদানও করবেন এবং দুনিয়াতে কৃত কর্মের হিসাব চাইবেন। যিনি

দ্যুলোক-ভূলোকের মালিক সেই অবিনশ্বর অমরনাথ ও হরির বিরোধিতা করা কি নশ্বর জীব মানুষের জন্য শোভনীয়? প্রাণ ও পার্থিব সম্পদ ও সাত আসমানের যিনি স্রষ্টা, যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর জ্ঞানময় কেতাবকে যে গ্রহণ করেনা অথবা গ্রহণ করবার ভাণ করে কিংবা বলে কোরান-পূরাণ রাম-রহীম সব সত্য, 'স্বধর্মে' নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ' সে সত্যহারা। সে সাধুর জীবন হবে ভীষ্মের মতো তাকে শেষজীবনে আফসোস করতে হবে, 'বৃথা যৌবনে কুলকল্যাণে ত্যাজিনু রাজ্যদারা/ মিথ্যার লাগি সত্য যে সেবে সে হয় সত্যহারা'।

চতুর্থ রুকু

৩০. এবং যখন তোমার রব মালায়েকদের (আল্লার আমলা যাদের মুসলমানরা ফেরেশতা ও হিন্দুরা দেবতা বলে) বললেন, 'আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণের অভিলাষী', তারা বলল আপনি কি এমন জীব সৃষ্টি করবেন যে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে, আপনার স্তুতিসহকারে স্তব ও আপনার নামগান ও তপজপের কাজ তো আমরা করছি।' তিনি বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।

৩১. অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বিষয়ে দক্ষ করে তুললেন এবং অতঃপর সে সব দেবতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন আমাকে এগুলোর তাৎপর্য বলে দাও যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে অর্থাৎ মানব সৃষ্টির না করার দাবীতে) সত্যবাদী হও।

৩২. তারা বললেন, (আপনি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে) পবিত্র, আপনার প্রদত্ত (সীমাবদ্ধ) জ্ঞান ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিচক্ষণ

৩৩. আল্লাহ আদমকে বললেন, হে আদম তুমি এদেরকে এ সবের নাম বলে দাও। যখন আদম সকল জিনিসের নাম তাদের বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি আমি আসমান-যমীনের গুপ্ততত্ত্ব জানি। (যা তোমরা জাননা) এমনকি তোমাদের গুপ্ত প্রকাশ্যও জানি।

৩৪. অতঃপর আমি যখন দেবতাদের আদেশ করলাম যে আদমের সামনে নত হও (অর্থাৎ আদমের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও) তখন সকলেই নত হলো ইবলিশ (ব্যর্থকাম) ছাড়া। সে অমান্য করলো, বড়ত্ব জাহির করলো এবং কাফেরদের (অবাধ্যদের) মধ্যে সামিল হয়ে গেল ।

৩৫. অতঃপর আমি আদমকে বললাম, 'তুমি ও তোমার জায়া স্বর্গোদ্যানে বসবাস কর এবং যা-খুশী খাও কিন্তু এই গাছটির নিকট যেয়ো না, যেন জালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ো না।

৩৬. শেষ পর্যন্ত শয়তান (প্রতারক) তাদের উভয়কে গাছের দিকে প্রলোভিত করলো এবং তাদেরকে সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত করে সেস্থান থেকে উৎখাত করলো। আমি আদেশ করলাম এখন তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের দুশমন। এখন একটি নির্দিষ্ট সময় তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থান করে জীবন-যাপন করতে হবে।

৩৭. তখন আদম তার রবের নিকট কিছু বাক্য শিখে নিয়ে তার নিকট অনুতপ্তচিত্তে আত্মসমর্পণ করলো। নিশ্চয়ই তিনি অনুতপ্ত বান্দাকে গ্রহণও করেন, অনুগ্রহও করেন।

৩৮. এখন তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও, অতঃপর আমার কাছ থেকে যে হেদায়েত (সুপথ) প্রদান করা হবে এবং যে সেই বিধান নতমস্তকে মেনে নেবে তাদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই (তারা অভয়প্রাপ্ত), তাদের জন্য দুশ্চিন্তাও থাকবেনা।

৩৯. কিন্তু যারা অমান্য করবে এবং আমার নির্দেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা হবে নরকের বাসিন্দা এবং এতেই তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে।

নোট ঃ

চতুর্থ পরিচ্ছদ থেকে জানা গেল মানুষের পূর্বে দেবতারা ও শয়তানরা (মুসলমানরা এদের জিন ও অমুসলমানরা দেও, দৈত্য, দানব বলে) ছিল। একে ব্রহ্মদৈত্য বলা হয় কেননা ব্রহ্মা বা ইব্রাহীম একে বিতাড়িত করে পিতৃপরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। বৌদ্ধরা একে মার বলে। এ ফেল করা ছাত্র, এ নিজে ফেল করেছে তাই দেবতাদের মোকাবেলায় পাশকরা ছাত্র আদমকে ফেল করিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল। নিজে স্বর্গপুরী দখল করতে ব্যর্থ হয়ে আদমকে স্বর্গচ্যুৎ করলো। ফলে মর্তভূমিতে উভয়ের অবস্থান হলো। এখানেও যদি এই ডেঁপো ফেলকরা ছাত্রের সাথে জীবন কাটে তাহলে মর্ত বা মরলোক থেকে পাতালে বা নারে বা নরকলোকে প্রবেশ করতে হবে আর যদি শয়তানকে শত্রুবৎ জ্ঞান করে তার সংসর্গ এড়িয়ে দয়াময় দাতা-দয়ালু আল্লার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবনযাপন করা যায়

তাহলে বরাভয় দেওয়া হয়েছে যে হারানো স্বর্গ বা অমরলোক ফিরে পাওয়া যাবে। মর্ত্য হচ্ছে স্বর্গ ও পাতালের মধ্যবর্তী এক অবস্থানস্থল। এখান থেকে খোদানুগত বান্দা হয়ে অমরলোকে যাওয়া যায় আবার শয়তানের মতো অবাধ্য হয়ে নরকেও যাওয়া যায়। শয়তানের ফাঁদে পড়লে আদমের মত দুশ্চিন্তার শিকার হতে হবে আবার অনুতপ্তচিত্তে প্রত্যাবর্তন করলে আল্লাহ ঠাঁই দিতে প্রস্তুত আছেন। যে শয়তানের ফাঁদে পড়েনা সে তো সদা স্বাগত।

প্রতারকের প্রতারণায় আত্মপ্রতারণার কাজ করেছে ইসরাঈল সন্তানরা। ইসরাঈল হচ্ছে ব্রহ্মার পৌত্রের নাম। এ হচ্ছে হিব্রু শব্দ। আরবীতে ইসরাঈলকেই ইয়াকুব বলা হয়। বাইবেলে এর নাম য্যাকব। ভারতে এর নাম সম্ভবত যাদব। ইনি যাদব সম্প্রদায়ের আদিপিতা। পঞ্চম পরিচ্ছদ থেকে তওরাত বা রামায়ণ মহাভারতের বিবরণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই যাদব সম্প্রদায়ের একাংশ তখন মদিনায় বাস করতো। তাই ধার্মিক সম্প্রদায় হিসাবে জাগতে তাদের খ্যাতি ছিল। তাই তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে নির্ভেজাল সত্য বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

নর (বা নার) আরবী শব্দ। এর মানে আগুন। শয়তান এই আগুন থেকে সৃষ্ট তাই 'নর' মানুষ হতে পারেনা। ব্রাহ্মণরা 'নর' শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিবর্তন করেছে। মানুষ শয়তান হলে অগ্নিময় হয়ে যায়। নারায়ণকে আরবীতে আবুলাহাব বলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৪০. হে বনী ইসরাঈল আমার দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, আমার সাথে কৃতচুক্তি পূর্ণ কর তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় ও ভক্তি কর।

৪১. এবং ঈমান আন সেই সত্যের প্রতি যার সত্যতা প্রমাণকারী কেতাব তোমাদের কাছে বর্তমান। তোমরা সর্বপ্রথম এর অমান্যকারী হয়ো না এবং সামান্য মূল্যে আমার বাণী বিক্রয় করো না, আমার ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা কর।

৪২. এবং সত্যকে মিথ্যার মোড়ক দিয়ে ঢেকো না ও জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না।

৪৩. এবং নামাজ পড়, যাকাত দাও এবং নমস্কারকারীদের সাথে মিলিত হয়ে নমস্কার (নামাজ) কর।

৪৪. তোমরা লোকদিগকে সদাচারণের কথা বলো কিন্তু নিজেরা সদাচরণ করনা

অথচ তোমরা পাণ্ডিত্যের দাবীদার, তোমাদের কি কোন আক্কেল নেই?

৪৫. কোরান বিশ্বাসীগণ তোমরা সবর (কষ্টসহিষ্ণুতা) ও সালাতের (পূজা আরাধনা, নামাজ) মাধ্যমে সাহায্য চাও। এই সাধনা কষ্টকর হলেও তাদের জন্য কষ্টকর নয় যারা খোদার ভয়ে অস্থির।

৪৬. এই ভয়ে যে খোদার সামনে হাজির হয়ে (জবাবদিহী করতে হবে) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছদ

৪৭. হে বনী ইসরাঈল তোমাদের প্রতি আমার (বিশেষ) অনুগ্রহের (নেয়ামত) কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের প্রতি বর্ষণ করেছিলাম। (কেতাব ও নবুয়ত) এবং (এ ইতিহাসও) স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম (ইসরাঈলীদের গৌরবময় যুগ হযরত মুসার যুগ নয়, তাদের গৌরবময় যুগ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বা ব্রহ্মা থেকে ইয়াকুব সন্তান ইউসুফ বা ঈশপের যুগ। হযরত ইউসুফের (আঃ) যুগে তারা মিশরের মতো প্রাচিন সভ্যদেশের শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এ ছিল যথার্থ জ্ঞানচর্চা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাধনা ও আরাধনার ফল। শুধু শাসক সম্প্রদায়ই নয়, তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ প্রদর্শকও ছিল)।

৪৮. এবং সেই দিনের ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না এবং কারও জন্য কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কোনকিছুর বিনিময়ে কাউকে ছাড়া হবেনা এবং কেউ কোনদিক হতেই সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা (অর্থাৎ অতীত গৌরব কোন কাজে আসবে না, কাজে আসবে কেবল ঐশীজ্ঞানচর্চা, সদাচরণ, সাধনা ও আরাধনা, এ অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, ভাবী ইতিহাস গড়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে পরকালের মুক্তির গ্যারান্টিও হয়।)

৪৯. এবং স্মরণ কর সে ইতিহাসের কথা যখন আমরা তোমাদিগকে সূর্যপূজক শাসকদের গোলমী থেকে মুক্ত করেছিলাম'— তারা তোমাদিগকে চরম নিগ্রহের কবলে নিক্ষেপ করেছিল (অর্থাৎ তাদের বেগার শ্রমিকে পরিণত করে তাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়েছিল) তোমাদের যুবসমাজকে হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীসমাজকে জীবন্ত রাখতো দেবদাসীর জন্য এবং এ ছিল খোদার তরফ থেকে তোমাদের উপরে এক কঠিন মুসিবৎ বা পরীক্ষা।

৫০. সে ইতিহাসও স্মরণ কর যখন আমরা তোমাদের জন্যে সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলাম ও তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনেই সূর্যপূজকদের দলসমূহকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম।

৫১. সে ইতিহাসের স্মরণ কর আমরা যখন মুসাকে চল্লিশ দিন ও রাতের জন্য ডেকেছিলাম তখন তাঁর অনুপস্থিতে তোমরা কমলে বাছুরকে পূজ্য রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা জালেম হয়েছিলে (নিজেদের সর্বনাশ সাধন করেছিলে)

৫২. তৎসত্ত্বেও আমরা তোমাদের ক্ষমা করেছিলাম এই আশায় যে তোমরা কৃতজ্ঞ হবে

৫৩. এবং সে ইতিহাসের স্মরণ কর যখন আমরা মুসাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি দান করেছিলাম যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

৫৪. এবং সে ইতিহাসও স্মরণ কর যখন মুসা তাঁর জাতিকে বলেছিল হে আমার জাতি তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছ গোবৎসকে পূজ্যরূপে গ্রহণ করে সুতরাং প্রত্যাবর্তন কর তোমাদের মুক্তিদাতার দিকে এবং নিজেদের (লোকজনদের) হত্যা কর (প্রায়শ্চিত্যরূপে) তোমাদের মুক্তিদাতার চোখে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে অতঃপর তিনি তোমাদের উপর শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন (ক্ষমা প্রদান করে) যারা তার পানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাদের গ্রহণ করেন কারণ তিনি অনুগতদের প্রতি বড়ই রহমশীল

৫৫. এবং সেই ইতিহাসও স্মরণ কর যখন তোমরা বলেছিলে হে মুসা আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখা না পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে তাকে (নমস্যরূপে) মানতে পারিনা তখন তোমরা বজ্রাহত হলে আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করলে।

৫৬.অতঃপর তোমাদের মৃতুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হও

৫৭. এবং আমরা তোমাদের উপর গামামার (মেঘমালা) ছায়াদান করলাম এবং তোমাদের মান্না সালওয়া দান করলাম এবং নির্দেশ দিলাম আমরা তোমাদিগকে যা কিছু হালাল পবিত্র বৈধ সামগ্রী দান করেছি তা খাও কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষগণ জুলুমই করলো আর তার ফল তাদের উপর বর্তালো (আমার উপর নয়)

৫৮. এবং সে ইতিহাসের স্মরণ কর যখন আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম এই পুরীতে প্রবেশ কর এবং এখানকার দ্রব্যাদি খুশীমত খাও কিন্তু নগরে প্রবেশ কর বিনয়াবনত হয়ে ক্ষমা চাইতে চাইতে, তোমাদের ইন্দ্রিয়ের খাতাসমূহকে ক্ষমা করবো এবং

ন্যায়পন্থীদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদান করবো

৫৯. কিন্তু যা বলতে বলা হয়েছিল জালেমগণ তা বদলে ফেললো এবং আমি আসমান থেকে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম, এ ছিল তাদের ফাসেকীর (চুক্তিভঙ্গের) শাস্তি।

নোট ঃ

হযরত মুসার যুগ ছিল ত্রেতা যুগ। গোলামী থেকে পরিত্রাণের যুগ। বনী ইসরাঈলীদের গোলামী থেকে মুক্তি আন্দোলনের যুগে মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, গায়েবের প্রতি আস্থাহীনতা, সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তির অভাব, স্থূলদৃষ্টির কারণে গোপূজার প্রতি আসক্তি, ঈশ্বর প্রীতির বদলে গোত্রপ্রীতি, ওপরওয়ালার মেহেরবানীর প্রতি উপেক্ষা, অকৃজ্ঞতা, হালাল ছেড়ে হারামাখোরীর প্রতি আসক্তি, ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা না হয়ে ক্ষাত্রশক্তি প্রদর্শন, ন্যায়সংগ্রামে ব্রতী না হয়ে অন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রভৃতির ফলে তারা পুরহৈতৈষী না হয়ে পুরন্দর বা পুরধ্বংসকারী হয়ে গিয়েছিল। এসব ছিল স্থূলদৃষ্টির ফল। কেতাব অনুসরণ করে আত্মসংশোধন ও আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক পরপীড়ক সূর্যপূজক জাতির খাও দাও সংস্কৃতি অর্থাৎ গো-সংস্কৃতি বর্জন করতে না পারার শাস্তি। তারা ইসরাঈলী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তাদের মুক্তিসংগ্রাম ব্যর্থ হলো অথচ তাদের মধ্যে আসল মুক্তিদাতা প্রেরিত মুক্তি সংগ্রামী নেতা বর্তমান ছিল, শাস্ত্রানুযায়ী আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা রোধ ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের যোগ্যতাও তাঁর ছিল। এই সিদ্ধান্তগ্রহণ শক্তিকে ‘ফোরকান’ বলা হয়। তাই ৫৩ আয়াতের ফোরকান শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি। ৫৮ আয়াতে হিত্তাতুন ও খাতয়িকুম শব্দ আছে। হিট্টিজাতি বলা হয় তুর্কীদের। হিট্টি জাতিই পরে খিট্টি জাতি হয়। এই খিট্টিই ভারতে ক্ষত্রিয় জাতি। ইংরেজীতে ‘ত’ না থাকায় ‘ট’ হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় ‘ত’ থাকায় খিত্তি ক্ষত্রিয় হয়েছে। মুক্তসংগ্রামী হবে জনকল্যাণকামী। বিপ্লবের আতিশয্য সম্পর্কে সবসময় সচেতন থেকে সব সময় আত্মসমীক্ষা ও ক্ষমা প্রার্থনা তার ভুষণ। সে ‘হিট’ কমাতে চায় আর বিপ্লবীর বেশে বিদ্রোহী ‘হিট’ বাড়াতে চায়। ‘হিট’ (উত্তেজনা) বাড়িয়ে সে খিটখিটে কটমটে ষ্টালিন হয়। ফলে মুক্তিদাতার অনুগ্রহ অন্তর্হিত হয়। সে (গোনাহ) খাতার শিকার হয়। এই খাতার কারণে সে ক্ষত্রিয় হয়। ক্ষত্রিয় গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক জালেম শাসক হয়। ভারতে আগত শক-হুনরা অর্থাৎ তুর্কীরা, হিট্টিরা বৌদ্ধ ছিল। ভারতীয় বৌদ্ধদের মুক্ত করতে মুক্তিসংগ্রামী হিসাবে এসেছিল। এখানে এসে পার্থিবপরতার কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হয়ে গেল। এই পাপাচারীদের, গণশত্রুদের ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিল, বীরপূজা করলো। ফলে উভয়েই অধঃপতিত হলো। তারা পরস্পরের সংশোধন না করে পরস্পরের পাপাচারের সমর্থক হলো। পরে তুর্কী পাঠানরা ঘোরী-চিশতীর নেতৃত্বে হিত্তাতুন বলতে বলতে প্রবেশ করলো, ফলে ১৭ জন সৈন্যে বঙ্গজয় হয়ে গেল কিন্তু জাহানদারীর নীতি (মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করে তারা আবার ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় খাতাধারী বা পাপাচারী হয়ে গেল

যার ফলাফল আমরা ভোগ করছি। ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে জালেমরা সত্য বদলে ফেলেছিল। তারা অনেক কিছুই বদলে ফেলেছিল, তারা গণমুক্তিফৌজ থেকে গণদুশমনে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও রহমপ্রাপ্ত হওয়ার বদলে গোনাহখাতার ভাগী হয়েছিল। ফলে মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে মুক্তি শক্তির দাপটে, পাপাচারের কারণে পুনরায় শক্তিহীনতা, গোলামী, লাঞ্ছনায় পরিণত হলো। আরবে ইহুদ ও ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বা হনুদদের মুক্তি তাই ঘটলোনা। তারা স্বদেশেই পরবাসীর লাঞ্ছনার জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো। বর্তমানে মোহাম্মদী হিন্দুরা, মৌলবী ও মিস্টাররা পাপাচারের দরুণ অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছে। এই নেতিবাচক ইতিহাসের স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে ৭ম পরিচ্ছেদে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৬০. সে ইতিহাসও স্মরণ কর যখন মুসা (মুক্তিসংগ্রামের নেতা) নিজের জাতির লোকদের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল তখন তাকে পাথরের চাতালের উপর 'আশা'র আঘাত হানতে বলা হয়েছিল। তার ফলে ১২টা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোষ্ঠীই নিজের নিজের পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল তখন এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খোদপ্রদত্ত রুজী থেকে খাও, পান কর, ন্যায়-ইনসাফের সীমা লংঘন করো না এবং ফ্যাসিষ্টসুলভ আচরণ প্রদর্শন করো না।

৬১. সে ইতিহাসও স্মরণ কর তোমরা যখন বলেছিলে হে মুক্তিসংগ্রামের হোতা আমরা একই প্রকার খাদ্যে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবোনা, তোমার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের মৃত্তিকাজাত ফসল শাকসব্জী, গম, রসুন-পিঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি প্রদান করেন। তখন মুসা বললেন তোমরা কি ভালোর বদলে মন্দ চাও তাহলে মিশরে (সমৃদ্ধশালী শহরে) চলে যাও, সেখানে যা চাও তা পাবে। শেষ পর্যন্ত পরাধীনতা, লাঞ্ছনা-অপমান-নিগ্রহ, গরীবী, ভূমিদাসত্ব, শূদ্রত্ব তাদের গ্রাস করলো, তারা খোদার গজবে (রোষানলে) পরিবেষ্টিত হয়ে গেল। এটা এ জন্য হলো যে তারা আল্লার নির্দেশকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল এবং নবীদের অর্থাৎ মুক্তিসংগ্রামীদের ন্যায়ের বিধান লংঘন করে হত্যা করতে শুরু করেছিল। এ ছিল তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের ও ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের ফল।

নোট ঃ

মানুষ বলদর্পী ক্ষত্রিয় পাপচারী হলে ফ্যাসিষ্ট হয়। সে খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সম্পদে

সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যসনাসক্ত হয়। স্বল্প হালাল রুজী ও সাধনাপূত জীবনযাপন প্রণালী তার পছন্দ হয়না, সে হাঁড়িপূজক হয়, সে ফিষ্টি চায়, সে নাগরিক জীবন চায়, নাগরিকা চায় যে ঘাঘরী ঝলকি চলবে। ক্ষত্রিয়রা এখন খিস্তীখেওড় না শুনলে ঘুমোতে পারেনা। খিতি থেকেই খিস্তী খেউড় হয়েছে। এই বাইজীদের মন রাখতে সে সংস্কারকদের হত্যা করে কোন অজুহাত ছাড়াই মিথ্যা অজুহাতে। ফলে জাতি মুক্তিকামী শুন্য হয়ে গোলামীর জিঞ্জীরে বাঁধা পড়ে। পেটের কুত্তা তখন পেট ভরে খেতেও পায়না, পেটের পরিবর্তে পিঠে চাবুক পড়ে। এই সার্বজনীন সত্যকেই ইসরাঈলী সন্তানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই ফ্যাসিষ্টরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো না আর ন্যায়বাদীকেও ক্ষমা করতো না। ফলে তারা আসমান যমীনে কারও ক্ষমা পেলনা। তাদের মুক্তিপথ রুদ্ধ হয়ে গেল।

অষ্টম ঃ অমিয় বাণী

৬২. নিশ্চয় জানিও মোহাম্মদী হোক কিংবা ইহুদী, খৃষ্টান অথবা নক্ষত্রপূজারী যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে সে তার পুরস্কার তার প্রতিপালকের নিকট পাবে এবং তার জন্য কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থাকবেনা। (সূর্যপূজারী, ইহুদী, খৃষ্টান ও মহমেডান হওয়ার বদৌলতে মুক্তি ঘটবেনা, মুক্তি ঘটবে খোদপ্রীতি, পরকাল প্রীতি, সত্যের জন্য সংগ্রামের কারণে) ৬৩) সেই ইতিহাসও স্মরণ কর যখন আমরা তুর পর্বতের পাদদেশে তোমাদের নিকট আমার প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার এবং তার শিক্ষাকে স্মরণীয় করে রাখার পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যাতে তোমরা খোদার ভয়ে কম্পমান ছিল ৬৪. কিন্তু এর পর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও খোদার অনুগ্রহ ও রহমত (করুণা) তোমাদের সংগ ত্যাগ করেনি অন্যথায় তোমরা বহুপূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে ৬৫) তোমাদের জাতির সেইসব লোকের কথা তোমাদের জানাই আছে যারা শনিবারের বিধি ভংগ করেছিল এবং তাদের অভিশাপ দিলাম ধিক্কৃত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যা। ৬৬) অতঃপর এ ইতিহাসকে সেকালের লোক, তৎপরবর্তীকালের লোক এবং সমস্ত খোদাভীরু লোকদের জন্য মাত্তয়িজাত (মহাভারতের মহা উপদেশ) করে রাখলাম। ৬৭) এবং সে ইতিহাসেরও স্মরণ কর যখন মুসা তার জাতিকে বলেছিল আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গাভী জবাই করার হুকুম দিয়েছেন (বাকারা বা গাভী থেকে এই সূরার নামকরণ হয়েছে) তারা বললো তুমি কি আমাদের উপহাসের পাত্র বানাতে চাও? মুসা বললো, মূর্খতা সুলভ কথাবার্তা থেকে আল্লার আশ্রয় চাই। ৬৮) তারা বললো তুমি তোমার রবকে আমাদের নিকট তার স্বরূপ বর্ণনা করতে বল। মুসা বললেন খোদা বলছেন তা বুড়ো ষাঁড়ও নয়, বকনাও নয় বরং এর মাঝামাঝি। সুতরাং হুকুম তামিল কর ৬৯) তারা বললো তোমার প্রতিপালককে

জিজ্ঞাসা কর তার বর্ণ কেমন হবে। মুসা বললেন তিনি বলছেন গাভিটি গেরুয়া বর্ণের হবে, নয়নাভিরাম লাবণ্যময় গাঢ় হলুদবর্ণের রোশনাইযুক্ত ৭০) তারা আবার বললো তোমার রবকে আরও সঠিকভাবে বলতে বলো কেননা গাভী নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের সংশয় যাচ্ছেনা, খোদা চাইলে আমরা সুপথের সন্ধান পাব ৭১) মুসা বললেন এমন গরু যার কাঁধে জোয়াল পড়েনি , ভূমিকর্ষণ করেনি, পানি সেচের কাজও করেনি একাবারে নিখুঁত মনোরম। তারা বলে উঠলো এবার ঠিক বলেছ, অতঃপর তারা গাভী জবাই করলো অন্যথায় তারা তা করবার পাত্রই ছিলনা।

নবম ঃ হিতোপদেশ

৭২. সেই ইতিহাসও স্মরণ কর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং তোমরা পারস্পরিক দোষারোপে লিপ্ত হয়েছিলে তখন আল্লাহ তোমরা যা গোপন করতে চেয়েছিলে তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৭৩) তাই উহার (গোমাংসের একাংশ দ্বারা শবদেহের উপর আঘাত হানার) নির্দেশ দিয়েছিলাম। এভাবেই আল্লাহ মৃতদের জীবন্ত করেন এবং তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যেন তোমরা চেতনাপ্রাপ্ত হও ৭৪) কিন্তু এহেন নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের মন পাথরের মত কঠিন, না তদপেক্ষাও কঠিন হয়ে গেল কেননা কোন কোন পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোনটি দীর্ণ হয়ে যায় ও তা থেকে স্রোতধারা উৎসারিত হয় আর কোন কোনটি খোদার ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল নন ৭৫) হে অনুগত সম্প্রদায় তোমরা কি এমতাবস্থায় আশা পোষণ কর যে তারা তোমাদের আবেদনের প্রতি আস্থা আনবে অথচ তাদের মধ্যেকার একটা গোষ্ঠীর এটা স্বভাব হয়ে গেছে যে তারা খোদার কালাম (বাণী) শোনা ও বোঝার পরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করে ৭৬) তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হলে বলে আমরাও মানি কিন্তু যখন নিজেরা পরস্পরে মিলিত হয় তখন বলে তোমরা খ্যাপা নাকি যে তোমরা তোমাদের ঐশীগ্রন্থের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করছো যা দলিল হিসাবে তোমাদের বিরুদ্ধে খোদার নিকট তারা পেশ করবে ৭৭) তারা কি জানেনা যে তারা যা কিছু গোপন ও প্রকাশ করে আল্লার তা অজানা নয় ৭৮) তাদের মধ্যে একটা দল আছে যারা উম্মী (মুনি) ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই আমানি চামানি অমূলক আশা-আকাঙ্খা ছাড়া, তারা খামখেয়ালী ৭৯) তাদের ধ্বংস নিশ্চিত যারা নিজেরা স্বহস্তে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে তাকে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে ঐশীগ্রন্থ হিসাবে পেশ করে। তাদের এই রচনা তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট এবং এর দ্বারা

তারা যা উপার্জন করে তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ ৮০) এবং তারা বলে আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারেনা বড় জোর স্বল্প ক'দিন ব্যতীত। তাদের জিজ্ঞাসা কর তারা কি আল্লার কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যার বিরোধিতা তিনি কখনও করবে না? তারা এমন কথা আল্লার উপর চাপায় যা আল্লার অজানা ৮১) বরং যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের ক্ষত্রিয়তায় (পাপজালে) নিজেই বিজড়িত হবে, সে নরকবাসী হবে যাতে সে চিরদিন থাকবে ৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সংস্কার সংশোধমূলক কাজ করবে তারা অমরলোকের অধিবাসী হবে এবং তারা চিরদিন সেখানে থাকবে।

নোট ঃ

গোপূজার পরিণাম হচ্ছে নরহত্যা। ইহুদীরা স্বার্থান্ধ হয়ে তাদের এক পৃষ্ঠপোষককে হত্যা করে এবং তার হত্যার দায় গোপন করে। আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন (অধিক ব্যাখ্যা পরে আছে) আল্লা পাপ গোপন থাকতে দেবেন না (স্মরণীয় পাপ লুকোয়না সাগরও শুকোয়না) পাপী ধরা পড়ে, সাজা পায়। এ আল্লার গোপন কৌশল। আমাদের কালে রাজনীতির জনক মি. গান্ধী গোপূজক ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ যুবকের গুলিতে নিহত হয় ও ধরা পড়ে ও ফাঁসীতে প্রাণ দেয়। বফর্স, হাওলা-গাওলা, বাবরীহত্যা কিছুইগোপন করা যাচ্ছেনা, গোপন করা যাচ্ছেনা দেশভাগ সহ মণ্ডলবিরোধী চক্রান্ত।

কিন্তু এসব থেকে এই লবী কোন শিক্ষা নেয়নি যেমন ইহুদী লবী কোন শিক্ষা নেয়নি বরং তারা আরও কঠিনতর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। চরম পাশবিকতা তাদের পাষাণ, পাষণ্ড করে তুলেছে। তাই মানবতার আবেদনে কোন ফল হবেনা কারণ মানবতার বাণী আল্লার বাণীকে তারা জেনে শুনে বিকৃত করেছে ব্রহ্মার পরবর্তী বৈদিক যুগে, পৌরাণিক যুগে। তারা দ্বৈতনীতি বা দ্বিজত্ব নীতি, দ্বিজাতিত্ব নীতি গ্রহণ করেছে। তারা বেদকে তথাকথিত ঐশীগ্রন্থকে প্রকাশ করেনি, গোপন করেছে, তারা ইহুদী হয়ে নিজেদের হনুদ বলে প্রচার করছে কিন্তু আল্লাহ এসব গোপনতত্ত্ব ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা উম্মীকে মুনি করেছে। খামখেয়ালীপনাকে মুনিদের বিধান বলে চালিয়েছে। আমানি চামানি পরের ছেলে ডুবে গেলে আমি জানিনি' বলে কুম্ভমেলা, সাগরমেলার জন্ম দিয়েছে। এর সাথে সূর্যপূজার, গঙ্গাপূজার, শিবদূর্গার, লিঙ্গপূজার, কুমীরপূজার যোগ ঘটিয়েছে আলফাল ধ্বনি ও শব্দের দ্বারা, উপসর্গ, প্রত্যয়, অনুসর্গ দ্বারা খোদার কেতাবের রদবদল করেছে, করেছে নক্ষত্রপূজারীরা ক্ষাত্রশক্তির (পাশবিক শক্তির) জোরে। অতঃপর খল্লিদ্বং ব্রহ্মং' বলে খলনায়করা ব্রহ্মার বরপুত্র, মুখপাত্র সেজে বলেছে তাদের সাতখুন মাফ। তারা নরকগামী হবেনা। তারা পার্থিব স্বার্থে ব্রহ্মার বা পরমেশ্বরের নামে বর্ণাশ্রম ধর্মের, জাতিভেদের জন্ম দিয়েছে। এই হীন স্বার্থের কারণে তারা ক্ষত্রিয় বা গোনাহখাতার কারণে নিহত, ধ্বংস হয়েছে এবং পরে নরকানলে দগ্ধীভূতও হবে কিন্তু যারা খোদার কেতাবে ঈমান আনবে ও সেই অনুযায়ী নিজেদের সংস্কারের জন্য সংশোধনমূলক কাজ করবে তারা নরকানলে ভস্মীভূত না হয়ে অমরলোকে অমরনাথের

কাছে যাত্রা করবে। ঐশীগ্রন্থ, মানবজাতির ঐশী ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, ইতিহাস গোপনকারী, লোপাটকারী, বিকৃতকারীরা সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও বিপন্ন হবে।

দশম ঃ নির্দেশ

৮৩. সে ইতিহাসও স্মরণ কর আমরা ইসরাঈলী সন্তানদের নিকট থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে আল্লা ছাড়া কারও দাসত্ব করবেনা, জনক জননীর সাথে, আত্মীয় স্বজনের সাথে, অনাথ ও গরীবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষদের সাথে সর্বোত্তমপন্থায় বাক্যালাপ করবে, আরাধনা প্রার্থনা কায়েম করবে, মালসম্পদকে পবিত্র করবে। তোমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সকলেই এই প্রতিশ্রুতির বিপরীত আচরণ করলে এবং এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায় আছ।

৮৪. সে ইতিহাস স্মরণ কর যে আমরা তোমাদের নিকট থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবেনা এবং একে অপরকে ঘরছাড়া করবেনা। তোমরা একরার (অঙ্গীকার) করেছিলে এবং তোমরাই তার সাক্ষী।

৮৫. কিন্তু আজ সেই তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করছো, তোমাদের কোন গোষ্ঠী বা কাষ্টকে ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করছো, তাদের উপর চড়াও হচ্ছো অন্যায়ভাবে এবং শত্রুতা সাধনের জন্য দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছো এবং তারা বন্দী হয়ে এলে তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিপণ দাবী করছো অথচ তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করাই ছিল হারাম ; তাহলে কি তোমরা কেতাবের একাংশ বিশ্বাস কর আর অপরাংশ কর অবিশ্বাস? (অর্থাৎ পূজা উপাসনার দিকটা মান, মামেলাত বা মানবীয় সম্পর্কের বিধিবিধান বাদ দাও) তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ আচরণ করবে তারাই পার্থিব জীবনে জিজিয়া (গোলামী কর) দিতে বাধ্য হবে এবং পরকালের আজাব হবে আরও কঠোরতর। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল নন

৮৬. প্রকৃত পক্ষে এসব লোকই পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন খারিদ করে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবেনা।

নোট ঃ

আল্লাহপাক কাউকে জাম্নগত কারণে শ্রেষ্ঠত্বদান ও পরকালে মুক্তির গ্যারান্টি দেননি,

সবকিছু সদাচারণের উপর নির্ভরশীল এবং সদাচারণ হনুদ, ইয়াহুদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কর্তৃক নির্ধারিত নয় বরং খোদা কর্তৃক নির্ধারিত। ব্রহ্মাবর্তের ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ধারিত আচার সদাচার নয়, সদাচার মার্কিন প্রভাবিত জাতিসংঘের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ বিধি (New world order) নয় এবং সেটাও সদাচার নয় যা আর্য গোষ্ঠী অনার্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর সাথে বৈদিকযুগে, পৌরাণিক যুগে, চাণক্যযুগে বা গুপ্তযুগে করেছিল। আর্যদের দেয়ার বা দ্রাবিড় বসতি থেকে বহিষ্কার বা শূদ্রকরণ বৈধ ছিল না। এ সদাচার ছিল না, ক্ষত্রিয় কদাচার ছিল।

একাদশ ঃ অমৃত বাণী

৮৭. আমরা মুসাকে কেতাব দিয়েছি এবং ক্রমিক ধারায় নবী পাঠিয়েছি এবং শেষকালে ঈশা ইবনে মারিয়ামাকে সুস্পষ্ট সনদসহ পাঠিয়েছি এবং তাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে কোন নবী তোমাদের লালসার বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছে তখনই তার বিরুদ্ধে তোমরা বড়ত্ব জাহির করেছ, কাউকে বলেছ ভণ্ড, পাষণ্ড আর কাউকে করেছে হত্যা

৮৮. তারা দাবী করে তাদের অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলুষ, পবিত্রতার আবরণে আবৃত, লানাহুমুল্লাহ (সংক্ষেপে অহল্যা বা বন্ধ্যা,) এজন্য তারা খুব কম ঈমান আনে

৮৯. এবং যখনই তাদের কাছে আল্লার তরফ থেকে কোন কেতাব এসেছে যা তাদের নিকট রক্ষিত কেতাবের সত্যতা স্বীকারকারী ছিল, যদিও এর আগমনের পূর্বে কাফেরদের উপর বিজয় ও সাহায্যলাভের প্রার্থনা তারা করতো কিন্তু যখন সেই জিনিসই আসলো এবং তারা তাকে চিনতে পারলো কিন্তু মানতে অস্বীকার করলো। কাফেরদের (কেতাব ও নবীর অমান্যকারীর) উপরে আল্লার আভিসম্পাৎ!

৯০. কত নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দেয়, আল্লাহ যে কেতাব নাযিল করেছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে এজন্য যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে অনুগ্রহ দানে (নবুয়ত দানে) ধন্য করেছেন এভাবে তারা গজবের পর গজবকে বরণ করতে বাধ্য হবে এবং (বড়ত্বের কারণে) হীনতার পংকে নিমজ্জিত হবে

৯১. যখনই তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আস্থাবান এবং এর বাইরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বোঝার পরেও তা অস্বীকার

করেছে অথচ যা অস্বীকার করেছে তা সত্য এবং তাদের কাছে এই সত্যের অনুমোদন দানকারী কেতাব বর্তমান। তাদের জিজ্ঞাসা কর তোমরা যদি তোমাদের নিকট রক্ষিত কেতাবে আস্থাবান হও তাহলে ইতিপূর্বে আল্লার নবীদের হত্যা করেছিলে কেন?

৯২. এবং নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ঐশীগ্রন্থসহ হাজির হয়েছিল অথচ তোমরা গো-বৎসের পূজা করে বসলে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা তো জালেম ছিলে

৯৩. সে ইতিহাসও স্মরণ কর যখন তুর পাহাড়ের পাদদেশে তোমাদের নিকট থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে তোমাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তোমরা (তোমাদের পূর্বপুরুষরা) বলেছিল; আমরা শোনাউল্লা, মানাউল্লা (মানবার পাত্র) নই। তাদের (সত্য) অমান্যতার কারণে তাদের হৃদয় গো-প্রীতির ভাবধারায় প্লাবিত হয়ে গেল। তোমরা ঈমানদার হওয়ার দাবী কর, যে ঈমান এমন বেঈমানীর নির্দেশ দেয় তা বড়ই আশ্চর্যজনক ঈমান

৯৪. যদি পরকালে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থেকে থাকে তবে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হও

৯৫. তাদের কৃতকর্মের দরুণ তারা কখনই মৃত্যুকামনা করবে না। আল্লাহ এই জালেমদের ভাল করেই জানেন

৯৬. এই পাপাচারী ক্ষত্রিয়রা পূজারী বাউনদের থেকেও বাঁচার ব্যাপারে বেশী লোভাতুর। তাদের প্রত্যেকেই সনাতন (চিরন্তন) জীবনের পক্ষপাতী অথচ অমরত্বের বাসনা তাদের আল্লার আযাব থেকে বাঁচাতে পারবেনা। আল্লাহ সনাতনপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল।

নোট ঃ

মানুষের সদাচারের পরিবর্তে কদাচারের কারণ পার্থিবপরতা, ইহকাল সর্বস্বতা (Commercial mentality), বেণেমানসিকতা, সুদী মহাজনী মনোবৃত্তি বা ধনতন্ত্রপরতা। এই বেণেমানসিকতা সদাচারণকে ধ্বংস করে। তাই মুসা থেকে ঈশা পর্যন্ত নবী পাঠিয়েও কোন ফায়দা হয়নি। দুনিয়াদার লোকেরা এদের অবাস্তব ভাববিলাসী বিধায় হত্যা করেছে এবং সত্যের সামনে অনমনীয় চ্যালেঞ্জ হিসাবে থেকেছে। ফলে তারা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

গেছে। নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিজয় তাদের নসীব হয়নি। তারা তাদের সমর্থক বকধার্মিকদের মহাত্মা বানিয়েছে। এই মহাত্মারা পরম্পরার দোহাই দিয়ে পরিবর্তনপরতার বিরোধিতা করেছে। তাদের গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ক্ষত্রিয় শাসকরা তাদের মহাত্মা গিরির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ফলে তারা লানাহুমুল্লাহ বা অহলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব বা মন্দাবস্থার শিকার হয়েছে। লক্ষ্যযোগ্য যে অহল্যাশব্দ ভারতে বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা কোন নবীকে মানতে রাজী হয়নি, তারা নবীদের বদলে মুনীদের (মূর্খ সাধু সন্নাসীদের) পেশ করেছে যাদের খোদার কেতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলনা, এমনকি তারা সভ্যও ছিলনা, ছিল অসভ্য নাগা (নাংগা, ন্যাংটা সাধু, হীন সাধু) ন্যাংটা সাধুদের, দিগম্বর জৈন মুনীদের আদর্শকে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার জ্ঞান করেছে। তারা বুদ্ধের ন্যায় নবীর মোকাবেলায় এ মুনীদের পেশ করেছে এবং গৌতম বুদ্ধকেও শ্যাক্যমুনি আখ্যা দিয়ে তাঁর বারোটা বাজিয়েছে। তাঁর পূর্বে যে ২৪ জন ভারতীয় নবী এসেছিল তাদের পাত্তা দেয়নি। তারা অবতীর্ণ কেতাব মানেনি বরং নবীর পরিবর্তে অবতার খাড়া করেছে। এসব নবী ও কেতাব না মানার কলাকৌশল। এই ক্ষত্রিয়রা (পাপাচারীরা) ব্রাহ্মণদের সমর্থনে নবীদের বিরোধিতা করেছে। এই তথাকথিত পণ্ডিত আলেমরা অন্যকথায় পণ্ডিতমূর্খরা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা, সম্ভবামি যুগে যুগের কথা বলে কিন্তু সম্ভাবনা যখন বাস্তবে রূপে পরিগ্রহ করে তখন মানতে চায়না। ব্রাহ্মণ, ইহুদী খৃষ্টবাদী ও মোনাফেক মুসলমানদের অবস্থা আজপর্যন্ত একই রয়েছে। আলীফ লাম মীম কে অস্বীকার করে লানাহুমুল্লাহ বা আলীফ লাম মীম হয়েছে। আল্লার কালাম দুধারী ধার যুলফিকারের মতো মানলে ফালাহ প্রাপ্ত, না মানলে লানতপ্রাপ্ত। ব্রাহ্মণ ও ইহুদীরা তাই পথভ্রষ্ট, অভিশপ্ত। আলীফ, লাম-মীম-কে অস্বীকার করে লানাহুমুল্লাহ বা আলীফ লাম মীম হয়েছে। মূর্খদের মাথায় পাগড়ী পরিয়ে পণ্ডিত বানানো হয়েছে। এই ভণ্ডদের ভীড়ে আখেরী মুনাজাতের জন্য মুসলিম গদ্দীনসীন সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরা হাজির হচ্ছে অথচ যে নিজামুদ্দিন বস্তী থেকে এই দ্বীনী ডাকাতি পরিচালিত হচ্ছে সেই হযরত নিযামুদ্দিন সমকালীন শাসক সুলতান আলাউদ্দিন খলজী বারবার অনুরোধ সত্বেও তাঁকে এই মহান ফকীর তাঁর দরবারে আসবার অনুমতি দেন নি। উম্মীদের এই আমানি চামানি খেলা কতই না নিকৃষ্ট জিনিস। এসব সুফী, সাদা কাপড় পরনেওয়ালা দায়িত্বহীন মহাত্মারা ন্যাংটা সাধুদের থেকে কম বিপজ্জনক নয়। আল্লার লানতের কারণে তাদের মধ্যেকার খুব কম লোকেই ঈমান আনে, বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে। তাদের দলের বাইরের কোন প্রতিভাবান জ্ঞানী ব্যক্তিকে তারা কোনদিনই স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের আত্ম অহংকার, তাদের বড়ত্বের কারণে। এজন্য তারা অপমানকর আযাবের সম্মুখীন হয়ে কেবল দোয়া চায় যেমন ইহুদীরা চাইতো কিন্তু যখন কোন দ্বীনদার ব্যক্তি তাদের দলের বাইরে হাজির হতো তখন সর্বপ্রথম বিরোধিতা তারাই করতো। মহানবী মোহাম্মদের (দঃ) পূর্বেও তাদের চলার আহ্বান জানালে কেউ ছদফা, কেউ চারসালা কর্মসূচী প্রদান করে, তার বাইরে কোনকিছু মানতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা সব শোনার পরে যুক্তির জগতে পরাজিত হওয়ার পরেও বলে শুনলাম, কথা ঠিক কিন্তু মানতে পারছি না, মানব না। ফলে তারা গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ক্ষত্রিয় দলগুলোর তাবেদার হয়ে যায়। তারা এফতার পার্টি দেয়, দোয়া চায়, নতুন গো-ভক্তরা গলে যায়। এ এক আশ্চর্য ঈমান। প্রকৃপক্ষে এ

কোরান সুন্নার খেলাপ।

গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালকরা কোরান সুন্নাহ কিংবা গণতন্ত্র কিছুই চায়না, তারা চায় ক্ষমতা, এবং জনগণের গোলামী। তারা লোভী স্বার্থপর বর্বর। তারা মনভুলানো কথা বলবে, বিনাযুদ্ধে সূচগ্র পরিমাণ অধিকার দেবেনা। তারা কোন ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, করবে না। তারা আল্লা ও বান্দা কারও কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এটা এতিহাস কিন্তু গো-পালরা তা কোনদিন বোঝেনা। এইসব ভূদেবতারা কিছুতেই ভূমিপূজা ছাড়বে না। তাই তারা কেতাব মানবে না তা নয়, কেতাব উচ্ছেদ করবার কাজ যথারীতি করে যাবে। দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচাপত্রেও নারীদের সমানাধিকার, সম্পত্তির সম-উত্তারাধিকারের নামে শরীয়তী আইন উচ্ছেদের প্রকাশ্যে ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ পাক গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ভূদেবতা ও গোবেচারা গোপালদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন, যথাবিহিত ব্যবস্থাও যথাসময়ে করবেন।

দ্বাদশ রুকু

৯৭. তাদের জবাব দাও ঃ জিব্রাইলের প্রতি কে শত্রুতা পোষণ করে যে আল্লার হুকুমে (এই কেতাব) তোমার হৃদয়পটে উদ্ভাষিত করেছেন যা পূর্ববর্তী কেতাবসমূহের সত্যতাও স্বীকার করে যা খোদনুগতদের জন্য সুপথ ও সাফল্যের বার্তাবহ?

৯৮. আল্লাহ, ফেরেশতা (দেবতা) নবী এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের প্রতি যারা শত্রুতা পোষণ করে আল্লাও (সেই কাফেদের শত্রু।)

নোট ঃ

মোটকথা সব কেতাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী, জিব্রাইল ও মিকাঈলের কথা আছে তা পূর্ববর্তীই হোক আর পরবর্তীই হোক। আল্লাহ প্রদত্ত পরবর্তী কেতাব না মানলে পূর্ববর্তী কেতাব মানা অর্থহীন কেননা সব কেতাবের মৌলশিক্ষা এক তবে পূর্ববর্তীরা এর যথার্থ অনুসরণে যে গলতি করেছে পরবর্তী কেতাবে তা স্মরণ করিয়ে সংশোধন করা হয়েছে নতুন শিক্ষা দ্বারা। তাই এ নয়া শিক্ষকের কাছে ট্রেনিং লওয়া জরুরী। কিন্তু এই নয়া শিক্ষক আর পূর্ববর্তী জাতের সমালোচনামূলক এই নয়া কেতাবকে যারা বিষনজরে দেখে তাদের রাগ গিয়ে পড়ে নয়া কেতাব আনয়নের মাধ্যম জিব্রাইলের (আঃ) উপরে অথচ জিব্রাইল একাজ করেন স্ব-ইচ্ছায় নয়, আল্লার ইচ্ছায়। সুতরাং তাঁর প্রতি শত্রুতা আল্লার প্রতি শত্রুতার নামান্তর। মিকাঈল হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা। ভূমিপূজকরা বৃষ্টির দেবতার উপর খুশী কেননা তাতে দুনিয়াদারী লাভ হয় কিন্তু অহি বৃষ্টিতে ভূদেবতারা, কৈবর্তদের প্রভূরা ও কৈবর্ত্যরা,

চাষীরা, কৃষকরা, ক্ষেতমজুররা, শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট কারণ ইচ্ছামতো ভোগদখলে অহিতে বিধিনিষেধ আছে। তাই গোপূজকেরা মিকাঈলের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও জিব্রাঈলের প্রতি ব্যাজার। গরম ভাতে বিল্লী ব্যাজার হওয়ার মতো হক কথায় আহাম্মক (অর্থগৃধ্নু) ব্যাজার হয়। আল্লার কথা হলো যে জিব্রাঈলকে শক্রজ্ঞান করে সে মিকাঈলেরও শক্র। মিকাঈলের মাধ্যমে বৃষ্টিজাত কৃষিফসল বা সম্পদ আল্লার অহি কার্যকরী না করলে পরজাতির ভক্ষ্য হয় কারণ জ্ঞানবৃষ্টি ও সম্পদবৃষ্টির খোদা এক! এজন্য অনার্য দ্রাবিড়রা জান-মাল দেশ সব হারালো, আর্যরাও ক্ষত্রিয়তার কারণে ধ্বংস হলো। দায়িত্ব ও পুরষ্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পুরস্কার নেবে দায়িত্ব নেবেনা এমনটা বাস্তবে বেশিদিন হবেনা। একপেশে ধার্মিকতা তাই ধার্মিকতা নয়। পাঠান মোঘলদেরও ধ্বংসের কারণ এটাই।

জিব্রাঈল কোথাও গ্যাব্রায়েল, কোথাও গরুড় দেবতা। যে পাখাবিশিষ্ট দেবতা মর্তে আসে তাকে গোরু বা গোমাতা জ্ঞানে পুজা করাটা তাই মূঢ়দের কাছে সহজ হয়ে গেছে অথচ জিব্রাইল গো-শকট আরোহী নয়, বোররাক বা বিদ্যুৎবাহী শকট বা রকেটের অধীশ্বর।

মিকাইল মাইকেল, সংক্ষেপে অপভ্রংশ মিলকিল হয়েছে। জিব্রাঈল জেকিল হয়েছে। জেকিল হেকিলের মধ্যে টানাটানিটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ইহ পরকালের দ্বন্দ্ব ইহকাল থেকে পরকালের বিচ্ছেদ তাই পাপের প্রধানতম উৎস। এটাই আমাদের দেশে ছড়ায় হিলকিল মিলকিল হয়েছে। হিলকিল মিলকিলে দ্বন্দ্বকে হারজিত খেলায় রূপান্তরিত করে আধ্যত্মিক চিন্তার বারোটা বাজানো হয়েছে। হিলকিল মিলকিলের দ্বন্দ্ব যারা বাধায় আল্লাহ তাদের লোপাট করেন নবীদের দ্বারা। মহানবী বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে শাসন ক্ষমতা কেতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ জিব্রাইল ও মোহম্মদ অতীতের গর্ভে বিলীন হবে। এই সূরার প্রথমে যে আলীফ লাম, মীম আছে যা কোরানের গূঢ়তত্ত্ব তা হচ্ছে আল্লার অনুমতিক্রমে জিব্রাঈল যে কেতাব হযরত মোহম্মদের হৃদয়ে গোপনে প্রদান করেছেন তাকে প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্ঠতা। এটাই কুলবৃক্ষ বা কাঁটাগাছ যা সিদরাতুল মুনতাহায় আছে, যার কাছে যেতে আদমকে (আঃ) নিষেধ করা হয়েছে। কেতাবের বিরুদ্ধে গেলে লানৎ, মানুষ অহল্যাত্ব প্রাপ্ত হবে, বেহুলা হবে। মানুষ অজ্ঞান হবে, নফসপরস্ত হবে, দুনিয়াদার হবে, সে নারায়ণ নারদ হবে, সে আল্লার শক্রতা প্রাপ্ত হবে। শয়তান তাই হিলকিল মিলকিল তত্বকে বুঝতে দেয়না। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা, বস্তুপূজার কারণ বুঝিয়ে দিয়েছেন শয়তানের অনুচরদের ইতিহাসের ধারাবাহিক ব্যাখ্যার দ্বারা। হিলকিল মিলকিলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনলে তিন পটকান (আছাড়) দেবার কথা বলা হয়েছে। ছড়াটি লক্ষ্য করুন,

"হিলকিল মিলকিল ভঙে কে?
ঘাড় ধরে তিন পটকান দে।"

এই তিন পটকান হলো আলীফ, লাম, মিম অর্থাৎ আল্লাহ, জিব্রাঈল ও মোহাম্মদকে শক্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করলে 'ক' (কোরান) অক্ষর গোমাংস ভক্ষণের তুল্য পাপ মনে করলে বিপদ হবে। শয়তানের ফাঁদে পড়ে কুলবৃক্ষের কাছে যাবে, নিষিদ্ধ সীমানা অতিক্রম করবে।

ঢিল মারলে পাটকিল (পটকান) খেতে হবে। Tit for tat যেমন কর্ম তেমন ফল হবে। পাটকিল খেয়ে হজম করতে হবে তবুও ইহসর্বস্বতা হারাম খোরী পরিত্যাগ করোনা-এ হচ্ছে শয়তানের গোপন প্ররোচনা আর এটাকে ধ্বংস করার জন্য জিব্রাইল বা হাইকিলকে দিয়ে hide করা বাণী মহানবীর অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করা আল্লার কাজ। যে এই মহাজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে ঈমানদার হবে সে সফল হবে আর যে এই মহাজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করবে সে আল্লার রোষানলে পতিত হবে। তাকে সতর্ক করা না করা সমান, তাকে পটকান, না পটকান সমান (পটকান (না) পটকান সয় (সাউয়াউন আলায়হিম, আমলাম, তুনজেরুহুম, লা ইউমেনুন)।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইহুদী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত খৃষ্টানরা 'মাইকেল' নাম ভালবাসে হায়কেল কে ভালবাসেনা। মাইকেল মধুসূদন নাম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বিরাজ করছে। 'ত্রাহি মধুসূদন' মানে হে পরিত্রাতা ত্রাণ কর, হে মাওলা বাঁচাও। এই মাওলা মিকাইল বা মাইকেল নয়। জিব্রাইল মিকাঈল, মোহাম্মাদ (দঃ) মওলার গোষ্ঠী তাই তাদের মধ্যে কারও প্রতি শত্রুতাপোষণ আল্লার সাথে শত্রুতাপোষণ করার নামান্তর। এদের প্রতি মিত্রতাস্থাপন করাই সফলতার পথ। তওরাত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরান সকল কেতাব মেনে নেওয়াই জ্ঞানের দাবী কেননা সকল কেতাবের বার্তাবাহী জিব্রাঈল। জিব্রাঈলের প্রতি শত্রুতা শুধু কোরান ও মোহাম্মদের প্রতি শত্রুতা নয়, তওরাত মুসার প্রতিও শত্রুতা। এ শত্রুতা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাই আল্লাহ, জিব্রাঈল থেকে মিকাঈল পর্যন্ত সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত কেতাব, সমস্ত নবীকে মেনে নেওয়া দ্বীনের মৌল দাবী। মুত্তাকীর কাজ এসবকে মান্যতা দান কিন্তু সত্যদ্রোহী কাফের ও ফাসেকরা তা করেনি। তারা মিত্রতা স্থাপন করে মিত্র ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সাথে, তারা এদের মুত্তাকী।

৯৯. আমরা তোমার প্রতি এমন প্রমাণ পেশ করছি যা দ্বার্থহীন। কেউ তা অমান্য করেনি একমাত্র ফাসেক বা ক্ষত্রিয় (পাপাচারী) ছাড়া।

১০০. এটা কি ঘটনা নয় যে যখনই তারা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তখন তাদের মধ্যেকার কোন না কোন দল তা দূরে নিক্ষেপ করেছে? প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশই বেঈমান

১০১. এবং যখন তাদের কাছে আল্লার তরফ থেকে প্রেরিত পুরুষ এসেছে এবং তাদের কাছে রচিত গ্রন্থের সত্যতা প্রতিপাদন করেছে তখন গ্রন্থধারীদের মধ্যেকার একটা দল আল্লার কিতাবকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে যেন তারা কিছুই জানেনা (চিনির বলদ হয়েছে)

১০২. সোলেমানের রাজত্বের দোহাই দিয়ে তারা শয়তানদের আওড়ানো তন্ত্রমন্ত্রের অনুসারী হয়েছে অথচ সোলেমান (বিক্রমাদিত্য) কাফের ছিলনা (অর্থাৎ আল্লার কেতাবের মান্যকারী ছিল) বরং যাদুবিদ্যার রচয়িতা শয়তানরা অমান্য করেছে এবং তা ছিল ব্যাবিলনের হারুত মারুত (মার্কণ্ড) দেবতাদ্বয়ের উপর নাজিলকৃত জিনিস এবং তারা কাউকে একথা শিখাবার পূর্বে এই বলে সতর্ক করে দিত যে আমরা তোমাদের জন্য ফিতনা (বিপদ, পরীক্ষা) সুতরাং কুফরী করোনা কিন্তু তৎসত্বেও তারা তাদের নিকট তা শিখলো যা তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় অথচ আল্লার হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কারও ক্ষতি করতে

পারতো না কিন্তু তৎসত্বেও তারা এমন জিনিস শিখলো যা তাদের জন্য লাভদায়ক ছিলনা, বরং ক্ষতিকর ছিল অথচ তারা একথাও জানতো এই বিদ্যার খরিদ্দারদের জন্য পরকালে কোন হিস্যা নেই। হায় কত না মন্দ জিনিসের বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিকিয়ে দিল, হায় তারা যদি তা জানতো! তারা যদি ঈমান আনতো, তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো তাহলে আল্লার কাছে তার উত্তম প্রতিদান পেতো। হায় তারা যদি একথা জানতো!

নোট ঃ

দ্ব্যর্থহীন আল্লার কালামকে বাদ দিলে লোকে শয়তানের ধোঁয়াটে তন্ত্রমন্ত্রের ধারক বাহক হয়। ইহুদীরা কেতাবের অনুসারী না হওয়ার ফলে তন্ত্রমন্ত্রের অনুসারী হয়ে গেল। ফলে তাদের পৌরুষ বলবিক্রম শেষ হয়ে গেল। তারা হায়কিল-জেকিলকে ভুলে গেল, হায়কেলে সোলেমানী, বা সোলেমানের মসজিদ, হিত্তাতুন (ক্ষমাপ্রার্থনা) কালচার ভুলে গেল আর তদস্থলে খিত্তাতুন বা ক্ষত্রিয় পাশবিক কালচার গ্রহণ করলো। ফলে তারা ক্ষত্রিয়তার কারণে শূদ্র বা দাস হয়ে গেল। ইরাকে তারা গোলাম হিসাবে আনীত হলো তবুও তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তারা সোলেমানের তাকওয়ার নীতি ভুলে সোলেমানের দোহাই দিয়ে তন্ত্রমন্ত্র গ্রহণ করলো। এই তন্ত্রমন্ত্রগুলো ছিল আল্লার কেতাব ও নবীদের আচরিত বিধিবিধানের বিপরীত বেদাত বা বেদাহ বা বেদ। চারখণ্ডে সংকলিত এই বেদাহ ছিল দালালাহ বা গোমরাহীর উৎস। ব্যবিলনের মারুত বা মাডরুক বা মনার্ক বা মহারাজের নামে মার্কণ্ডেয় মন্দিরে হারুত-মারুত পূজায় লিপ্ত হয়ে জ্যোতির্বিদ্যার বদলে জ্যোতিষ তন্ত্রমন্ত্র যাদুটোনার কারবারে লিপ্ত হয়েছিল। ইহুদীরা কাফের শয়তানদের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখেছিল কুফর শাস্ত্রকে সোলেমানের নামে তারা ইসলামের পোষাক পরিয়েছিল। এই মাডরুকই হয়েছে গল্পের King midas আর দেবদূত হচ্ছে শয়তান। মার্কণ্ডেয় পূরাণের উৎস ব্যাবিলন। ইরাক- ইরান থেকে আনীত কেতাবের শব্দ ও অর্থ পাল্টানো বিকৃত ভাষাকে সন্ধ্যা বা সংস্কৃত নাম দিয়ে বেদ পুরাণ রচনা করা হয়েছে হারামখোর পরজীবী পূজারী সম্প্রদায়ের জন্য যারা নিজেদের আযরপন্থী বা আর্য হওয়া সত্ত্বেও অনার্য ইবরাহিমী বা ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছে। ব্রাহ্মণরা পরে নিজেদের হনুদ বলেছে। তারা ইহুদিদেরই শাখা জরথুস্তের আমলে বা তৎপূর্বে ভারতে পালিয়ে এসেছে, তারা ঈমান, আখেরাত, তাকওয়া ছেড়ে দুনিয়াপরস্তীর কারণে ধান্দাবাজী নীতি গ্রহণ করেছিল। এর সাথে খোদা ও নবীদের নাম যুক্ত করলেও এর সাথে না খোদার সম্পর্ক আছে, না নবীদের সুন্নার। এ সরাসরি শের্ক, কুফরী ও বেদাহ। মানুষ শয়তানরা জিন শয়তানদের কাছ থেকে এই ম্যাজিক বা যাদুশিখে ছিল। ইহুদীরা ব্রাহ্মণদের কাছে এই যাদু শেখার কারণে যাদব নাম প্রাপ্ত হয়েছে কিনা তাও গবেষণার বিষয়। তবে মূলে যাদু, তন্ত্রমন্ত্র হারুত-মারুতেরই অবদান ছিল, ছিল আল্লার তরফ থেকে ইহুদী আলেমদের পরীক্ষা করার জন্য। এই ফিতনা বা যাদুতে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ে কেতাববিমুখতার কারণে। কেতাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রগাঢ় করার উপরে জোর দেয়। শয়তানের কাব্য বেদাহ এটা ভাঙার উপরে জোর দেয়। সুন্নায় তালাকেরও কোরান সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতি শেখানো হয়েছে তবু মোহাম্মদী হিন্দুরা বেদাহ তালাক ছাড়তে

চায়না। যাদুর জোরে ঘর ভাঙানো তাই নিকৃষ্টতম পাপ।

এতে নারী অহল্যা, বেহুলা বা স্বামীপুত্রহীনা বা চলতিকথায় কড়ে রাঁড়ী হয়। এই বেহুলারা দেবসভায় (ব্রাহ্মণদের মজলিসে) নর্তকী-গায়কী, মন্দিরে দেবদাসী হয়। আচার্যরা এদের দেবতার নামে বেদাতপন্থায় ভোগ করেন। গণতন্ত্রের (রাজতন্ত্রের বিকল্প) নামে পার্লামেন্টের মন্দিরে স্বামী পুত্রহীনা এই বেহুলাদের নতুন করে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে শয়তান পরিবারকল্যাণ ও নারীবিলের নামে যাতে দাম্পত্যজীবনের বুনিয়াদ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গা যায়। নারীপ্রগতির নামে নারীব্যবসার গোপন কারণ শয়তানের তন্ত্রমন্ত্র রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র। পরিবারতন্ত্রের মূলেও আছে রাঁড়ী। এতে রাঁড়ীমারদের পোয়াবোরো। সেকালের রাড়ীমারদের ন্যায় একালের রাঁড়ীমাররাও তাই কেতাব ও সুন্নাহ নয়,. শয়তানের দর্শন, তন্ত্রমন্ত্র ও বেদাতের বড় ভক্ত। কোরান তাই তাদের কাছে শয়তানের কাব্য আর শয়তানের কাব্য হচ্ছে সনাতন শাস্ত্র। শয়তান থেকে আগত বলেই এর নাম সনাতন শাস্ত্র। শাস্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র অনুযায়ী যন্তর মন্তর রোড থেকে শাসন-শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলার আয়োজন হওয়ায় দেশ, সমাজ তো ভাঙছেই, ভাঙছে পারিবারিক শৃঙ্খলা। ক্ষত্রশক্তির জোরে মুসলিম পারিবারিক আইন খতম করলেই এদেশ অহল্যার-বেহুলার দেশে পরিণত হবে। চাঁদসদাগরের লখিন্দর (লাখপতি) বাসরঘরেই সর্পাঘাতে (শয়তানের অন্য নাম) মারা যাবে। সোনার সংসার ছারখার হবে। বেহুলা শয়তানের অনুচরদের নর্মসহচরী হবে। পরকাল তো গেছেই, দুনিয়াও কি থাকবে? ইহকালে ফুলনদেবী হতে হবে। এই জ্যান্তমড়ার জীবন আজ কাম্য হয়ে উঠেছে কেতাব ও সুন্নাহ অগ্রাহ্য করার কারণে।

এয়োদশ রুকূ

১০৪. হে ঈমানদরগণ রাইনা বলোনা বরং উনযুরনা বলো, শ্রমণ (মন দিয়ে শুননেওয়ালা হও যাতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পার এবং বেইমানদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব ১০৫. গ্রন্থধারী ও অগ্রন্থধারী পূজারী পুরুত ঠাকুরদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তারা তোমাদের পালনকর্তার থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়া পছন্দ করেনা কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজের রহমতদানে ধন্য করেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক ১০৬. আমি যে বাণীকে শাহারত করি বা বদল করি তদস্থলে তার চাইতে ভালো অথবা তদনুরূপ শাখা দান করি। তুমি কি জাননা আল্লাহ সবকিছুর ভাগ্যনিয়ন্তা? ১০৭. তুমি কি জাননা আসমান যমীনের (দ্যুলোক ভূলোকের) রাজত্ব আল্লার এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই? ১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সে

ধরনের দাবী ও প্রশ্ন করতে চাও যা ইতিপূর্বে মুসার নিকট করা হয়েছিল অথচ যে ব্যক্তি ইমানকে কুফরীর সাথে বদল করেছে সে সত্য সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ১০৯ গ্রন্থধারীদের অধিকাংশই তোমাদের কোনক্রমে ঈমান থেকে বেঈমানীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় হিংসার বশবর্তী হয়ে যদিও সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো আল্লাহর তরফ থেকে পুনরাদেশ না আসা পর্যন্ত। নিশ্চিত জেনো তাই হবে যা আল্লাহর মর্জী। ১১০. নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত দাও। পরকালের কল্যাণের জন্য যা কিছু অর্জন করে তোমরা পাঠাবে তা আল্লার নিকট মওজুদ পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা কি কর না কর তা জানেন ও দেখেন ১১১. তারা দাবী করে কোন ব্যক্তি অমরলোকে প্রবেশ করতে পারবেনা যদি সে ইহুদী অথবা খৃষ্টান না হয়। এ তাদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খা। তাদেরকে বলো তোমরা যদি তোমাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ আনো। ১১২. প্রকৃত সত্য এই যে, যে-ব্যক্তিই নিজের সমগ্র সত্তাকে (তনমনধন) আল্লার আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং খোদার ভালবাসায় বিগলিত হবে তার পালনকর্তার কাছে তার প্রতিদান আছে আর এ ধরনের লোকদের জন্য কোন ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

নোট ঃ

আত্মস্বার্থে ঐশীবাণীর শব্দ, অর্থ ও তাৎপর্যগত পরিবর্তন করা ছিল ব্রাহ্মণ ও ইহুদী আলেমদের স্বভাব। কেতাব ও সুন্নাহকে বিকৃত করার জন্য তারা তৎপর ছিল। খোদ মহানবীর যুগে তারা যে কারবার চালিয়েছিল তার একটা নমুনাএখানে দেওয়া হয়েছে। রাইনা মানে Here I am , স্কুল কলেজ যখন শিক্ষক মশাই রোল কল করেন ছাত্র তখন বলে I am Sir অর্থাৎ আমাকে দেখুন এই যে আমি। এই ভঙ্গীর মধ্যে বড়ত্ব আছে। কোন বড় ব্যক্তিকে যখন সবাই খোঁজাখুঁজি করে তখন সে বলে এই যে আমি এখানে। ছেলে বাপকে খুঁজলে বাপের একথা বলা সহজাত। ছাত্রের জবাবে শিক্ষকের একতা বলা সহজাত। শ্রোতার কাছে বক্তার একথা বলা যথাযথ। কোন মহান ব্যক্তিকে জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় একথা বলা আপত্তির নয়। কিন্তু বড়দের সামনে ছোটরা যদি এ ধরনের জবাব দেয় তা বেমানান। প্রশ্ন উত্থাপনের সময় মহান নবীর সামনে ইহুদী শ্রোতারা এভাবে নিজেদের পেশ করতো। তাছাড়া কাকুবক্রোক্তি করেও তারা এ শব্দটিকে নবীর প্রতি বিদ্রূপাচ্ছলে ব্যবহার করতো। এর একাধিক কদর্থও ছিল যেমন 'ওহে মূর্খ' তুই কালা হয়ে যা'। কাকুবক্রোক্তি

করলে অর্থ দাঁড়াতো 'হে আমাদের রাখাল'।

আনপড় নও-মুসলিমরা শাব্দিক ভেল্কিবাজীর সাথে পরিচিত ছিলনা। তারা পণ্ডিতদের ভাষাকেই ভদ্রভাষা জ্ঞান করে অসাবধানতাবশতঃ মহানবীর প্রতি এ ভাষা ব্যবহার করতো। আমাদের পণ্ডিতী বাংলাতেও ভদ্রভাষার অন্তরালে খিস্তি রয়েছে।(চুৎ মারাণী খানকি?) এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভদ্রমূলক ভাষা পরিবর্তন করে মুসলমানদের বলা হলো তোমারা বলো উনযুরনা—আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অর্থাৎ আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। সুযোগ সন্ধানী শিয়াল পণ্ডিতদের শাব্দিক মারপ্যাঁচ সম্পর্কে ভদ্রজনদের চিরকাল সতর্ক থাকা দরকার। সারাদেশ যখন জরুরী অবস্থার দাপটে শ্বাসরোধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন তদানীন্তন আচার্য বিনোবাভাবে প্রতিবাদ না করে গোহত্যা বন্ধের স্বার্থে অনুশাসন পর্ব উদযাপন করেন অর্থাৎ কালাবোবা সাজেন। প্রকৃত শম্বুক তো এরাই। একই কাজ অন্যেরা করলে ধর্মান্তরকরণ আর পণ্ডিতরা করলে পরিবর্তন। সধর্মীরা এলে শরণার্থী আর অন্যেরা এল বিদেশী। দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহারে তাদের জুড়ি নেই এজন্য তারা মুযাবযুব বা দ্বিজ। মহানবীকে হেয় করতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মোহাম্মদকে মেহাউণ্ড, মুসলমানকে হেয় করতে মহমেডান, রহীমকে হেয় করতে রাম শব্দ ব্যবহার করে। সুন্নাহকে (সংস্কৃতকে এভাবেই বেদাহ (বিকৃত) করা হয়। তাই সতর্কতা আজও প্রয়োজন।

আহলে কেতাব ও পূজারী ব্রাহ্মণদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তিই এর কারণ। তাদের বিকৃত দ্বীন ও শরীয়ত সংশোধন করে যে সংশোধিত দ্বীন ও শরীয়ত (সদাচারমূলক আচরণ বিধি) প্রদান করা হয়েছে আজ তারা তাকে সংশোধনের নামে বিকৃত করতে চায়। তাই তাদের কথায় কান না দিয়ে মুসলমানদের শ্রমণ হতে বলা হয়েছে অর্থাৎ কেতাব ও নবীর কথা কার্যকরী করার জন্য মনোযোগ সহকারে শুনতে বলা হয়েছে। শুনাউল্লাহ হওয়া আর সামেয়ীন বা শ্রমণ হওয়া এক কথা নয়। নবী যুলকিফল যুলফাজলিল আজীমের বাণী শোনাবার জন্য একদল শ্রমণ তৈরী করেছিলেন। তাঁকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কটূভাষায় সম্ভাষণ করতো। শ্রমণদের নেড়ে বলতো। বুদ্ধকে বুদ্দু বদে, বদ বলতো। প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে ভিন্ন অন্তরে ঈমান ও সততা না থাকলে বেঈমানরা অসততার কারণে দ্ব্যর্থক কথা বলতে বাধ্য হয়। তাই বিকৃতির সংশোধন জরুরী। আল্লাহ ইসলাহ বা সংস্কার সংশোধন চান। মুসলমানদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদী শব্দ, অর্থ ও আচরণ সংশোধন করে সংস্কারকামী হতে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহুদীবাদীরা সংস্কারকামী নয় যদিও তাদের মৌখিক দাবী তাই (দ্রঃ ২য় রুকূ) প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে, অজ্ঞ, আনাড়ী, মৌলবাদী। আল্লাহ-পাক তাই প্রগতিশীলতার স্বার্থে নিজ কেতাবের আয়াতকেও রদবদল করেন। রদবদল কেবল তিনিই করতে পারেন। আনাড়ীরা এটা বোঝেনা। তারা প্রগতির পথ রোধ করতে চায়। মুসার যুগেও তারা এরূপ করেছিল, মোহাম্মদের যুগেও তাদের আচরণ একই রয়ে গেছে। তারা প্রগতিশীল নীতির কাছে আত্মসমর্পন না করে কুফরী বা গোঁড়ামীর কারণে ঈমানদারদের বেঈমান বানাতে চায় যাতে মুসলমানরা প্রগতিশীল নীতির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই তারা কোরানের রদবদল চায় অথচ কোরান প্রগতিশীলতার বার্তাবহ। যদিও কোনটা কল্যাণকর তা তাদের অজানা

নয়। বিদ্বেষান্ধতার কারণে তারা এটা করে। তাই দ্বীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধে স্বামী অগ্নিবেশ ও অরুণ শৌরীর মত লোকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। তাদের কূটিল মানসিকতার জবাবে মুসলমানদের তাদের প্রতি করুণার হাসি হাসতে ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। তাদের উপরের প্রতি থুথু নিক্ষেপ তাদের গায়েই পড়বে। তাদের এই ক্ষাত্রনীতি ভক্তি থেকে শক্তির নীতির ফল হবে তাদের হীনতা ও অপমান। আল্লার ফয়সালা না আসা পর্যন্ত মোমেনদের এমনটাই করতে হবে। আল্লার মর্জীই কার্যকরী হবে। প্রগতিশীলতার বিজয় হবে। প্রগতিশীল আল্লার প্রগতিশীল বান্দাকে তার পক্ষে ফয়সালা পাবার জন্য মহান খোদার কাছে সালাতে (একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, আরতি, আরাধনায়) নিমগ্ন থাকতে হবে, যাকাতের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমরা কি করছো আল্লাহ সেটা দেখবেন ও তারপরে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। ব্রাহ্মণ, ইহুদী, খৃষ্টান, মহমেডান হলে কিসসু হবেনা। আমানি-চামানির দ্বারা, খেয়ালীপনার দ্বারা কেউ অমরলোক হাসিল করতে পারবেনা, তনমনধন দিয়ে দাতা মোহসীন হলে, সর্বস্বত্যাগী হলে মরলোকে বিজয় ও অমরলোকে প্রবেশ সম্ভব হবে। পাগলামীর দ্বারা কিছু হবেনা।

চৌদ্দ দফা

১১৩. ইহুদীরা বলে খৃষ্টানরা ভিত্তিহীন কথা বলে, খৃষ্টানরা বলে ইহুদীরা ভিত্তিহীন কথা বলে অথচ তারা কেতাব আওড়ায় আর যাদের কাছে কেতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের দাবী করে। এদের মতবিরোধের চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ কেয়ামতে করবেন (নরকে নিক্ষেপ করে)। ১১৪. যারা আল্লার মসজিদে আল্লার নাম নিতে (আল্লার মুসল্লীদের) মানা করে এবং তার খারাবীতে তৎপর (ধ্বংসাধনে) তার থেকে বড় যালেম আর কে হতে পারে? তাদের প্রবেশাধিকার নেই যদি একান্তই প্রবেশ করে তাহলে তা হবে (অধিকারবিহীন আগন্তুকের মতো) ভীত পদাচারণে। তাদের জন্য রয়েছে ইহলোকে লাঞ্ছনা ও পরলোকে ভয়ংকর শাস্তি। ১১৫. প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবই আল্লার, সর্বত্রই আল্লার চেহেরা বিরাজমান। আল্লাহ বড়ই ব্যাপক ও সর্বজ্ঞ। ১১৬. তারা আল্লার নরাবতার হওয়ার দাবী করে (আল্লার কারও ঔরসে, কারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করবার দাবী)। এ অপবিত্রতামূলক দাবী থেকে আল্লাহ পবিত্র বরং দ্যুলোক-ভূলোকের সবকিছুই তার। সবকিছুই তার কাছে (কানেতীন) প্রণত হয়ে আছে। ১১৭. তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের বাদীউন (স্রষ্টা)। যখন তিনি কোনকিছু করার তাগিদ অনুভব করেন তখন শুধু বলেন কুন (হয়ে যাও) আর অমনি তা হয়ে যায়) ১১৮. অজ্ঞ লোকেরা বলে আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোন নিদর্শন পাঠান না কেন? তাদের আগের অজ্ঞরাও এরূপ বলতো। আমরা সকল জাতির ঈমানদার লোকদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন পাঠিয়েছি।

১১৯. (পরিশেষে) তোমাকে পাঠিয়েছি সত্যপ্রমাণসহ সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে। জাহান্নামের বাসিন্দাদের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা। ১২০. ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি রাজী (সন্তুষ্ট) হবেনা যতক্ষণ না তুমি তাদের জাতীয় ভাবধারা গ্রহণ না করো। তাদের বলে দাও আল্লার প্রদর্শিত প্রগতিশীল ভাবধারাই একমাত্র সত্য ভাবধারা। তুমি যদি তাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ কর জ্ঞান আসার পর তাহলে তুমি আল্লার অভিভাবকত্ব ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। ১২১. যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি তারা যেন তা শুধু না আওড়ায় বরং চিন্তা-গবেষণাসহকারে পাঠ করে এবং তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আর যে কেউ তা অগ্রাহ্য করে তারাই আসলে খাসেরীন (ক্ষত্রিয় বা ক্ষতিগ্রস্ত)

নোট ঃ

সম্প্রদায়গত সাম্প্রদায়িক ধর্মের বড়াই ও বিতর্কের কোন মূল্য নেই। সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিণামেই মসজিদে ১৪৪ ধারা জারী হয় যন্তর-মন্তর রোডের কুশীলবদের কাছ থেকে। যারা এহেন গর্হিত কাজ করে তাদের আবার ধর্ম কি? মক্কার মন্দিররাজরা এহেন নীতি অবলম্বন করায় তাদের কর্তৃত্ব খতমের আহ্বান জানানো হয় কেননা তারা ফ্যাসীবাদী জালেমশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিল। এই ক্ষত্রিয়রাজ খতম কর যাতে আঁধারের জীব এই ক্ষত্রিয়রা দুনিয়াতে কর্তৃত্বহীন ও আখেরাতে নরকের কীটে পরিণত হয়।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবই আল্লার। জাতীয় দেবতাদের কোন স্থান নেই এখানে। আল্লাহ কোথাও নরাবতার হয়ে হাজির হননি। আসমান-যমীনের সবকিছু দেব, দৈত্য, নর সকলেই আল্লার ভয়ে নতশির হয়ে আছে। তিনি শুধু মসজিদেই বিরাজমান নন, দেশকাল পাত্রের বাঁধন থেকে মুক্ত ও পবিত্র তিনি। তিনি সমগ্র সৃষ্টির নমস্য। তিনি বাদিয়ুন (মূল স্রষ্টা)। এই বাদীয়ুনকে বুদ্ধের সাথে মিলিয়ে লোকে বুদ্ধপূজা চালু করেছে বলে মনে হয়। বৌদ্ধ বাংলায় বদের নাম করার কথা আছে। তাকে মওলা অর্থে স্মরণ করা হয়, "ওরে বাবা বোদেরে, লোয়ার ডান্ডা নিয়ে বেরোরে।" এহেন আল্লার ভয়ে ভীত না হয়ে সাম্প্রদায়িক জাতিগত পেশীবল প্রদর্শনের দ্বারা মানবতাবাদী সভ্যতা সংস্কৃতি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা মসজিদ ধ্বংসের মতই মারাত্মক। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান জাতির জাতীয় সংস্কৃতি। মহমেডানরাও একাজ করে কিন্তু প্রকৃত খোদাপ্রেমিকরা প্রতিক্রিয়াশীল, আগ্রাসী, বলদর্পী হয়না তারা হয় সংস্কারকামী আর অন্যেরা ভিত্তিহীন উদ্ভট ভাবধারায় মেতে থাকে। খোদাপ্রেমিকদের এদের গোলাম হতে নিষেধ করা হয়েছে। জানমাল দিয়ে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে খোদার অভিভাবকত্বে ও সাহায্যে বিজয়ী হয়ে মানবতার পতাকাকে, সহাবস্থান ও সহিষ্ণুতার পতাকাকে সমুন্নত করতে বলা হয়েছে। যদি ব্রাহ্মণ, ইহুদী, খৃষ্টান ও মহমেডানদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করা হয় তাহলে আল্লার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আল্লার

সাহায্য পেতে হলে আল্লার কেতাবের ভাবধারাকে গভীরভাবে অনুধাবন ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে অন্যথায় আল্লার কেতাবের অনাদর, উপেক্ষা ও বর্জন করার ফলে গোনাহ খাতার অধিকারী হয়ে পরকালে সমর্থকদের সাথে জাহান্নামে যেতে হবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১২২. হে ঈসরাঈল বংশের লোকেরা তোমাদের আমি যে নেয়ামত দান করেছিলাম এবং সমগ্র জগতের উপর তোমাদের শ্রেষ্টত্ব দান করেছিলাম সে ইতিহাসের কথা স্মরণ কর।

১২৩. আর সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবেনা, কারোর থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা এবং কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভদায়ক হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেনা

১২৪. স্মরণ করো সে ইতিহাস যখন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন (পরীক্ষার জন্য) সে সব সে পালন করে দেখালে তিনি বলেন আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম বানাবো। সে বললো আমার বংশাবলীর মধ্য থেকেও? জবাব এল, এ ওয়াদা যালেমদের জন্য নয়।

১২৫. স্মরণ করো সে ইতিহাস যখন এই ঘরকে (কাবা) মানবতার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম এবং ইব্রাহীমের প্রার্থনাস্থলকে স্থায়ী প্রার্থনার স্থলে পরিণত করার আদেশ দিলাম আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমার এই ঘরকে পরিক্রমাকারী, অবস্থানকারী (আরাধনা ও তপস্যার জন্য) অবনত ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতকারীদের জন্য পাকপবিত্র রাখ।

১২৬. আর সে ইতিহাস স্মরণ করো যখন ইব্রাহীম দোয়া করেছিল, হে আমার পালনকর্তা এই শহরকে শান্তিধামে পরিণত কর আর বাসিন্দাদের মধ্যে তাদেরকে খাদ্য শষ্যাদি দান কর যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে। জবাব দেওয়া হলো যারা বেঈমান তাদেরও অল্পদিনের (ইহকালের) জন্য রুটি-রুজী দেবো কিন্তু অতপর নরকের শাস্তিতে নিক্ষেপ করবো যা নিকৃষ্টতম আবাস

১২৭. আর সে ইতিহাসও স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই ঘরকে নির্মাণ করেছিল এই প্রার্থনা সহকারে, 'হে আমাদের পালনকর্তা একে আমাদের তরফ থেকে কবুল কর। তুমি সর্বশ্রোতা ও জ্ঞাতা' ১২৮. হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের

উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশ থেকে এমন এক দল সৃষ্টি কর যারা হবে তোমার আজ্ঞাবাহী এবং আমাদের মানসিক করার পদ্ধতি বলে দাও এবং ভুলত্রুটি ক্ষমা কর নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের পালনকর্তা এদের মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কেতাব, জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহিমান্বিত ও প্রজ্ঞাবান।

নোট ঃ

ইতিহাসের নিয়ামক হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লার ইচ্ছাই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ইসরাঈল গোষ্ঠীকে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন এক মৌলিক নীতি অনুযায়ী আর সে মৌলিক নীতি হলো আল্লার নির্দেশ পালনে একাগ্রতা। এই শ্রেষ্ঠত্বকে 'নেয়ামত' বলা হয়েছে। সূরা ফাতেহায় নেয়ামত প্রার্থনা করা হয়েছে। এই নেয়ামত হচ্ছে ইমামত বা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতৃত্ব যা তিনি হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) দান করেছিলেন, দান করেছিলেন তাঁর বংশাবলীকেও কিন্তু তাদের মধ্যেকার কদাচারীদের নয় সদাচারীদের, শুধু ইহকালের নয় পরকালেরও শ্রেষ্ঠত্বও তাদের দান করা হয়েছিল খোদাপরস্তীর কারণে,মানবজাতির জন্মগত পিতা আদম (আঃ) আর আদর্শগত পিতা ইব্রাহীম বা ব্রহ্মা, তাঁর পালনকর্তা তাঁকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তা নিষ্ঠাসহকারে পালন করে আল্লার অনুগ্রহ লাভ করেন। তিনি নিজের নয়, আল্লার ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। ফলে তাকে বিশ্বনেতৃত্বের জন্য মনোনীত করা হয়। হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করায় তাঁদের এই নেয়ামত দান করা হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) পর্যন্ত এই নেয়ামত অব্যাহতভাবে কার্যকরী ছিল। অতঃপর কদাচারীদের জন্ম হয়। ফলে গোলামী ও লাঞ্ছনা নেমে আসে। হযরত মুসার (আঃ) যুগে তারা গোলামীমুক্ত হয়। অতঃপর কদাচারের কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় আবার সদাচারের কারণে দায়ুদ ও সোলেমানের যুগে বিরাট প্রতিষ্ঠালাভ করে অতঃপর আবার কদাচারের কারণে হযরত ঈশার (আঃ) পর তাদের উপর চরম বিপর্যয় নেমে আসে। নবীদের সন্তান হওয়ার কারণে অর্থাৎ জন্মগত কারণে তারা কোনও মর্যাদা লাভ করেনি, লাভ করেছে আল্লাহ ও পরকালের জন্য কাজ করার কারণে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেমন সিরিয়া ফিলিস্তীন মাদাইন ও জর্দানে দ্বীনী আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তেমনি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন কাবায়। মক্কার কাবায় তাঁর খলিফা ছিলেন তাঁরই পুত্র ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ ও আখেরাতের জন্য যারা কাজ করবে তাদের জন্য পিতা পুত্র দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ কাবাকে মানবজাতির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থায়িত্বের জন্য তৈরী করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মানবজাতির স্থায়িত্ব নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি কাবার মালিকের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। তাই কাবাকে শের্কমুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ ঘরের ভিত্তি ছিল তাকওয়া (চরম খোদানুগত্য) শান-শাওকত বা জৌলুষ নয়, খোদানুগত্যকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করা ও এখান থেকে সারা দুনিয়ার তা ছড়িয়ে

দেওয়া ছিল পিতা পুত্রের প্রার্থনা। সেজন্য পিতা পুত্র তাদের বংশে এক খোদানুগত মণ্ডলী ও ইমাম প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের কামনা কোন পার্থিব কামনা ছিলনা বরং এ কামনা ছিল খোদানুরক্তির কারণে। ফলে আল্লাহ পাক তা কবুল করেছিলেন। আল্লাহ সকল কাজের নিয়ামক, উত্থান পতন তাঁর হাতে এতে তারা গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। ইসরাঈলী জাতির, ইহুদী ও খৃষ্টানদের আদি পুরুষ ছিলেন মহাত্মা ইব্রাহীম আর তার প্রার্থনার জবাবেই আবির্ভাব হয় হযরত মোহাম্মদের (দঃ) যিনি জন্মগত, বংশগত ও আদর্শগতভাবে ইব্রাহিমী উত্তাধিকারের যথার্থ প্রতিনিধি। ধর্মের মূলকথা হলো কেতাব নবীদের অনুসরণে আখেরাতের জন্য শুদ্ধ সামগ্রিক জীবনাচারণ।

এই সদাচারীদের পুরস্কার রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে, অন্যদের জন্য রয়েছে তা যা গাইগরুরা পায় অর্থাৎ গলায় গাছপাকা আর লাঞ্ছনার খাদ্য। আর তার দুধ না বাছুরের, না তার বরং গাছপাকাওয়ালার। এটা হচ্ছে প্রাথমিক আর্থিক স্বচ্ছলতার শেষ পরিণাম। ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ হয় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কার্যকর করার মাধ্যমে। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জীবন তার প্রমাণ, তাকে পরীক্ষার জন্য কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়। এ পরীক্ষা ছিল তার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য। প্রথম পরীক্ষা ছিল আযরের কল্পিত রবকে বাদ দিতে হবে। তার মিথ্যা রবদের উচ্ছেদ করতে হবে। এ আযর বা আর্যপন্থা, পুরুতঠাকুরের পন্থা খতম করতে হবে। আর্যনায়ক আর্য প্রতিপালক ক্ষত্রিয় শাসক নমরুদকে বা নারদকে (যিনি ইব্রাহীমকে নারে বা আগ্নিতে) নিক্ষেপ করেছিলেন তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে আল্লার উপর নির্ভর করে। এ পরীক্ষা শেষ হলে সিরিয়ায় হিজরত করার পরীক্ষা আবার সিরিয়া থেকে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে নিয়ে হাজেরা সহ মক্কায় স্থানান্তর। কোন শস্য শ্যামল স্থান নয়, জনমানবশুন্য স্থানে নাবালক সন্তানসহ একাকিনী অনভিজ্ঞ যুবতী স্ত্রীকে রেখে যাওয়া স্রেফ আল্লার ভরসায়, রুজী-রুটী কাপড় আওর মাকামের পরোয়া না করে এমনকি পানিও নেই। অতঃপর যে সন্তানকে স্নেহ বাৎসল্য দিয়ে লালনপালন করতে পারেননি এবং যে সন্তান পিতৃমাতৃভক্ত সেই সন্তানকে কোরবানী দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য পরীক্ষাও ছিল। আর্য কদাচার, পূজারী কালচার খতম করে সত্যিকার সংস্কৃতি বা শরীয়তের প্রতিষ্ঠা। এ পরীক্ষাও তিনি দিয়েছেন। কাবায় ইব্রাহিমী বা ব্রাহ্মসংস্কৃতি খতম হয়ে আর্য সংস্কৃতি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে অনার্য ইব্রাহিমী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) আগমন ঘটে। ব্রাহ্মসংস্কৃতির অনুসারী ছিল ইসরাঈলী সংস্কৃতি কিন্তু এই সংস্কৃতিও লুপ্ত হয়, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টাবাদের জন্ম হয়। আর্যবাদ, ইহুদীবাদ খৃষ্টবাদ পরস্পরবিরোধী হলেও একে অপরের দোসর। আর্যবাদ পরে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদ, আর্য ইহুদীবাদ, আর্যখৃষ্টবাদ ও আর্য মহমেডানবাদে পরিণত হয়েছে। ভারতে ব্রাহ্ম আন্দোলন, আর্যসমাজের আন্দোলন, বৈদিক বা বেদুঈন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ভারত থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নয়া ব্রাহ্ম সংস্কৃতি বা ঐশীসংস্কৃতিকে খতম করার জন্য ফেরাউনী বা রাম ও বাম আন্দোলন শুরু করেছে। মোহাম্মদীহিন্দুরা রামে বামে বিভক্ত হয়ে গেছে। নয়া ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু করার সময় এসে গেছে।

এই মহাপরীক্ষার সফলতার কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মানবতার ইতিহাসে স্থায়ী

মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। ব্রহ্মা খোদাভক্ত ছিলেন না, কদাচারী ছিলেন একথা বলার সাহস না ব্রাহ্মণদের আছে, না ইহুদীদের, না খৃষ্টানদের, না মহামেডানদের। তাই মানবতার আন্দোলন এক অদ্বিতীয় খোদার পূজারী ব্রহ্মার আদর্শই হওয়া উচিত। হযরত মোহম্মদ (দঃ) লুপ্ত প্রায় ইব্রাহিমী আন্দোলনকে পুনরুদ্ধারের ডাক দিলে ব্রহ্মা উপাসক মক্কার আরব পন্থী ব্রাহ্মণগণ তাতে সাড়া দিতে রাজী হয়নি, রাজী হয়নি ইহুদীবাদী ইসরাঈলীরা ও খৃষ্টবাদী খৃষ্টানরা। এই পটভূমিকায় ষোড়শ রুকু পাঠ করুন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কালের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহকেও অবলোকন করুন।

ষোড়শ রুকু ঃ ষোলকলায় পূর্ণ রুকু

১৩০. সাফিহা নাফসাহু (আহাম্মক) ছাড়া ইব্রাহিমী মিল্লাতের (সুন্নাতের, সুপথের, সদাচারের) প্রতি বাম হতে পারে কারা? ইব্রাহীমকে তো আমি দুনিয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিলাম এবং পরকালেও সে সালেহীন বা সংস্কারকদের মধ্যে গণ্য হবে

১৩১. কেননা যখনই তার ডাকনেওয়ালা তাকে আনুগত্যের ডাক দিলেন তখনই সে ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, আমি সারা সৃষ্টির পালনকর্তার অনুগত হলাম

১৩২. এবং এই আনুগত্যক সে তার সন্তানাদির উপরও বিস্তৃত করে দিয়েছিল এবং ইয়াকুব ও (য্যাকব, যাদবও) একাজ করেছিল। বলেছিল হে আমার বানিয়ারা (বেণেরা) আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনটিকে (জীবনাচরণকে) মনোনীত করেছেন এবং আমিত্ব ত্যাগ করে খোদনুগত না হয়ে মরোনা

১৩৩. তোমরা কি জান ইয়াকুব তার বেণেদের মৃত্যুর সময় কি বলেছিল, আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে, তদুত্তরে তারা বলেছিল, আমরা আপনার ইলাহ (বিধানদাতা) আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, (ব্রহ্মা) ইসমাঈল (বিষ্ণু) ইসহাক (মহেশ্বরের) একমাত্র ইলার (বাইলার) পূজা করবো এবং আমরা মুসলিম (সদাচারী) হবো

১৩৪. তারা ছিল সত্য যুগের এক প্রাচীন গোষ্ঠী তাদের উপার্জন তাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য, এবং তাদের আচরণের জিম্মাদারী তোমাদের নেই

১৩৫. তারা বলে ইহুদী হও কিংবা খৃষ্টান হও সুপথ পাবে। বলে দাও না বরং নিষ্ঠাপূর্ণ ইব্রাহিমী পথই সত্যপথ আর সে একাধিক খোদার উপাসক ছিলনা (অর্থাৎ আর্য

পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলনা)

১৩৬. সকলে বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লার প্রতি এবং আমাদের প্রতি যেসব আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে সে সবের প্রতি এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসাহক, ইয়াকুব ও এবং তার সুশীল সন্তানদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা দান করা হয়েছে মুসা, ঈসা এবং তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে অন্যান্য নবীদের তারও প্রতি, তাদের কারও মধ্যে আমরা কোন ফারাক করিনা ববং আমরা সকলেই আল্লার প্রতি অনুগত

১৩৭. তোমরা যেমন ঈমান এনেছ তারাও যদি তেমন ঈমান আনে তাহলে তারাও হেদায়েত প্রাপ্ত কিন্তু তারা যদি ভিন্নপথ অবলম্বন করে তাহলে তারাই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট এবং তাদের মোকাবেলায় আল্লাই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও জ্ঞাতা

১৩৮. আল্লার রঙ ধারণ করো আর আল্লার রঙের চাইতে কার রঙ উত্তম এবং আমরা তারই আবেদ

১৩৯. বলে দাও তোমরা কি আল্লার ব্যাপারে আমাদের সাথে হুজ্জুত করতে চাও অথচ তিনি আমাদের রব, তোমাদেরও রব এবং আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমদের জন্য আর আমরা তাঁর জন্য একান্তভাবে নিবেদিত প্রাণ (অর্থাৎ আমরা দুতেলে বা দ্বিজ নই)

১৪০. তোমরা কি বলতে চাও ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার দলবল ইহুদী ও খৃষ্টান ছিল? বল তোমরা বেশী ভাল জান, না আল্লাহ বেশী ভাল জানেন। আফসোস তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যার কাছে আল্লার তরফ থেকে সত্য দলিল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তা গোপন করে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল নন

১৪১. এ ছিল এক প্রতিষ্ঠান যা গত হয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের জন্য আর তোমরা যা উপার্জন করেছ বা করবে তা তোমাদের জন্য, তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজেদের চরকায় তেল দাও)

নোট ঃ

আরবীতে নুন বা 'ন' অক্ষর আমিত্বের প্রতীক। নফ্‌স্ হচ্ছে অহম, আমিত্ব, এ অহং ভরা, এ হেমাকত। এজন্য এ আহাম্মক। এই আমিত্বে যে ফেঁসে যায় সে প্রকৃত সদাচার পদ্ধতির প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় কারণ ব্রহ্মার পদ্ধতি হচ্ছে আমিত্ব স্বেচ্ছাচারিতা অহংচারিতা পরিত্যাগ করে আল্লার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ। যে এটা করেনি সেই স্বেচ্ছাচারী, কদাচারী ব্রহ্মার পথের বিরোধী না হয়ে পারেনা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পথ ছিল সদাচারের পথ। এই সদাচারীদের পথ পরিত্যাগ করে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এবং পরবর্তী কালের আর্য ব্রাহ্মণরা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, মুসা, ঈশা, অন্যান্য নবী শেষনবীর পথ অনুসরণ করে আল্লাভক্তরা। আল্লাকে মানতে হলে সকল নবীকে মানতে হবে। কোন নবীকে মানবে, কোন নবীকে মানবেনা তাহলে তা কোন নবীকেই মানা হয়না, আল্লাকেও মানা হয়না বরং মানা হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে। নবীপূজকরা খোদাপূজক হতে পারেনা। ব্রহ্মাপূজা, খৃষ্টপূজা নবীবিরোধিতা ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান, ইহুদীদের সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। আল্লাকে খালেস ভাবে না মানলে তা আত্মপূজাই হয়। ব্রাহ্মণ, ইহুদী, খৃষ্টানরা আত্মপূজক হওয়ার কারণে আহাম্মক জালেম। পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে কেউ পার পাবেনা।

তৌহিদ বা একত্ববাদকে মানতে হলে খালেছভাবে হযরত ইব্রাহীমের মতো মানতে হবে। আল্লার প্রতি ঈমান আনার দাবী অনেকেই করে, ইহুদী, নাসারারও করতো কিন্তু এটা আল্লাকে মানা নয়। সেজন্য দ্বিতীয় রুকুতেই তাদের বেইমান ও প্রকৃত নির্বোধ বলা হয়েছিল কারণ তারা স্বার্থপূজারী, নরপূজারী, আত্মপূজারী। আত্মপূজারীরা আল্লাহভোলা হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঐশীসাহায্যের অভাবে তারা গোলামী ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয় আর যারা ইব্রাহীম ও ইয়াকুব সন্তানদের ন্যায় প্রবৃত্তিপূজা পরিত্যাগ করে। আল্লার ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তারা আল্লার রহমতে দুনিয়াতে ইমাম, আবেদ ও আখেরাতে অমরলোকের বাসিন্দা হয়। ইসরাঈলীরা প্রথম দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলকেই মানতো তারা কেবল ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে মানতো, বিষ্ণুকে মানতোনা এমন নয়। ফলে তারা সাম্প্রদায়িক ছিলনা। পরে তারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হওয়ার জন্য জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব হারাতে বাধ্য হয়। একই অবস্থা হয় আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ও খৃষ্টবাদীদের। ব্রাহ্মণ্যবাদ সৃষ্টি হয় বৈদিক যুগে যখন তারা নিজেদের খোদানুগত না ভেবে আর্য, ইরানী, সিন্ধী প্রভৃতি ভাবতে থাকে। কিন্তু নাম নিতে থাকে ব্রহ্মার। ইহুদীবাদ সৃষ্টি হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকে। এই সময়ে বৌদ্ধবাদও সৃষ্টি হয়। খৃষ্টবাদ তৈরী হয় হজরত ঈশার বেশ কিছুকাল পরে। ব্রাহ্মপুরাণ, ইহুদী খৃষ্টানদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে ব্রহ্মা বা ইব্রাহীম যে একেশ্বরবাদী ছিলেন তার সাক্ষ্য আজও বর্তমান এবং তাদের সকলেই তাকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক হিসাবে দাবী করে এবং তার দেহ থেকে জাত বলে আজও বিশেষ মর্যাদা দাবী করে কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করেনা। ভারতীয় ইহুদী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পরবর্তীকালের ইরানী নবী যরথুস্ত কিংবা ভারতীয় নবী যুলকিফলকে না মেনে, বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে মহাত্মা ইব্রাহীমের নামে। তারা ইব্রাহিমী বা ব্রাহ্মী ভাষা, সিন্ধীভাষা, প্রাকৃত ভাষা পরিত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষার নামে, সাধুভাষার নামে এক ভাবের ঘরে চুরি করার ভাষা তৈরী করেছে।

এই ভাষায় তার ঐশী ভাবধারা বর্জন করে শয়তানী প্ররোচনায় কাল্পনিক শাস্ত্র যা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের অস্ত্র যেমন মনুসংহিতা ইত্যাদি রচনা করেছে যার সাথে নূহ (আঃ) বা মনুর কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই ব্রহ্মার। এসব আত্মপূজার দর্শনকে শাস্ত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও এমনিই এক অমানবিক শোষণের শাস্ত্র। এসব ধর্মের নামে করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্বেই বলেছি। এবার বেণে সৃষ্টির রহস্যও বোঝা যাবে হযরত ইয়াকুবের 'বানিয়া' শব্দ থেকে। বানিয়া মানে ছেলে। ছেলে হলো বীজ। বীজ থেকে ফসল হয়। তার দ্বারা জৈবিক আর্থিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করা যায়। সে পিতামাতার উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে যায়। সে পিতার অনুগামী ও সাপোর্টার হয়। ব্রাহ্মণ তার পরবর্তী বংশধরদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বঞ্চিত করে শুধু আর্থিক শোষণের কাজে লাগিয়েছে যা ব্রহ্মার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হযরত য্যাকব বা যাদব করেননি। ফলে বেণেরা সারা দুনিয়াজুড়ে আর্থিক অনাচারের জন্ম দিয়ে চলেছে যেমন ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক অনাচার করে চলেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইহুদীবাদ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অনাচারের জন্য কুখ্যাত। ব্রাহ্মণ চরিত্র আযর, ক্ষত্রিয় চরিত্র নারদ, বেণে চরিত্র ভাড়ুদত্ত আমাদের কাছে সুপরিচিত। এরা আল্লাকে গ্রহণ করেনি, আল্লার কেতাবকে গ্রহণ করেনি, আল্লার দ্বীনকে গ্রহণ করেনি, আল্লার রঙে রঙীন হয়নি, ইব্রাহিমী সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি বরং তার সুন্নাহর পরিবর্তে বেদাহ (নবীরিরোধী পদ্ধতি) গ্রহণ করেছে। এজন্য গৌতম বুদ্ধ বেদকে গ্রহণ করতে রাজী হননি। ব্রাহ্মণ্যবাদ, ইহুদীবাদ, বৌদ্ধবাদ, খৃষ্টবাদ প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনগড়া মতবাদ। এ সনাতন বা ধারাবাহিক ঐশী উত্তারধিকার নয়। তাই এ নিয়ে বিতর্ক করতে বারণ করা হয়েছে যেহেতু ব্রহ্মপুত্রদের আচার আচরণ তারা বিস্মৃত হয়েছে। তাদের প্রকৃত ইতিহাস তারা ভুলে গেছে। তাই তারা বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, কাষ্ট বা জাতপাতের নীতি অবলম্বন করে চলেছে। সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বেণেরা রাজনীতি অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিকতার নামে গোলাম করে শাসন ও শোষণ করছে। তাই মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে খোদার গোলামীর ডাক তাদের অসহ্য। তারা ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে, চক্রান্ত করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়, জাতিদাঙ্গা বাধায়, শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করে নানা জিগির তুলে। সেজন্য তাদের কেউ ঘাঁটাতে চায়না, মানবমুক্তির ডাক কেউ দিতে চায়না। এজন্য আল্লাহ পাক তার প্রকৃত বান্দাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা যদি প্রকৃত আল্লার বান্দা হয় যেমন ইব্রাহিম ও ইয়াকুবের বেণেরা বা সন্তানরা হয়েছিল তাহলে তাদের মোকাবেলায় কারও সাহায্য দরকার নেই, এক আল্লার সাহায্যেই যথেষ্ট কিন্তু ইব্রাহিমের (আঃ) মতো তোমাদের পরীক্ষা দিয়ে বড় হতে হবে। ইব্রাহিমের মতো আল্লার রঙ ধারণ করতে হবে আর ধর্মীয় ঝগড়া এড়িয়ে যেতে হবে। তারা খোদাপ্রেমিকদের নিষ্ঠাহীন, দ্বিজ বানাবার চেষ্টা করবে কিন্তু তা দৃঢ়তার সাথে এড়িয়ে যেতে হবে, তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে দ্বীনের নকলনবিশী করা চলবেনা, বাহ্যিক অনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার কোন মূল্য নেই। প্রকৃত ধার্মিকতা হচ্ছে আমিত্ব বর্জন করে নকল স্বামী, রাজা মহারাজাদের বাদ দিয়ে নিখিল বিশ্বের স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করা। প্রকৃত ধার্মিকতা কি তা আল্লার থেকে বেশী কে জানে এবং লোকদের প্রকৃত ইতিহাস কি তাই বা তার থেকে বেশী কে

জানে? তারা কোন ভাবের দ্বারা পরিচালিত তা বা তার চেয়ে কার বেশী জানা সম্ভব? তাই এক এক করে ষোল রুকু বা ষোলকলায় পূর্ণ করে প্রথম পারা বা প্রথম হতে অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২য় পারা বা দ্বিতীয়খণ্ড থেকে পুরানো সত্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই আত্মপূজায় নিমগ্ন সত্যবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীল আমিত্ববাদীরা প্রতিক্রিয়ামূলক হঠকারিতা অবলম্বন করেছে। প্রথম পারাটি তাই প্রথম সোপানের মত। এবার আমরা দ্বিতীয় সোপান শুরু করবো। রাজা বেণ বলতে আমরা আসমানওয়ালাকে বুঝিয়েছি। এই আসমানওয়ালার অনুগত হিসাবে বেণ রাজাদের নাম কিংবদন্তী হিসাবে চালু হয়ে যায়। রাজা বেণের গোষ্ঠী হচ্ছে সত্যযুগের ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসাহক, ইয়াকুব, ইউসুফ প্রমুখ মহামানবগণ। এদেরই বংশধর—ইহুদীরা সূদখোর হলে বেণে মহাজন নামে পরিচিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পারা (খণ্ড)

সায়াকুল

সপ্তদশ পরিচ্ছদ

১৪২. উপহাসের পাত্ররা বলবে তাদের কি হলো তারা কেবলা পরিবর্তন করলো যে? বলে দাও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবই আল্লার, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সোজা পথ দেখান

১৪৩. এভাবেই তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থানুসরী দলে পরিণত করেছি যাতে তোমরা দুনিয়ায় সত্যের সাক্ষ্যদাতা হও এবং রসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হয়। কেবলা পরিবর্তনের কারণ হ'ল কে রসূলের অনুসরণ করে না করে তা পরীক্ষা করা। এটা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল কিন্তু তাদের জন্য কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লার হেদায়েত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে কখনও নষ্ট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি রউফুর রহীম (স্নেহময় দাতা)

১৪৪. নিশ্চয়ই আপনি বারবার আসমানের (উপরের) দিকে তাকান (করুণার আশায়) আপনার পছন্দমত কেবলাই আপনাকে প্রদান করা হবে। এখন আপনি 'মসজিদুল হারাম' - এর দিকে মুখ ফিরান এবং তোমরা যেদিকেই থাক সেদিকে মুখ ফিরাও। কেতাব প্রাপ্ত লোকেরা খুব ভাল করেই জানে (কেবলা পরিবর্তনের) হুকুম তাদের রবের তরফ থেকেই এসেছে এবং আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল নন

১৪৫. আপনি গ্রন্থধারীদের কাছে সমুদয় প্রমাণ একত্রিত করে পেশ করলেও তারা আপনার কেবলার অনুসারী কখনই হবে না আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কেবলার অনুসারী হওয়া সম্ভব নয় এবং তাদের কোন দলও একে অপরের কেবলার অনুগামী হবেনা। জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যে জ্ঞান আপনার কাছে পৌঁছেছে তার পরেও আপনি যদি তাদের বাসনা কামনার অনুসরণ করেন তাহলে আপনি আত্মধ্বংসকারীদের মধ্যে সামিল হবেন

১৪৬. যাদেরকে কেতাব দান করা হয়েছে তারা তাকে পুত্রবৎ চেনে কিন্তু তাদের

মধ্যে কেউ কেউ জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে

১৪৭. এটা আল্লার তরফ থেকে আগত মহাসত্য (বাস্তব ঘটনা) কাজেই কখনই সন্দিহান হয়োনা।

নোট ঃ

মোমেনদের একনিষ্ঠতার জন্য তাদের উপহাস করা হলে, (নির্বোধ বলা হতো) (২য় রুকু দ্রষ্টব্য) আল্লাহ পাক তাদের দ্বিজত্বের কারণে উপহাস করলেন, আহাম্মক বানালেন। মনে হচ্ছিল বায়তুল্ল মুকাদ্দসের অনুসরণ করে নবী ও নবীর দল বুঝি ইহুদী মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, ১৭ মাস পরে দেখা গেল ব্যাপার তা নয়। নবী কেবলামুখীই ছিলেন, কেবলামুখীই আছেন, তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিহারের কিন্তু এটাকে তারা মনে করেছিল মুসলমানরা বুঝি ইহুদী সাম্প্রদায়িকতা গ্রহণ করছে। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লার। আল্লাহ কোন দিকের সীমানায় আবদ্ধ নয়। তাই কোন দিকে মুখ ফিরান হবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো অল্লার অনুগত হওয়া। যে বা যারা আল্লাহ অনুগত হয় আল্লার পাক তাদের সেরাতুল মুস্তাকীমের বাস্তব সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সেরাতুল মুস্তাকিম সূরা ফাতেহায় (নামাজের দোয়ায়) মুসলমানদের প্রার্থনা ছিল। খোদানুগতদের ইব্রাহিমী সার্বজনীন ধর্মপথ এবং ইব্রাহিমী কেবলা দেখান হলো, তাকে চিরস্থায়িত্ব দান করা হলো-মুসলমানদের ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও এতদুভয়ের সমন্বয় ব্রাহ্মণ্যবাদ পরিত্যাগ করে সত্যিকার ব্রহ্মপথ প্রদর্শন করা হলো। এই ব্রহ্মপথ প্রদর্শন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এ এমন মধ্যপথ যাতে শের্ক (বহুত্ববাদ) নেই, পুরোহিতপ্রথা নেই, নবীপূজা নেই। এসবই ছিল বাড়াবাড়ি, প্রান্তিকতা। এসব ধর্মীয় আবর্জনামুক্ত করে প্রকৃত ধর্ম, ধার্মিকতা ও তার অনুসারী ভারসাম্যপূর্ণ দল তৈরী করা হলো যাতে তারা প্রান্তিকতাপ্রাপ্ত ধর্মীয় দলসমূহকে পথ প্রদর্শন করতে পারে। তারা যে মধ্যপন্থার উপর আছে তার প্রমাণ মহানবীর আচরণ। এটাই তাদের দলীল।

হযরত মোহাম্মদ হচ্ছেন মধ্যপন্থীদের দলীল। কে এই দলীলের অনুসরণ করে না করে তার পরীক্ষার জন্য নবীকে দিয়ে কেবলা পরিবর্তন করা হয়। যখন কোন আন্দোলন মূল লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে গতি পরিবর্তন করে তখন আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারীরা দিশেহারা হয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীরা নেতার দিক পরিবর্তনে দিশেহারা হয়না। সব গতিশীল আন্দোলনের কর্মীকে এই কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। যে আন্দোলনের নেতা এই দিক পরিবর্তন করতে পারেন না তিনি নেতা হবার যোগ্য নন। সব আন্দোলনের সামনে এটা একটা কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় অথচ এ পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া দলের নবজীবন লাভের সম্ভাবনা নেই। জীবন্ত আন্দোলন জীবন্ত শিশুর মতই। জীবনের বাঁকেবাঁকে তার পরিবর্তন হয়। আল্লার হেদায়েত যার লক্ষ্য সে এই পরিবর্তনে ঘাবড়ায় না। সে জানে নবী আল্লার নির্দেশে কাজ করেন। নবী তার

কাছে দলীল। তাই নবীর সাথে কেবলা পরিবর্তন করতে মুসলমানদের কোন অসুবিধা হয়নি। আল্লাহ ও নবীকে মানাই দ্বীনের বুনিয়াদ। এতে পূর্বোল্লিখিত তিন ইব্রাহিমী গোষ্ঠীরই দুর্বলতা ছিল কিন্তু নবোত্থিত ইব্রাহিমী গোষ্ঠীর সকলেই এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তাই আল্লাহ পাক এই ঈমানকে কেতাব সুন্নাহকে দৃড়ভাবে ধারণ করার এক সফল নজীর হিসাবে সকল ইব্রাহিমী গোষ্ঠীসমূহ বিশেষভাবে ইহুদীদের সামনে তুলে ধরলেন যারা কিতাব সুন্নাহকে দৃড়ভাবে ধারণ করতে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লার পরিবর্তে গাইগরু, সুন্নার পরিবর্তে বেদাহ, হঠকারিতা ছিল তাদের ব্যর্থতার কারণ। তাই নবোত্থিত ব্রাহ্মণদের যারা একান্তভাবে একেশ্বরবদী তারা মহানবীর মতো দঢ় একেশ্বরবাদী হয় কিনা তা পরীক্ষা করা জরুরী ছিল। ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী মহানবী মোহাম্মদকে (দঃ) নয়া ব্রাহ্মণগণ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে তাদের ঈমান প্রমাণ করে দেখালেন। এ ধরনের ঈমান নিষ্ফল ঈমান হয়না। এ ফলদায়ক ঈমান। ঈমানদাররাই মানুষ, অন্যেরা তো মানুষের বেশে পশু। তারা তাদের পাশবিকতা, পশুত্ব গোপন করতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত তারা বস্তুপূজক ধন-সম্পদপূজক, গোসম্পদ পূজক, গোপূজক পর্যন্তও হয়। আল্লাকে পূজো করা (নামাজ পড়া) আল্লার জন্য কোরবানী (সম্পদ প্রদান যাকাত ওসর ফেতরা ইত্যাদি), লালসা বাসনার কোরবানী, গো-কোরবানী দেওয়া তাই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না অথচ মুসলমানরা সহজেই তা করে ফেলে, বাহানাবাজী করেনা। তাদের মানুষ হওয়ার জন্যই এটা সম্ভব হয়। আল্লাহ সেজন্য মানুষের প্রতি স্নেহশীল, পশুর জন্য কঠোর। আল্লা মক্কার পশুদের উপেক্ষা করলেন, মদিনার পশুদের উপহাস করলেন, মক্কা মদিনার মানুষ ক'টিকে গ্রহণ করলেন। পরীক্ষার পরে পরীক্ষা দিতে যারা প্রস্তুত হয়, পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আল্লাহ তাদের নেতৃত্ব দেন। মোমেনদের প্রতি এ তাঁর রহম। রহীম হিসাবে এ তাঁর দান। এ রহীমের স্নেহাশীষ। এজন্য আল্লাহ পাক এখানে তার পরিচয় দিয়েছেন রউফুর রহীম হিসাবে।

মহানবী ইব্রাহিমী ইমামত চাচ্ছিলেন। তিনি ইব্রাহিমী দ্বীনের কারণেই মক্কা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, মদিনা থেকে তিনি ইব্রাহিমী মদিনা বায়ুতুল মুকাদ্দসের আভিমুখী হন। বনী ঈসরাইলী নবীদের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠার এ এক বড় প্রমাণ। তিনি মানসিক সংকীর্ণতা মুক্ত প্রকৃত মানবীয় সংস্কারক ছিলেন। ইসরাঈলী উম্মাতকে তিনি সঙ্গী হিসাবে পেতে চাচ্ছিলেন। তারা কৌটিল্য নীতি গ্রহণ করেছিল যেমন সব নবীর সাথে তারা করেছিল। তারা তাদের শেষ পরীক্ষায় ফেল করলো। ঈমানদারদের ইমামত থেকে তারা যাতে ফায়দা তুলতে না পারে তাই তাদেরকে ছেঁটে ফেলে দেওয়া হলো কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাদের সাথে বারাত ঘোষণা করা হলো। কাবা কেন্দ্রিক ইমামতের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হলো।

এটা যে আদিকেবলা, মোক্ষস্থান বা মক্কা তা ভারতের ব্রাহ্মণরাও জানে যেমন জানতো মক্কার ব্রাহ্মণরা। ইহুদীরাও জানতো কিন্তু সমস্ত প্রমাণ একত্রিত করে দিলেও তারা তা মানবেনা। ব্রাহ্মণ ইহুদীরা যেমন পরস্পরের কেবলাকে মানে না, মানবেনা, তেমনি মক্কার কেবলাকেও মানবে না যদিও তারা তাকে চেনে পুত্রবৎ তবুও তারা সত্যকে গোপন করে চলবে বার্ধক্যের বারাণসী কাশীর জন্য (কাবার গোপন রূপ)। দারা পুত্রপরিজন কোরবানী

দিয়ে মহাত্মা ইব্রাহিম কাবাকেন্দ্রিক ইমামত লাভ করেছিলেন। মহানবী দারা পুত্রপরিজন সবই হারিয়েছেন। এখনও কি তাঁর প্রকৃতি স্বীকৃতি আসবেনা। তিনি আসমানওয়ালার পানে তাকাচ্ছিলেন তাঁর অনুগ্রহের আশায়। তাঁর পালনকর্তা স্নেহাশীষ বর্ষণ করলেন, স্বীকৃতি দিলেন। আল্লার নেয়ামত (অনুগ্রহ) পাবার পর ইহুদীরা তা বদলে ফেলে, মুসলমানরা যেন এমন না করে ফেলে এজন্য তাদের সতর্ক করা হয়েছে। ইহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দস মসজিদে নববী আর ব্রাহ্মণরা বাবরী মসজিদ, মথুরার মসজিদ ও কাবার মসজিদ নিয়ে মুসলমানদের সাথে বিবাদে লিপ্ত। মুসলমানদের একদল কাদিয়ানকে কেবলা করে নিয়েছে, মুনাফেকরা কেবলা করেছে পাশ্চাত্যকে। তারা নেয়ামতকে কুফরীতে বদলে দিয়েছে। পরবর্তী রুকু লক্ষ্য করুন।

অষ্টাদশ রুকু

১৪৮. প্রত্যেকেই তার গন্তব্যের অভিমুখী কাজেই কল্যাণের (ইমামতের) দিকে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো আল্লাহ তোমাদের জমায়েত করবেন, কারণ তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা

১৪৯. তুমি যেখান থেকেই বের হও (নামাজের জন্য) মসজিদে হারামমুখী হও। এটা তোমার রবের বাস্তবতাসম্মত ফয়সালা। তোমরা কি কর আল্লাহ তা দেখবেন

১৫০. যেখান থেকেই যাত্রা শুরু কর তোমার মুখ মসজিদে হারামের পানে ফিরাও এবং যেখানেই তোমরা থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফিরাও যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে না পারে (কেতাব থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারে) তবে যারা প্রতারক (পরীক্ষায় ব্যর্থ) সেই আত্মধ্বংসকারীদের মুখ কখনই বন্ধ হবেনা (তারা নানা খোঁড়া যুক্তি পেশ করবে) কাজেই তাদেরকে ভয় কোরনা, আল্লাকে ভয় কর যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে পারি এবং তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও

১৫১. অনুরূপ নেয়ামত নবী যাকে তোমাদের মধ্য থেকে উত্থিত করেছি যিনি তোমাদের আমার আয়াত পাঠ করে শোনান, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদের কেতাবে পারদর্শী করেন ও কলাকৌশল শিক্ষা দেন এবং আরও এমন সব জিনিস শেখান যা তোমাদের অজ্ঞাত ছিল (অর্থাৎ নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান শেখান)

১৫২. কাজেই আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

নোট ঃ

কাবাকেন্দ্রিক ইবরাহিনী জীবনাদর্শের ধারক-বাহকরা ইমামতের অধিকারী হবে। এটাই বাস্তবসম্মত ঐশী সিদ্ধান্ত। যারা ব্রাহ্মাদর্শ অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথায় কান দেবার দরকার নেই। মুসলমানদের কেবল আল্লার সিদ্ধান্ত অটলভাবে কার্যকরী করা উচিত। এতে আল্লার সব নেয়ামতলাভে তারা ধন্য হবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে। মহানবী হচ্ছেন আল্লার অন্যতম নিয়ামত। পূর্ণ নিয়ামত পেতে হলে রসূলের (দঃ) শিক্ষানুযায়ী কোরানে পারদর্শী হতে হবে, জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, জ্ঞানবিজ্ঞান ও কলা কৌশল শিখতে হবে। এসব আল্লাকে স্মরণ করার পন্থা। এই পন্থায় অগ্রসর হলে আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি অনুগ্রহশীল হবেন। আল্লার নেয়ামত নবী ও কেতাব। এ যারা পেয়েছে তাদের আল্লার প্রতি কজের মাধ্যমে শোকরগুজার হওয়া প্রয়োজন আর তা না করা হলে এ হবে নেয়ামতের প্রতি না-শোকর। এটা আল্লার গজবের পথ প্রশস্ত করে। যারা পার্থিব স্বার্থে মগ্ন হয়ে আল্লার কেতাবকে কার্যকরী করার ব্যাপারে অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তারা গাইগরুর মতো কাজ করে। ইহুদীরা এমনটা করেছিল ফলে তারা নেতৃত্ব হারায়। মুসলমানরা যাতে এমনটা না করে তার জন্যই এই সতর্কবাণী। বতমানে মুসলমানরা ত্রটি করেই বসেছে। আবার কেতাব ও নবীকে দলীল করে সত্যের সাক্ষ্যদাতা না হওয়া পর্যন্ত গোলামী যাবে না।

উনবিংশ রুকু

১৫৩. হে ঈমানদারগণ সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন

১৫৪. যারা আল্লার পথে নিহত হয় তাদের মৃত বলোনা বরং তারা অমর কিন্তু তোমাদের কাছে তা বোধগম্য নয়

১৫৫. আর নিশ্চই আমরা ভয়ভীতি, ক্ষুধা অনাহার, জানমাল ও শস্যাদির ক্ষতিদ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। সাবেরীনদের জন্য সুসংবাদ

১৫৬. যারা মুসিবত এলে বলে 'আমরা আল্লার জন্য এবং আল্লার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে

১৫৭. তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের উপর সালাত বর্ষিত হবে এবং তারাই সত্যানুসারী হবে

১৫৮. নিসন্দেহে সাফা-মারওয়া আল্লার নিদর্শন সমূহের মধ্যে গণ্য। যে কেউ কাবায় হজ ও উমরাহ করে তাদের এই পাহাড় দ্বয়ের মাঝে দৌড়দোড়ি করায় কোন গুনাহ নেই। যে কেউ সাগ্রহে কোন কল্যাণকর কাজ করে সে নিশ্চয়ই আল্লাকে গুণগ্রাহী ও মূল্যদানকারী হিসাবে পাবে।

১৫৯. মানবজাতিকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য যে সব সুস্পষ্ট নির্দেশানাদি কেতাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা যারা গোপন করে তারা আল্লার লানৎপ্রাপ্ত হবে এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে অন্যান্য অভিশাপকারীদের দ্বারাও।

১৬০. তারা ছাড়া যারা প্রত্যাবর্তন করবে ও নিজেদের সংস্কার সংশোধন করবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করবে আমিও তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। আমি তাওয়াবুর রহীম (ক্ষমাশীল, দাতা)

১৬১. কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং প্রত্যাখ্যানকারী হিসাবে মারা যাবে তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলের লানৎ (অভিশাপ) পড়বে

১৬২. সেই অভিশপ্ত অবস্থায় তারা থাকবে, তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবেনা এবং তাদের কোন অবকাশও দেওয়া হবেনা।

১৬৩. তোমাদের ইলাহ এক অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া কোন রহমানুর রহীম (দয়াবান দাতা) নেই।

নোট ঃ

কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায়না। ঐশী দায়িত্ব পালনে কষ্ট আছে। ঈমানদারদের অর্থাৎ সত্যগ্রহণকারীদের সবর বা কষ্টসহিষ্ণুতার মাধ্যমে ঐশী দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হবে। কেতাবের নির্দেশ, নবী ও নেতার নিদের্শের বাস্তবায়ন কষ্টকর কাজ। আত্মসুখ বিসর্জন না দিলে একাজ করা যায় না আবার সালাত বা নামাজের মাধ্যমে আল্লার অনুগ্রহ সন্ধানে প্রয়াসী না হলেও একাজ সম্ভব নয়। যারা আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সাধনা ও সংগ্রাম করবে আল্লাহ তাদের সাহায্য করার জন্য সাথে থাকবেন। সূরা ফাতেহায় মোমেন যে অঙ্গীকার করেছিল এ তার ব্যাখ্যা। সেখানে বলা হয়েছিল আপনার দাসত্ব করি, আপনার সাহায্য চাই। সাহায্যের শর্ত হচ্ছে দাসত্ব। দাসত্ব করার কষ্টটাই সবর। আল্লার রাস্তায় শ্রম মেহনত করলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন। আরও কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তুলবেন, আরও অধিক কর্মশক্তি দান করবেন। তাকে কর্মী করে গড়ে তুলবেন, কর্মের উপাদানও যুগিয়ে দেবেন। রাতদিন কাজ আর প্রার্থনা করলে আমিত্ব, অহং, স্বেচ্ছাচার, হেমাকত খতম হয়ে খোদাপ্রীতি ও খোদাভীতি জেগে যাবে। তারা আল্লার রাস্তায় সাধারণ কষ্ট তো দূরের কথা, মৃত্যুবরণের কষ্টও হাসিমুখে বরদাস্ত করবে। অমরত্ব লাভের উপায়ই এই। মরজীবনকে অমর করতে হলে, অমরলোক লাভ করতে হলে ভয় ভীতি, ক্ষুধা অনাহার, জানমাল, আয় উপার্জনের ক্ষতি বরদাস্ত করেই অগ্রসর হতে হবে। এগুলোই পরীক্ষা। সবর না থাকলে এ পরীক্ষা দেওয়া যায়না। সাবেরীন বা কষ্টসহিষ্ণুদের জন্য সুসংবাদ, যারা বিপদ মুসিবতেও পিছপা হয়না তাদের জন্য অমরলোকের সুসংবাদ রয়েছে। তাদের উপর আল্লাহ স্বয়ং সালাত বা অনুগ্রহের আদেশ দেন দেবতাদের। বান্দাহ ও আল্লাহ উভয়ের জন্য সালাত শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বান্দা সালাতে বিনয় নম্রতা প্রদর্শন করে। অহং বিসর্জন দিয়ে, নত প্রণত হয়

তাঁর আদেশ শিরোধার্য করার জন্য আর আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে বান্দার উপর তাঁর কৃপা বর্ষণ করে বড়ত্ব জাহির করেন। বান্দার ইচ্ছা ও আল্লার ইচ্ছা মিলে যায়। রহমান রহীম ও আবদুর রহমান, আবদুর রহীম এক হয়ে যায়। এই হচ্ছে ব্রহ্মার পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ফানাফিল্লাহ। এটা হলো ইব্রাহিমী জীবনপদ্ধতি। পূজারী ব্রাহ্মণ চরম শের্ক করে পরম সত্তায় লীন হওয়ার যে দাবী করে তা মিথ্যা দাবী। রহমানুর রহীমের সাথে কারও দৈহিক সম্পর্ক নেই, আত্মিক সম্পর্কও পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত নয়, বরং মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের মত। এজন্য বলা হয়েছে শ্রমিক আল্লার বন্ধু বা প্রিয়। এধরনের শ্রমিকরা মনের আগ্রহ সহকারে যে কল্যাণমূলক কাজই করবে আল্লাহ তার মূল্য ও মর্যাদা দেবেন।

কেতাবের নির্দেশাবলী শ্রম মেহনতের ফলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রম ও সাধনার অভাবেই এগুলো জীবন্ত হওয়ার বদলে মৃতবৎ হয়ে যায়। ঈমানদাররা যখন দুনিয়া অর্জনে শ্রম মেহনতে মেতে যায় তখন সে আত্মভোলা হয়ে আল্লাভোলা হয়ে যায়। আল্লার অনুগ্রহ যা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল তা হাতছাড়া হতে থাকে, আল্লার অভিশাপে শেষ পর্যন্ত জাতি অহল্যত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এহেন অবস্থায়ও আল্লাহ এই ভ্রান্তপথ পরিহারকারী জাতি যে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে আল্লাহ পাক সে জাতিকে ক্ষমা করেন আবার অনুগ্রহবর্ষণ করেন, ইমামত দান করেন কেননা তিনিও তওয়াবুর রহীম।

কিন্তু যারা এই ইব্রাহিমী নীতি অবলম্বন না করে আযরের আর্যনীতি গ্রহণ করে, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর মৃত্যুবরণ করে, বিজ্ঞতার পথ পরিহার করে অজ্ঞতার পথে শুধু শোষণ করতে থাকে, চুষতে থাকে, ইহুদীবাদীদের মতো শাইলক হয়, ভাঁড়ুদত্তের মতো বেণে হয়, ফরহাদের মতো নির্বোধ শ্রমিক হয় তাহলে দুনিয়ায় ষ্টালিন ও হিটলার তুল্য জালেম শাসককে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হবে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মতো রহমদীল শাসক তার নসীবে হবেনা। এ হচ্ছে ইহকালীন শাস্তি আর পরকালে আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র সৃষ্টির অভিশাপে তাদের শাস্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

তোমাদের ইলাহ আল্লাহ, তোমার অহংও তোমার ইলাহ নয়। তিনি দয়াবান ও দাতা আর অহং অগুন। সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব এক সম্মানজনক কষ্টসাধ্য গুরুদায়িত্বের পদ তবে আল্লাহ যেহেতু মেহেরবান তাই তিনি ফেরাউন, হিটলার মুসোলিনী, স্টালিনের মত শ্রমশিবির চান না, তিনি চান মুক্ত শ্রমিক, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তিনি চাপান না, আবার সাহায্য চাইলেও দেন। সুতরাং তার দয়ায় আস্থা রেখে কাজ করা উচিত। তিনি এত মেহেরবান যে বান্দার স্বেচ্ছা শ্রমের তিনি শোকরগুজার বলে উল্লেখ করেছেন। সুবহানাল্লাহ ! তাঁর শোকরগুজার হওয়ার অর্থ তিনি পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক, ফাও, পুরস্কার ইত্যাদি দেবেন। তাই বনি ইসরাইলী নির্বোধদের মতো নেয়ামতকে কুফরীতে, অকৃতজ্ঞতায় বদলে ফেলা উচিত নয় বরং কৃতজ্ঞ চিত্তে নম্রতার সংগে নামাজ পড়তে পড়তে সাধনা ও সংগ্রাম করা উচিত।

কা[illegible] বায়তুল মুকাদ্দস উভয়ই নবী ও নবীর অনুচরদের দখলে এসেছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইহু[illegible]দের উপর মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল সবর ও সালাতের দ্বারা।

মক্কার খোদাবিরোধী পূজারী ব্রাহ্মণ ও মাদিনার নবী বিরোধী ইহুদীরা মক্কা ও মাদিনাতেই অহল্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তারা স্বদেশ থেকে উৎখাত হলো কোরান ও সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করার কারণে আর এটা গ্রহণ করার কারণে মক্কা থেকে উৎখাত, মদিনায় ভীত-সন্ত্রস্থ মোহাজের আনসাররা রোম পারস্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেল। আল্লার এই বিধান চিরন্তন বিধান। সত্যিকার আবদুর রহমান ও রহীম হলেই প্রাচ্য পাশ্চাত্য কাবার মালিকের অনুচরদের হাতে আসবে কারণ প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবই আল্লার আর গাইগরু কিংবা এঁড়েগুরু হলে কিংবা কলুর বলদ হলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কলুর ঘানি টানতে হবে।

বিংশ রুকু

১৬৪. (আল্লাহ যে রহমানুরহীম) তার প্রমাণ রয়েছে আসমান যমীন সৃষ্টিতে দিনরাত্রির অব্যাহত আবর্তনে, মানব সেবায় নিয়োজিত ভাসমান জলযানে, আসমান থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারায় যার সাহায্যে মৃত যমীন প্রাণবন্ত এবং এই ব্যবস্থার বদৌলতে প্রাণীকুলকে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেন, বায়ুপ্রবাহে ও আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য

১৬৫. কিন্তু এতদসত্বেও কিছু (আহাম্মক) লোক অন্যদেরকে আল্লার বিকল্প খাড়া করে এবং তাদের আল্লার মত ভালবাসে। ঈমানদারদের উচিত আল্লাকে তাদের থেকেও বেশী ভালবাসা। আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক ও আযাব দানেও কঠোর এটা আযাব দানের সময় তারা অনুধাবন করবে সেই অনুধাবন যদি আজ করতো (তাহলে কতই না ভাল হতো)

১৬৬-১৬৭. আল্লাহ যখন শাস্তি দেবেন তখন মিথ্যা বিকল্প খোদাসৃষ্টিকারী নেতৃবর্গ তাদের অনুগামীদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করলেও আযাব থেকে রেহাই পাবেনা, তাদের মধ্যেকার উপায় উপকরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তাদের দাসেরা (শূদ্ররা) বলবে আর একবার সুযোগ পেলে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দেবে। তাদের কার্যকলাপ তাদের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করা হবে যে তারা কেবল হায় হায় করতে থাকবে কিন্তু নরকের নার থেকে বের হবার পথ পাবেনা।

ব্যাখ্যা ঃ

ব্রাহ্মণ থেকে মহমেডান মুনাফেক নেতা ও অনুগামী সকলেই ব্রহ্মার মত একনিষ্ঠ ভাবে রহমানরহীমকে না মানার কারণে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে কারণ তারা আল্লার পরিবর্তে ঠাকুর দেবতা পূজারী, রাজা বাদশা পূজারী ও প্রকৃতি পূজারী হয়ে গিয়েছিল।

তারা আক্কেল বুদ্ধিকে কাজে লাগায়নি, তারা আমানি চামানি করে খামখেয়ালীপনাকে

প্রকৃত জীবনাচরণ প্রণালী বলে চালাতো। তারা ধার্মিক ছিলনা, ছিল ধর্মব্যবসায়ী, বিকল্প ধর্ম সৃষ্টিকারী, অপধর্মের স্রষ্টা। তাদের নেতৃত্ব মেনে যারা অপধর্মকে মেনে নিয়েছে তাদের রেহাই হবেনা আর তাদের প্রভুদের রেহাইপাবার তো প্রশ্নই ওঠেনা অথচ এই পুরোহিত পাদরী পোপ রাব্বি, রাহাবর, দরবেশ ও সাধুসন্ন্যাসীরা, মোল্লাপন্থীরা তাদের স্বার্থে আমজনতাকে মুক্তির জন্য কতই না সস্তা পথ প্রদর্শন করে রেখে নিজেরা জনগণের খোদা হয়ে বসে রয়েছে। তারা আগুনে জ্বলবেনা এমনকি তাদের সাগরেদরাও না এ হচ্ছে তাদের দাবী। অথচ এ ধরনের গ্যারান্টি কোথাও নেই, কোথাও এমন গায়রুল্লার গোলাম হয়ে না বুঝে কলমা পড়ো, নামাজ পড়ো, রোজা রাখ আর নাচতে নাচতে বেহেশতে যাও না। ঠাকুর দেবতা মানা যেমন শের্ক, রাজা মহারাজা শাসকগোষ্ঠীকে মানাও তেমনি শের্ক। এসব ব্রাহ্মণ্যবাদ ইহুদীবাদের অবদান, নাচার দাসত্ববাদ বা শূদ্রত্ববাদও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। প্রভু-ভৃত্য কেউ ক্ষমা পাবেনা। বারাত ঘোষণা না করেও রাবতা বা যোগ-সংযোগ রাখলেই সর্বনাশ। এ হুঁশ লোকদের হবে শেষ বিচারের দিনে আযাবের বহর দেখে অথচ সেদিন বারাত ঘোষণায় কোন ফল হবেনা। এটা ইহকালেই হওয়া উচিত। ইবরাহীম ইহকালেই ঠাকুরদেবতা, শাসক সম্প্রদায়, রাজা মহারাজাদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে আল্লার জন্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। পূজারীরা যেমন ঠাকুর দেবতাকে ভালবাসতো তিনি তাদের চেয়েও আল্লাকে বেশ ভালবেসে ছিলেন। আল্লাহ আজ তথাকথিত ঈমানদারদের কাছে খোলামকুচির থেকেও মূল্যহীন। আল্লাহওয়ালাদের সাথেই বারাত ঘোষণা করা হচ্ছে যেমন ইহুদীরা করেছিল, বারাত ঘোষণা না করলে বরাত খুলবে না। রবের সাথে রাবতা (যোগ-সংযোগ) না হলে সবই বিফল। খোদাদ্রোহীদের সম্পর্ক থাকে রবের বর (আশীর্বাদ) পার্থিবপরতার সাথে, রবের সাথে নয়। প্রকৃত সম্পর্ক থাকতে হবে রহমানুর রহীম রবের সাথে, গায়রুল্লা ও তার পৃষ্ঠপোষকদের সাথে থাকতে হবে বারাত (সম্পর্কহীনতা) তাহলে বরাত ধ্বংস হবে না অন্যথায় কপালপোড়া হয়ে আক্ষেপ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একুশ রুকু

১৬৮. হে মানবজাতি পৃথিবীতে যে সব হালাল ও পবিত্র জিনিস রয়েছে তা খাও এবং শয়তানের পথে চলোনা নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু

১৬৯. সে তোমাদের মন্দ কাজ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেয় আর আল্লার নামে এমন কথা বলার নির্দেশ দেয় যা তোমাদের অজ্ঞাত

১৭০. তাদের যখন বলা হয় আল্লার বিধান মেনে চলো তখন তারা বলে আমরা বাপদাদাদের ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে চলবো কিন্তু তারা যদি বে-আক্কেলের মতো চলে থাকে এবং বিপথগামী হয় তাহলেও (তাদের পথে চলতে হবে)

১৭১. আল্লার প্রদর্শিত পথে যারা চলতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত সেই

পশুদের মতো যাদের কানে তাদের রক্ষকের (রাখালের) হাঁকডাকের আওয়াজ ছাড়া কিছুই পৌঁছায়না। তারা কালা, বোবা, অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারেনা।

১৭২. হে ঈমানদারগণ যদি আবেদ হও তাহলে পবিত্র দ্রব্যাদি খাও যা রুজী হিসাবে আমি প্রদান করেছি এবং আল্লার প্রতি শোকরগোজর হও

১৭৩. তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃতদেহ, রক্ত, শূয়োরের মাংস এবং গায়রুল্লার নামে উৎসর্গীকৃত বস্তু কিন্তু যে ব্যক্তি নাচার, অবাধ্য নয় তাহলে পাপ বর্তাবেনা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গাফুরুর রহীম

১৭৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় কিতাবে যেসব বিধিনিষেধ নাযিল করেছেন যারা তা সামান্য (পার্থিব) স্বার্থের বিনিময়ে গোপন করে তারা নিজেদের উদরপূর্তি করে আগুন দ্বারা। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের নির্দোষ বলেও ঘোষণা করবেন না বরং তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে আযাবুন আলীম বা কঠিন শাস্তি।

১৭৫. এরাই সুপথের বদলে আগুনের কষ্ট সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

১৭৬. আল্লাহ তো সত্যবিধানসহ কেতাব নাযিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবের বিধানের অনুবর্তী হতে রাজী হয়নি তারা সত্য থেকে বহুদূরে চলে গেছে।

নোট ঃ

শয়তান প্রথমে আল্লার বিকল্প তৈরী করেছে এবং বিকল্প ব্যবস্থার পরিচালক ও পৃষ্ঠাপোষক গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক শাসকগোষ্ঠী তৈরী করেছে এবং রবের সাথে বারাত ঘোষণা করে তার বরের (পার্থিব সম্পদের) সাথে রাবতা (সংযোগ) কায়েম করেছে। অতঃপর হালাল হারামের বিধানদাতা সেজে হালালকে হারাম করেছে এবং হারামকে হালাল করেছে, নিষিদ্ধ ও অশ্লীল কাজের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্রষ্টা সম্পর্কে উদ্ভট কথা বলে বেড়িয়েছে যার স্বপক্ষে কোন ঐশী দলিল নেই। শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে এভাবে গোপন থেকে প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। বাপদাদার নামে, ঐতিহ্য পরম্পরার নামে, পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধভক্তির কারণে লোকেরা এসব কুসংস্কারের শিকার হয়েছে। এসব জন্তু-জানোয়ারের পাল, রাখালের হাঁকডাকে চলে। তাদের কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছুই নেই। এই ভেঁড়ার পাল কালা-বোবা-অন্ধের ন্যায়। প্রথম রুকুতে এই কালাবোবাদের উল্লেখ রয়েছে। তারা নিজের ভালমন্দও বোঝেনা। এদের বোঝান না বোঝান সমান। কোন সংস্কার আন্দোলন এদের মাঝে দানা বাঁধতে পারেনা। এরা শয়তানের কাব্য কবিতাকে শাস্ত্র আখ্যা দিয়ে শাস্তি গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ঈমানদারদের শয়তানের শাস্ত্রাদি বর্জন করে, গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক শাসকদের বিধান

অগ্রাহ্য করে, শের্ক ও বেদাত অগ্রাহ্য করে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী আবেদ হয়ে সংস্কার আন্দোলনের পতাকা বহন করতে হবে। শালীন, সভ্যভব্য, হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করতে হবে এবং আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে যাতে গুপ্ত আল্লাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়। চারটে জিনিস মড়া, রক্তবীর্য, শূকর মাংস, গায়রুল্লার প্রাসাদ বা তার নামে জবেহকৃত হালাল প্রাণী হালাল হলেও তা অপবিত্র। এজন্য হালাল ও পবিত্র দুটো শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাংঘাতিক অসুবিধার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে হারামের জন্য ব্যতিক্রমধর্মীছাড় আছে যে অবাধ্য নয় তার জন্য। আল্লাহ তার এই দোষ উপেক্ষা করবেন কেননা মুত্তাকীর জন্য তিনি বিবেচক যদি বান্দা মুত্তাকী হয় তাহলে রহিম এই কাঠিন্যের পর হালাল খাদ্যের সন্ধান দেবেন।

কিন্তু যারা ধৃষ্টতার নীতি অবলম্বন করে, বাহানাবাজী করে হারামকে হালাল করে, সংশোধনের পরিবর্তে শয়তানের রাস্তা খুলে দেয় তাদের পেটই হবে নরক। পেটের কারণে এই গো-পালকরা বাঁধা পড়বে, তাদের ওজর শোনা হবেনা, তারা হারামখোর, তাদের অবশ্য অবশ্য শাস্তি দেওয়া হবে। সুপথের পরিবর্তে কুপথগামী, ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির শিকার হবে। এরা কেতাবের যথার্থ অনুসারী নয়। এরা কেতাবের ভারবাহী গাধা। এরা গোটা কেতাবকেই নাচারীর দোহাই দিয়ে তাকে তুলে রাখে, এরা সংস্কার আন্দোলনের পথের কাঁটা। এরা পথভ্রষ্ট। সূরা ফাতেহায় এই পথভ্রষ্টদের পথ থেকে পানাহ চাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই সূরার দ্বিতীয় রুকুতে এই কালা-বোবা-অন্ধদের কথা বলা হয়েছে। এরা আবেদ নয়, নাস নয়, ইনসান নয় বরং নর বা নরপশু আর আবেদরা হচ্ছে নাস যারা দেবতানন্দিত। রুকুর শুরুতেই শয়তান বা দানববিরোধী এই মানুষদের সম্বোধন করা হয়েছে।

২২ রুকু

১৭৭. প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কল্যাণ রয়েছে (কাবাপন্থী হওয়ার মধ্যে) যারা আল্লাহ, আখেরাতের দিন, ফেরেশতার আল্লার কেতাব ও নবীদেরকে মনেপ্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধনমালকে আত্মীয় কুটুম, এতিম-অনাথ, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে এবং নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, ওয়াদা চুক্তি পালন করবে, বিপদ-আপদ ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দে কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে তারাই সাচ্চা, তারাই মুত্তাকী।

১৭৮. হে ঈমানদার সমাজ (প্রকৃত মানবসমাজ) তোমাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে দণ্ড সমতার নীতি নির্ধারিত করা হলো, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী তবে কোন হত্যাকারীর ব্যাপারে যদি তার ভাই মমতাপূর্ণ আচরণ করতে চায় তাহলে যুক্তিসংগত রক্তপণ দাবী করতে পারে এবং তা

কৃতজ্ঞতার সাথে পূরণ করা উচিত। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এই দণ্ডহ্রাস ও অনুগ্রহ। এর পরেও যারা সীমালংঘন করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

১৭৯. হে প্রজ্ঞাবান সমাজ দণ্ডসমতার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন যাতে তোমরা সংযত হতে পার

১৮০. মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে এবং ধনসম্পত্তি পিছনে ফেলে গেলে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটা মুত্তাকীদের জন্য প্রাধিকার

১৮১. এই অসিয়ত শোনার পর যারা তার পবির্তন করবে তারা দায়ী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন

১৮২. কিন্তু কেউ যদি অসিয়তের মধ্যে হকতালাফি লক্ষ্য করে তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে সে ব্যাপারে সুষ্ঠতাবিধানে কোন দোষ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ গাফুরুর রহীম (ক্ষমাশীল ও করুণাময়)।

ব্যাখ্যা

প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব অত্যন্ত পুরানো। প্রাচ্য শের্কবাদী ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী। প্রাচ্যের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ও পাশ্চাত্যের উপর ইহুদীবাদীদের প্রভাব রয়েছে। এরা মুসলিম বা শান্তিবাদী বা কাবার নির্মাতা ব্রহ্ম-বিষ্ণুর মতো কেবলমাত্র কাবার মালিকের পূজারী হতে রাজী নয়, খুব বেশী হলেও এরা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাতে রাজী হয় কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র মক্কা ও মানবতার কেন্দ্র কাবামুখী হতে রাজী নয়। তাই কাবার প্রভুমুখী হওয়া, ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া, ফেরেশতার দৌততা মেনে নেওয়া, কেতাব ও নবীদের অকুন্ঠচিত্তে মেনে নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এসব মেনে নেওয়ার বাস্তব প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারিক সমতানীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সমতা ও ব্যবহারিক সমতার পরে দণ্ডসমতার নীতি ঘোষিত হয়েছে অতঃপর ধনসমতার নীতির কথা বলা হয়েছে।

আর্য ব্রাহ্মণ ও ইহুদীরা ধর্মসমতার নীত পরিহার করেছিল কারণ তাদের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীরুতা ছিলনা, এমনকি তারা খোদার বিকল্প মিথ্যাখোদা তৈরী করতো এবং এই মিথ্যা খোদার নামে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আর এই সমাজ ব্যবস্থার নাম দিয়েছিল বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা। একে আরও বৈষম্যমূলক ও অত্যাচারমূলক বানানো হয়েছিল পৌরাণিক যুগে। দেবতার নামে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা মানুষের খোদা হয়ে বসেছিল, মানুষ মানুষে বৈষম্যকে জাতিভেদের মাধ্যমে স্থায়ীরূপ দেওয়া হয়েছিল, লিঙ্গ বৈষম্যের মাধ্যমে নারীদের শূদ্রাণী, পণ্যসামগ্রী বানানো হয়েছিল, কুলটা রমণীদের পূজ্য বানিয়ে তাদের নরহত্যার কাজে লাগানো হতো, বেণেদের মাধ্যমে শূদ্রকে (দাসকে) শোষণ করে আকাশচুম্বী ধনবৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। শূদ্র ও শূদ্রাণীদের কোন সহায় সম্পদ ছিলনা, তাদের জীবনের

কোন দাম ছিলনা, ব্রাহ্মণের সাতখুন মাফ ছিল, মন্দিরে দেবতার নামে শূদ্রাণীদের দেবদাসী বানিয়ে ধর্ষণের পর্যাপ্ত অধিকার ছিল। সিভিল আইন তো দূরের কথা ইউনিফর্ম ফৌজদারী আইনও ছিলনা। একই অপরাধে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির নীতি ছিল, তথাকথিত ছোটজাতদের লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হতো, মিশর, পারস্য, রোম সর্বত্রই দাস ও নারীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। পবিত্র কোরান ধর্মসমতা, ব্যবহারিক সমতা, দণ্ডসমতা ও বৈষয়িক সমতার নীতি প্রদান করে এক সাম্যমূলক মানবীয় সমাজ গঠনের ডাক দেয়। তাই লাটসাহেব হলেও হত্যাকারী হলে তারও যে ব্যবস্থা, শূদ্র দাস হলেও তারও সেই ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়। নরনারীর ক্ষেত্রেও একই বিধান তবে এ আইন চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁতের মতো কঠোর, মায়া মমতাহীন ইহুদী আইন নয়। তাই এর মধ্যে মুক্তিপণের মাধ্যমে কোমলতার অবকাশ রাখা হয়েছে। এ কোমল কঠোরতার প্রান্তিকতা বর্জিত মধ্যমপন্থা। এতেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির জীবনের নিরাপত্তা ও সাধুতা। এই সাধুতার নীতি যারা লংঘন করবে সেই সাধুবেশী অসাধুদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ওসিয়তের মাধ্যমে ধনসমতার সূচনা করা হয় অতঃপর মীরাসী বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত শরীয়তী আইন প্রবর্তন করে নরনারীর মধ্যেও বৈষয়িক আইনে সমতাবিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতেও বাড়াবাড়ি রোধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মুত্তাকীদের বা সাধুদের আইনের বাইরেও সাধুতা প্রদর্শনের সুযোগ রাখা হয়েছে। যারা পিতামাতার অবর্তমানে শরীয়তী আইনের কারণে বঞ্চিত হয়েছে তাদের দাদা-দাদীরা নানা-নানীরা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অসিয়তের সুযোগ গ্রহণ করে সমতা বিধান করতে পারে। এটা মুত্তাকীদের অধিকার। এর প্রয়োগ হওয়া উচিত। উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে ভূদেবতাদের জমিদারীপ্রথার উপর আঘাত হানা হয়েছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যপন্থীরা এই ভারসাম্যমূলক আইনের যৌক্তিকতা আজও উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা বরং সংস্কারের নামে, সাম্যের নামে এই ভারসাম্যযুক্ত আইনকে লণ্ডভণ্ড করে প্রান্তিকতার পানে ফিরে যেতে চায়, নয়া দেশাচার, লোকাচারমূলক লৌকিক আইন কায়েম করতে চায়। তারা মুসলেমুন বা সংস্কারপন্থী সাধু নয় বরং সংস্কারের নামে মুফসেদুন ফ্যাসিষ্ট। ফ্যাসিষ্টদের প্রতিরোধের জন্য সংস্কারকামীদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই সংস্কারমূলক আইন যখন প্রবর্তন করা হয় তখন কাবার প্রভুর দিকে মুখ ফিরান হয় তখনও নফসপূজক পেটপূজকদের আপত্তি ছিল, এখনও রয়েছে, আগামীতেও থাকবে।

২৩ রুকু

১৮৩ হে ঈমানদারগণ (হে সাধুসমাজ) তোমাদের উপরে সিয়াম (সংযম) ফরজ করে দেওয়া হলো যেমন পূর্ববর্তী (সাধুসমাজের) উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তাকওয়া (পার্থিবপরতার বদলে পরিণামদর্শিতা) জাগ্রত হয়

১৮৪ এ মেয়াদি সংযম। কেউ যদি রোগাক্রান্ত বা মুসাফির হয় তাহলে সে যেন

পরে মীয়াদ পূর্ণ করে। যারা সামর্থ সত্ত্বেও রোজা রাখবেনা তাদের বিনিময় মূল্য দিতে হবে এবং তা হবে একজন মিসকিনকে খাওয়ানো কিন্তু যে কেউ সাগ্রহে বেশী কল্যাণ দান করবে তা তার জন্যে উত্তম। কিন্তু প্রজ্ঞার দাবি এর থেকেও উত্তম রোজা রাখা

১৮৫. রোমজানের মাস, (আত্মশুদ্ধির মাস) এ মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছিল মানব জাতির জন্য সুপথ, বিবর্তিত বিস্তৃত সুপথ ও মন্দকে বর্জনকারী মানদণ্ডসহ। কাজেই যে ব্যক্তি এই মাসকে প্রত্যক্ষ করবে তার রোজা রাখা চাই কিন্তু যারা রোগাক্রান্ত কিংবা বিদেশে সফররত তারা পরে পূর্ণ মেয়াদ পূর্ণ করবে। আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন, কঠোরতা পছন্দ করেন না, তাই পরে মেয়াদ পূর্ণ করার অবকাশ রাখা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের যে সাধুতার নীতি দান করেছেন সে জন্য তোমাদের তরফ থেকে জয়ধ্বনি দেওয়া উচিত ও তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

১৮৬. যখন আবেদরা (সাধুরা) আমার সম্পর্কে জানতে চায় তখন তাদের জানাও যে আমি তাদের কাছেই আছি, যে আমাকে ডাকে আমি তার জবাব দিই কাজেই তাদের আমার ডাকে সাড়া দেওয়া দরকার, আমার উপর আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন যাতে তারা সত্যপথের পথিক হতে পারে।

১৮৭. রোজার মাসে রাতের বেলায় তোমাদের পবিত্র স্ত্রীদের নিকট যাবার অনুমতি রইলো কারণ তোমরা পরস্পরের পোষাক আল্লাহ জানেন তোমরা গোপনে (সাধুতার ছদ্মবেশে) কি কর কিন্তু তিনি উপেক্ষা করেছেন ও তোমাদের ক্ষমা করেছেন এখন তাদের সাথে বাসর কর এবং তা অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং খাও দাও যতক্ষণ না বাইরে কালো কাফন ভেদ করে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা বা সংযম অবলম্বন কর। মসজিদে এতেকাফের সময় স্ত্রীদের সাথে বাসর কোর না। এ হচ্ছে খোদানির্ধারিত (সাধুতার) সীমা, এর ধারেকাছেও যেওনা। এভাবে আল্লাহ সাধুসমাজের জন্য খোদাপ্রাপ্তির পথ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা (শয়তানের প্রদর্শিত পথ থেকে) বেঁচে যাও।

১৮৮. পরস্পরের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ কোরনা, অন্যদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রাপ্যসম্পদ শাসকদের হাত করে আইনের মাধ্যমে হালাল করে পাপাচারী হয়োনা যদি তোমরা জ্ঞানী হও।

ব্যাখ্যা

২৩ রুকুতে আধ্যাত্মিক তামাসিকতা ও জাগতিক বৈষম্য খতম করে ২৪ রুকুতে সভ্যতা সংস্কৃতি সাধুতা এক কথায় উত্তম আধ্যাত্মিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। সাধুতার জন্য সংযম আবশ্যক। সাধু হতে গিয়ে লোক সন্ন্যাসী (নিত্য সাধু) হয়ে গেছে। নাস বা মানুষই হয়নি অতিমানুষ হয়েছে এবং সব সময়ের জন্যে হয়েছে। তার মধ্যে কোন বিরতি নেই। এটা প্রাচ্যে সাধুতার বাড়াবাড়ি। এ বৈরাগ্যবাদ সামাজিক জীবনের পরিপন্থী। এতে নারীবিদ্বেষ জাগ্রত হয়, কামিনী কাঞ্চন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এতে জীবনের নেতিবাচক দিক এত প্রবল যে ইতিবাচক দিক খতম হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে জীবনের ইতিবাচক দিকের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা হয় ফলে তা আদল ইনসাফের সভ্যতা সুরুচির সীমা অতিক্রম করে কুরুচিকর মস্তানীতে পরিণত হয়। মদ, মাংস, মাগী (নারী) নিয়ে নারীদের নামে মাগীবাজী আন্দোলন শুরু হয়। বদমাশদের জন্য আইনকে নমনীয় করা হয়, সাধুদের সংযমীদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়। হুদুদ আইনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। নেসা (পবিত্র স্ত্রী) নয় বাঈজীরা পূজ্য হয়ে ওঠে। মাতৃত্ব খতম হয়। তাদের পরিণামদর্শিতা থাকেনা। তাই রোজা বা সংযম সাধনার মাধ্যমে পরিণামদর্শিতা জাগ্রত করতে বলা হয়েছে। সন্ন্যাসী হওয়াটা অপরিণামদর্শিতা, নিত্য সাধুতার মধ্যে ক্ষতি আছে। তাই মেয়াদী সাধুতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় প্রান্তিকতা থেকে নয়া সাধুসমাজকে আত্মরক্ষা করতে বলা হয়েছে কারণ এই অতি-আধ্যাত্মিকতা চোর বানায়। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। যে রোগী তাকে যোগী হতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ভোগী তাকে যোগী হতে বলা হয়েছে রোজা বা সংযম পালনের মধ্য দিয়ে অন্যথায় গরীব রোজাদারকে খাদ্য যোগান দিতে বলা হয়েছে। খেলে খাওয়াতে হবে, ভোগের অন্ন ভাগাভাগি করে খেতে হবে কিন্তু কেউ যদি ভাগাভাগির অতিরিক্ত দেয়, সে তো আরও উত্তম কিন্তু সর্বোত্তম হচ্ছে নিজে হালাল বস্তু দিনে পরিহার করা।

রমযান প্রবৃত্তিদমনের, ভোগকে সংযমের মধ্যে আনার মাস। এ মাসেই কেতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এই কারণেই কোরানও নাজিল হয়েছে। এতে সাধুদের জন্য সুপথ আছে, আছে তার বিবর্তিত বিস্তৃত রূপ, বিকৃত রূপকে বাদ দিয়ে সংস্কৃত রূপ। রমযান মাস এলে তাই রোজা পালন করতে হবে কিন্তু চোখ বুজে আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে হবে তা নয়। রোগী, মুসাফির ও অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সাময়িক ছাড় রয়েছে পরে পূর্ণ করার শর্তে। এই সংযম সাধনা বারোমাসের মধ্যে কেবল একটা মাসই ফরজ, বারোমাস বাধ্যতামূলক নয়। আল্লাহপাক কঠোর নন, কোমল। শয়তান খুব কড়া। মানুষকে নিত্য সন্ন্যাসী হবার কুমন্ত্রণা দেয়, বৈরাগ্যবাদী অথবা মস্তান হবার শিক্ষা দেয়। এ মাসেও সকলের জন্য রোজা বাধ্যতামূলক নয়। এককে দিয়ে অপরের মুণ্ডুপাত করায় কিন্তু আল্লাহ চরমতা পছন্দ করেন না। তিনি ভারসাম্য পছন্দ করেন। তাই সাধুসমাজের তার জয়ধ্বনি করা উচিত, উচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা।

যারা বৈদিক সন্ন্যাসী না হয়ে কেতাবের আবেদ হয় তাদের আল্লাকে পাওয়ার জন্য বনে জঙ্গলে যাবার দরকার নেই, আল্লাহ তো মানুষের নিকটেই আছেন। আবেদরা ইবাদতের

মাধ্যমে তাকে ঘরে বসে ডাকলেই পাবে। তাই ঘরে বসে, সভ্যসমাজে থেকে শুদ্ধ সামাজিক জীবনযাপন করে সাময়িকভাবে হালাল ভোগকেও বাদ দিয়ে শুদ্ধচিত্ত হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করলে তা নিশ্চিতই কবুল হবে। আল্লার এ আশ্বাসবাণীতে তাদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত তাহলেই তাদের খোদাপ্রাপ্তি ঘটবে। তারা খোদায় লীন হয়ে যাবেনা, তারা খোদার নৈকট্যলাভ করবে নিজের কর্মোদ্যোগ দ্বারা। এজন্য ন্যাংটো সাধু হবার দরকার নেই যেমন প্রাচ্যের নাগা সন্ন্যাসী ও পশ্চিমের নুড সমাজ হয়েছে।

রমযানের রাতের বেলায় আবেদ আবেদা খাতুনের কাছে যেতে পারে পারস্পরিক ফায়দার জন্য। নইলে অতিসাধুতার ছদ্মবেশে প্রাচ্য পাশচাত্যের সাধুরা মন্দিরে গীর্জায় যা করেছে তা আল্লার জানা আছে। প্রথমদিকে সাহাবাদের মধ্যেও সাধুতার এ রোগ রয়ে গিয়েছিল। তাই খোদা তা উপেক্ষা করেন ও ক্ষমা করেন এবং সাধুতার বোঝা হালকা করেন এবং রমযানের রাতের বেলায় নিশীথ বাসরের অনুমতি দেন দিনের সংযম সাধনের পর যাতে সাধু শালীন সাধু হয় নইলে বৈদিক সন্ন্যাসী হলে, দেবতা হলেও যৌনাচারে জেনায় লিপ্ত হবে। জেনাকেই সভ্যতার নামে জায়েজ করে বসবে, ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিকতার নামে হরিজন উৎপাদন করবে আর তাকে নিত্য সন্ন্যাসিনী সিসটাররা, ভগিনী নিবেদিতারা লালন পালন করবে। ভোগী আর ত্যাগী, প্রস আর আশ্রম হাত ধরাধরি করে চলবে। কুমারী মা আমদানী হবে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আত্মপ্রকাশ করবে, মীরাসী আইনের রদবদল ঘটবে, বিবাহ বন্ধন শিথিল হবে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন লণ্ড ভণ্ড হবে। নিত্য সন্ন্যাসী বেশী হলে নেসারা ঘরবর পাবেনা, তারা আবেদা হতে পারবেনা, বেদোদের ভোগ্য হবে। তবে নিত্যসাধু হতে পারো মাত্র ত্রিশ দিনের দশদিন যখন মসজিদে আবেদা খাতুনদের থেকে দূরে অবস্থান করবে ঘরে না যাবার প্রতিজ্ঞা করে। আবেদা খাতুনও সিসটার হতে চাইলে, নিবেদিতা হতে চাইলে আবেদা হয়ে ঘরের কোণে মাত্র দশদিন তা হতে পারবে, তাই সাধুতার সীমা বেঁধে দেওয়া হলো। এ সীমা ভাঙবার জন্য তার ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। এসব এত বিস্তৃত করে পুংখানুপুংখ বলার কারণ হলো শয়তান প্রদর্শিত সাধুতার পথে যেন লোকেরা পরিক্রমা না করে। শয়তান তো শালীন সভ্য জীবন চায়না, সে তো অসভ্য, অশালীন জীবন চায়, সাধুও বেশ্যার সেবায় ধরা দিয়ে সন্তান উৎপাদন করে বেশ্যার হাত ধরে রাজদরবারে হাজির হয় (দ্রষ্টব্য বেতাল পঞ্চবিংশতি)। সাধু যাতে বেতাল না হয় তাই তাল রাখার জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা। সাধুর তাই আল্লাকে এই সাধুতার নীতি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান উচিত, কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া উচিত অন্ততঃ সব সাধু সন্ন্যাসীদের, সুফী দরবেশদের শয়তানের কুমন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে আল্লার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত।

দিনে সংযমের পর রাতে সহবাস ও খানাপিনা আবার দিন এলেই দিনের মতো শুভ্র জীবনযাপন করে পরমহংস হতে বাধা নেই, এজন্য স্ত্রীকে মাতৃবৎ পরিত্যাগ করতে হবে না, এটা মাত্র দশদিন করা যেতে পারে। তবে ইসলামে পরমহংস হওয়ার বিধান আছে। জেহাদে শহীদ হয়ে পূর্ণসাধু হয়ে যাওয়া। এ বিধান সামনে আছে। ইসলাম সাধুতার জন্য পরের সম্পদ মেরে খাওয়াকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বলে ঘোষণা করেছে। তাই উচ্চবর্ণ সবল বিত্তশালীদের গো-ব্রহ্মণ প্রতিপালক শাসকদের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করে

রাখার পাপাচারকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সাধু হওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হওয়া, সন্ন্যাসীদের জীবেসেবা করার দরকার নেই। জাতির নামে বজ্জাতি করে যে সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা হচ্ছে জাতব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে সম্পদের মালিকদের সম্পদের মালিকানা দিলেই যথার্থ সাধুতার কাজ হবে। আগে রুজী হালাল হতে হবে, তারপরে রোজা রেখে সাধু হতে হবে, জীবেসেবা করতে হবে হালাল সম্পদ দিয়ে, বেণের অবৈধ সম্পদে নয়, ক্ষত্রিয় শাসকের অবৈধ অনুদানে নয়। সন্ন্যাসী ও শাসকের পারস্পরিক সম্পর্ক অবৈধ উপায়ে সম্পদ আহরণের জন্য। বৈরাগ্যবাদীর সাথে ভোগবাদীর অবৈধ স্বার্থের সম্পর্ক সাধুতার পরিপন্থী। আবেদরা যেন এ বৈদিকপন্থা গ্রহণ না করে। তাহলে তাদের রোজা, পবিত্রতা, সংযম না হয়ে প্রদর্শনীমূলক উপবাস হবে। এই ভক্ত সাধুদের উদ্দেশ্যই নজরুল ইসলাম কবিতার আকারে লিখেছিলেন, "অন্তরে ভোগী বাইরে যে যোগী মুসলমান সে নয়/চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবেনা সত্য সে পরিচয়। পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে গলায় গলায় মেলো/করোনা আত্মপ্রতারণা আর খেলকা খুলিয়া ফেল।" আত্মপ্রতারণা আর আত্মশুদ্ধি এক নয়। রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ না হলে সবই আত্মপ্রতারণা।

২৪ রুকু

১৮৯. লোকেরা তোমাকে চাঁদের ব্যাপারে প্রশ্ন করে, বলে দাও লোকেদের জন্য ক্যালেণ্ডার ও হজের জন্য (গাইড) খিড়কী দরজা দিয়ে প্রবেশের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কল্যাণ রয়েছে খোদার অসন্তোষ থেকে বাঁচার মধ্যে, কাজেই সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং অল্লাহ ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করো তাহলে প্রগতির পথ পাবে

১৯০. আর আল্লার পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কিন্তু বাড়াবাড়ি করোনা কেননা আল্লাহ বাড়াবাড়িওয়ালাদের পছন্দ করেন না।

১৯১. তারা যেখানেই তোমাদের মোকাবেলা করে সেখানেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে কেননা ফিতনা (নির্যাতন) হত্যার থেকেও মারাত্মক। তারা যদি মসজিদে হারামে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা সেখানেই তাদের অসংকোচে হত্যা কর। এটাই এ ধরণের দানবদের যোগ্য শাস্তি। তারা বলপ্রয়োগে বিরত হলে তোমরাও বিরত হও কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু

১৯৩. ফেতনা নির্মূল হয়ে আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করো অতঃপর যদি বিরত হয় তাহলে জালেমদের ছাড়া কারও উপর হস্তক্ষেপ করোনা।

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাস এবং সমস্ত হুরমাত সম্মান দাবী করে প্রতিপক্ষদের নিকট থেকে) যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে তাহলে তুমিও

তার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করো তবে আল্লাকে ভয় করতে থাকো কেননা আল্লাহ সুপথগামীদের সাথে থাকেন।

১৯৫. আল্লার পথে খরচ কর ও এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করোনা বরং এহসান (সর্বোত্তম পন্থা) অবলম্বন করো নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসীনদের সঙ্গে থাকেন

১৯৬. আল্লার জন্যে হজ ও উমরাহ করো, যদি বাধাগ্রস্থ হও তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়ত্তাধীন তা পেশ করো আর কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন কোরোনা। কোন ব্যক্তি যদি রোগের কারণে কিংবা মাথার কোন কষ্টের কারণে ন্যাড়া হয় তাহলে বিনিময়ে রোজা, সদকা অথবা কুরবানী করতে হবে কিন্তু যদি নিরাপত্তার অভাব না থাকে তাহলে হজের আগে উমরা করতে পারে তবে সামর্থানুযায়ী কুরবানী করতে হবে আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয় তাহলে হজের মওসুমে তিনটে রোজা, ঘরে ফিরে সাতটি মোট দশটি রোজা রাখতে হবে তবে এ সুবিধা মসজিদে হারামের কাছে বসবাসকারী লোকেদের জন্য নয়। এসব বিধিবিধান লংঘন থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

ব্যাখ্যা

ব্রাহ্মণ্যবাদ কুসংস্কারের আখড়া। এ লোকের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মানবিক, জৈবিক, আর্থিক অধিকার হরণ করে সদাচারের নামে কুসংস্কার ও কদাচার শিখিয়েছে। শুভাশুভের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি রচনা করেছে আর পৈতৃক আচরণ নাম দিয়ে পৈতে পরে শয়তানের খত মাথায় করে অধিকারবঞ্চিত জনসাধারণের মুর্খতার সুযোগ নিয়ে তাদের এসব আমানি চামানি চামানি (চাঁদমণি নয় তো?) পাজিপুঁথি শুনিয়েছে। বলা হয়েছে চাঁদ অর্থাৎ চন্দ্রদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। জবাবে বলা হলো চাঁদ মামা নয়, বাবাখুড়োও নয়, তোমাদের বিধানদাতাও নয়, তোমাদের ধর্মীয় কাজের ক্যালেণ্ডার বিশেষ। মনগড়া শুভাশুভগুলো সদাচার নয়, অজ্ঞাত প্রসূত কদাচার কাজেই পরিহার করো। এসব কুসংস্কারের অনুসরণ আল্লার ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে বরং প্রগতির পথ হচ্ছে কুসংস্কারের পাণ্ডাদের পাশবিক আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই। লোককে মানসিক দিক থেকে পংগু করে রাখার জন্যই এসবের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। যারা মানুষকে স্বদেশ থেকে উৎখাত করে, কিংবা না মেরে জ্যান্ত মড়া করে রেখে দেয় তা মেরে ফেলার থেকেও কঠিন আপরাধ। এই অপরাধীদের ক্ষমতার মসনদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। শয়তানের খত বা আবর্জনা বওয়া ক্ষত্রিয়রা যদি সম্মানিত মসজিদে থেকেও এ যুদ্ধ পরিচালনা করে তবুও তারা সন্মানের যোগ্য নয়। তাদের খোদার ঘর থেকে বহিষ্কার কর, মসজিদ দখল কর, নির্যাতন বন্ধ কর,

মানবিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত কর। নির্যাতকদের শেকড় কেটে দাও। যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা মানেনা তার সাথে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে কাজ করার দরকার নেই। টিট ফর ট্যাট নীতি অবলম্বন করে টিট করে দাও কিন্তু পাশবিকতার আশ্রয় নিতে পারবেনা, সংগ্রাম হতে হবে মুক্তি সংগ্রামের, মারাঠা বর্গীর আক্রমণ হলে হবেনা। এ হলো প্রকৃত সাধুতা, সত্যের জন্য মারো, মরো, শহীদ হও, শুভ্র, ভাস্বর পরমহংস হও, আল্লার পায়ে নিবেদিত প্রাণ শহীদ হও।

এই মুক্তি সংগ্রামের জন্য কালো টাকা নয়, মুহসীনের (পরমহংসের) সাদা টাকা, দিলখোলা দান চাই। একাজে আত্মনিয়োগ না করলে এবাদতের জন্য মসজিদ নিরাপদ হবেনা। নিরাপত্তাহীনতা ও নিরাপত্তার সময়কার সাধুতার নিয়মনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বেণের অনশনে ব্রাহ্মণ্যবাদ যাবেনা। আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন,

"মহামুনির অনশনে টুটলো না হায় ব্রাহ্মণেরই তিলিসমাৎ
আশা ছাড়া মুসার কাজও হত নেহাৎ বেবুনিয়াদ।"

২৫ রুকু

১৯৭. হজের মাস (তীর্থযাত্রার মাস) সকলেরই জ্ঞাত মাস। যে ব্যক্তি এই মাসগুলোতে হজব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেয় সে যেন হজের সময়ে যৌনসম্ভোগ, কুকর্ম ও ঝগড়া বিবাদ না করে আর যা কিছু ভালকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানবেন। হজের সফরে পাথেয় নিও তবে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা সদাচার (যে আচরণ আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন) হে বিজ্ঞ সাধুরা আমার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো

১৯৮. তবে তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ সন্ধানে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাসআরল হারাম'-এর কাছে অবস্থান করে আল্লারই স্মরণ করো যেভাবে স্মরণের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন কেননা ইতিপূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোকের সাথে তোমরাও (সদলবলে) ফিরে এস এবং আল্লার কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি গাফুরুর রহীম (ক্ষমাশীল ও দাতা)

২০০. তারপর তোমাদের মানসিক সম্পন্ন করে এমনভাবে আল্লাকে স্মরণ করবে যেমন পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতে বরং তার চেয়েও বেশী করে করবে।

২০১. কিছুলোক আছে যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের দুনিয়ায় সবকিছু দিয়ে দাও' এ ধরণের লোকদের জন্য পরকালে কিছু থাকবেনা আবার কিছুলোক আছে যাদের প্রার্থনা হলো, হে আমাদের রব আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ

দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।

২০২. এ ধরণের লোক নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী দুনিয়া আখেরাতে পাবে, হিসাব চুকিয়ে দিতে আল্লাহ কালবিলম্ব করেন না

২০৩. মাত্র কটা দিন (মাত্র তিনদিন) আল্লার স্মরণে কাটিয়ে দাও। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনে ফিরে আসে তাতেও তার উপর পাপ বর্তাবেনা আর কেউ যদি বেশী করে তাতেও ক্ষতি নেই যদি লক্ষ্য হয় সদাচার। কদাচার থেকে বিরত থাক আর খুব ভালভাবে জেনে রাখো তোমরা নিশ্চিতভাবেই তার সামনে হাজির হবে।

২০৪. মানুষের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাদের কথা দুনিয়াবী জীবনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সে তার সদিচ্ছায় আন্তরিক এমন কসমও (শপথ) খায় কিন্তু সে সত্যের সংঘাতিক শত্রু

২০৫. সে প্রতিক্রিয়াশীল যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে (দাঙ্গা বাধায়) এবং ক্ষেত ফসল ও নসল (মানববংশ) ধ্বংস করে অথচ আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না

২০৬. আর যখন তাকে আল্লার ভয় দেখানো হয় তখন সে আত্মগরিমায় (বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে) পাপের পথে এগিয়ে যায়। তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট যা আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট।

২০৭. পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লার মর্জীপূরণে আত্মদান করে। আল্লাহ তার (এ ধরনের) আবেদদের (শুধু নামাজ পড়নেওয়ালা নয়) উপর স্নেহপরায়ণ

২০৮. হে সাধু সমাজ পরিপূর্ণভাবে আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পাপপথে বিচরণ কোরোনা, নিসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. এমন সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে কি তারা এই আশায় বসে আছে যে আল্লাহ মেঘমালার ছাতা লাগিয়ে ফেরেশতাবাহিনী নিয়ে সবকিছুর ফয়সালা করে দেবেন? সব ব্যাপারের ফয়সালা তো তাঁর কাছেই হয়।

নোট ঃ

হজের অনুষ্ঠান মক্কার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নেতৃত্বে উকাজের মেলায় পরিণত হয়েছিল। জেনা ব্যাভিচার দুষ্কর্ম ও বিবাদ বিসম্বাদ ছিল মেলাসমূহের বৈশিষ্ট্য (এখনও আছে)। নাংগা সাধুরা

এখানে ফাঁকি দিয়ে জালজুয়াচুরি করে অথবা ভিক্ষা মেঙে পয়সা কামাতে যেতো, তারা মাঙতে মাঙতে যেতো, মাঙতেই যেতো, অবৈধ ভাবে দুনিয়া কামায়ের জন্য যেতো অথচ ব্যাটা সাধু সেজে থাকতো। ফলে ঝামেলা বাধতো (আজও সাগরের তীরে সাগর তীর্থে এমনটাই হয়)। জমজমের তীরে তীর্থে এই ভণ্ড সাধুদের পন্থা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। বৈরাগ্যবাদের ছদ্মবেশে দুনিয়া পূজা পরিহার করতে প্রকৃত সাধুদের বলা হলো পরের পয়সায় তীর্থ করতে যেওনা, নিজের অর্জন করা হালাল সম্বল নিয়ে যাবে। ভণ্ড সাধুদের পন্থা পরিত্যাগ করবে। দুনিয়ায় যেমন সফরে সম্বলের দরকার হয়, পরকালের সফরেও সম্বলের প্রয়োজন হবে। খোদা নির্ধারিত সদাচারই হলো এই সম্বল যার আরবী নাম তাকওয়া বা সাধুতা। সাধু কখনও পরের পয়সায় খায়না, পরখেকো কখনও সাধু হয় না। দ্বিতীয়ত নফসপরস্ত, প্রকৃতিপূজক, ধান্দাবাজ অজ্ঞ, আনাড়ী লোক কখনও সাধু হয়না। সাধু হবে আল্লার কেতাব সম্পর্কে বিজ্ঞব্যক্তি ফলে দুরাচারী নয়। নির্লোভ সদাচারী কিন্তু কপর্দকহীন নয়। তাই তীর্থযাত্রায় ও হালাল পন্থায় ব্যবসা করে পয়সা কামানোতে দোষ নেই। দুনিয়া কামাই করেও দুনিয়াপূজক না হওয়াটাই সাধুতা। সততাই সাধুর মূলধন।

আরাফাত (যেখানে আদি মানব ও মানবী স্বর্গ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর একত্রিত ও পরিচিত হয়েছিলেন। এ অমরলোক ও মরলোকের মধ্যবর্তী স্থান, এ অমরলোকের নিকটবর্তী স্থান, এখানে জবলে রহমত বা করুণার পাহাড় আছে যেখানে আদিপিতামাতা আল্লার করুণাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন) মাশআরুল হারাম স্মরণীয় স্থান বলতে মুজদালিফা নামক একটা স্থানকে বুঝায়। এটা স্মরণীয় স্থান একারণে যে এখানে আবরাহার (নকল ব্রহ্মার) ঐরাবত বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে আল্লার দয়ায়) মহানবী এখানে আল্লার স্মরণে প্রার্থনা করেছিলেন। তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাজীদের আল্লার নির্দেশমত আল্লার জিকির বা স্মরণ করতে হয়। ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগে এখানে অনাচার অনুষ্ঠিত হতো। তার পরিবর্তে সদাচার অর্থাৎ রবের স্মরণকে তাজা করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের যুগে মক্কার অভিজাত পূজারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা, বেণেরা সাধারণ মানুষের সাথে আরাফাতে যাওয়াকে নিজেদের মর্যাদার খেলাফ মনে করতো। তারা মুজদালেফা থেকে ফিরে আসতো। এই ধর্মীয় বৈষম্য খতম করা হয়। এটা ছিল অনাচার। ব্রাহ্মণদের আচার, মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের আচার (মধ্যপ্রদেশ আসলে মক্কা প্রদেশ যা দুনিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত) মধ্যপ্রদেশকে ব্রাহ্মাবর্তও বলা হয়। প্রকৃত ব্রহ্মাবর্ত মক্কা। মধ্যপ্রদেশ নকল ব্রহ্মাবর্ত। ভারতের ব্রাহ্মণরা ছিল আরব থেকে পলাতক আদি মুসলমান। ব্রাহ্মণরা সেকথা জানে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভারতীয় হিন্দুতো সেই বেদবেদান্ত থেকে যখন ঈশ্বর ছিলেন এক ও নিরাকার এবং এদিক থেকে তখন হিন্দুরা ছিল আদি মুসলমান।" (২৫/২/১৯৯৮-আজকাল)

মধ্যপ্রদেশ বলতে মুজদালেফাও হওয়া সম্ভব। আরবীতে 'প' নেই। তাই 'মুজদালেফা'র মুঝ, মুঝ, মধ্য 'দালেপা'র প্রদেশ হওয়া সম্ভব। মুজদালেফা মক্কা ও আরাফাতের মাঝখানে অবস্থিত, এটা মীনা ও আরাফাতের মাঝখানেও) আসলে মুজদালেফার আচার যা আভিজাত্যের কারণে বৈষম্যমূলক। এই অনাচার মধ্যপ্রদেশে বা মুজদালেফায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খতম করেন। তিনি সদাচারীদের সাথে আরাফাতে যান, সেখান থেকে মুজদালিফায় আসেন যা ছিল বড়ত্ব প্রকাশের স্থান। তিনি এখানে আল্লার কাছে ক্ষমা চান,

নম্রতা প্রকাশ করেন। এটা ছিল ইব্রাহিমী আচরণ, ব্রহ্মাবর্তের প্রকৃত ব্রহ্মার আচরণ এটা সদাচারণ। ব্রহ্মার সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী প্রকৃত সাধু হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এই আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই এটা স্মরণীয় স্থান। এখানে স্থানের স্মরণ করা হয়না, স্মরণ করা হয় খোদার যিনি প্রকৃত বড়। মানুষের বড়ত্বের দাবী অর্থহীন।

মুজদালিফা থেকে মীনায় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই আত্মোৎসর্গের অনুসরণ না করে মক্কার ব্রাহ্মণরা তাদের দোহাই দিয়ে মেলায় কাব্য কবিতায় পিতৃপুরুষের পৌরাণিক কাহিনী আউড়াত। এসব বন্ধ করে এখানে অল্লার স্মরণে বলিদান করা হয়। মানুষদের বলা হচ্ছে তার অহং, সম্পদ, তার ছেলেমেয়ে এসব আল্লার রাহে দান করলে প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় আর কিছু না দিয়ে সকলের সম্পদ মেরে, সকলের ঘাড়ে চেপে পা খুঁড়িয়ে বড় হতে গেলে বিতাড়িত হতে হয়। আল্লার জন্য সর্বত্যাগী বিতাড়িত জন হযরত মোহম্মদ (দঃ) শুধু বিনয় নম্রতার কারণে ব্রহ্মাবর্তে চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন। যে কেউ তাকে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করবে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সমস্ত নবীদের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল আল্লাকে বেশী বেশী করে স্মরণ। নবীদের এই আচরণই প্রকৃত সদাচার বা তাকওয়া।

এক ধরনের লোক আছে যারা আল্লার কাছে ধনং দেহি, যশং দেহি, বলং দেহি, করতে থাকে। আল্লাহ তাদের দুনিয়ায় দিয়ে দেন। তারা মনে করে তারা মেরিটরিয়াস, মেরিটের জোরে, দেবদেবীর জোরে পূণ্যের জোরে পাচ্ছেন। দুনিয়ার কুত্তাকে আল্লাহ এমনি দেন কিন্তু আর একধরণের লোক আছে যারা দুনিয়া আখেরাত, মরলোক ও অমরলোক উভয়লোকের জন্য কল্যাণ (সদাচার) প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করেন নরকানল থেকে বাঁচানোর জন্য কারণ তারা সদাচারী হয়েও আল্লাকে ভয় করেন আর কদাচারীরা মনে করে তারা ব্রহ্মার বংশ, তার অংশ তাদের আবার নরক কি? তাই তারা নরকের ভয় করেনা। তারা জন্মগত কারণেই দুনিয়া ভোগ করবার অধিকারী। তাই তারা কেবল দুনিয়া চায়। কিন্তু সদাচারীরা উভয়লোক কামনা করেন, কেবল অমনরলোক কামনা করে না কারণ তারা মধ্যমপন্থী সাধু। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়দিকে প্রচেষ্টা চালালে উভয়দিকেই প্রচেষ্টা অনুযায়ী পাবে। তারপর বলা হলো আনুষ্ঠানিকতা কোন ব্যাপার নয়, দুই দিন কি তিন দিন সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আসল বস্তু হল সততা ও সদাচার, কদাচার থেকে বেঁচে থাকাই তার প্রাথমিক ভিত্তি। মনে রাখতে হবে সবাইকে একদিন আরাফতের ময়দানের মতো কেয়ামতের ময়দানে দাঁড়াতে হবে। এ তো কেয়ামত পরিচিতির ময়দান।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অত্যন্ত ধূর্ত। দিলে স্বার্থপরতা গোপন রেখে মুখে পৈতে ছুঁয়ে সদিচ্ছা প্রদর্শনের ভাণ করে মালিকের নামে আমজনতা বিশেষত সাধু প্রকৃতির সরল মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চায়। দ্বিজত্বের কারণে তারা আন্তরিক নয়, তাদের মন এক আর মুখ আর এক। তারা ভণ্ড। এজন্য আধুনিকতার মুখোশ পরে তারা প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবিমুখ, প্রতিক্রিয়াশীল। তারা প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করবে, দাঙ্গা-ফাসাদ বাধাবে, মানুষ মারবে অথচ আল্লাহ ধর্মের নামে এসব ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপে রুষ্ট আর যখন তাকে আল্লার নামে ন্যায় সত্যের দোহাই দেওয়া হয় তাহলে একে সে ছোটলোকের

স্পর্ধা বলে মনে করে। এর পরিণাম জাহান্নাম। অতিদর্পে হত লংকা হয় এবং অহংকারীদের নরকবাসও নিশ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মন, ধন, তন পর্যন্ত দিয়ে দেয়। হে সাধুসমাজ তোমরা এমনটা হও। শয়তানের খত বহন করোনা সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন অর্থাৎ শয়তানের খত বহনকারী গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়োনা। সুপথ এত স্পষ্ট করে বলার পর যদি কুপথেই বিচরণ করো, কুচলন না ছাড় তাহলে আল্লার আযাবের অপেক্ষা কর কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। প্রকৃত সংগ্রামী সাধু না হলে দুনিয়া আখেরাতে কোথাও বিপদ এড়াতে পারবেনা। আল্লাহ ও ফেরেশতাদের দেখে নয়, এসবকে না দেখে কে তার হেদায়েতের পথে চলে তারই পরীক্ষা এখানে রয়েছে অন্যথায় আল্লাহ ও ফেরেশতা যখন কেয়ামতে হাজির হবেন তখন আনুগত্য করে কোন ফল হবেনা। যা করবার তা এখনই কর।

২৬ রুকু

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করো কত সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি তাদেরকে দেখিয়েছি এবং এও জিজ্ঞাসা করো আল্লার নেয়ামত (কেতাব ও নবী) পাবার পর যারা তাকে বদলায় (বিপরীত আচরণ করে) তারা আল্লার কেমন কঠিন শাস্তির শিকার হয়।

২১২. ভণ্ড সাধুদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও চিত্তাকর্ষক। এরা সাধুসমাজেকে বিদ্রুপ করে কিন্তু সাধুতা অবলম্বনকারীরাই কেয়ামতে তাদের উপরে মর্যাদাশালী হবে আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রুজী দান করেন

২১৩. আদি মানবজাতি একই পথের অনুসারী ছিল।

(মতবিরোধের সৃষ্টি হলে তা নিরসনের জন্য) অতঃপর আল্লাহ নবী পাঠান সুসংবাদ দাতা (সত্যপথ গ্রহণ কারীদের জন্য) ও সতর্ককারী (কদাচারীদের) হিসাবে এবং তাদের সাথে (দলীল হিসাবে) সত্যসহ কেতাব পাঠান যাতে মতিবিরোধের ফয়সালা করা যায়। মতভেদের সূচনা তাদের মধ্যে তারাই করেছিল যারা সত্য আসার পরও তা মানতে রাজী হয়নি (সুবিধাবাদী হওয়ার কারণে) যারা কেতাব ও নবীতে ঈমান আনলো তাদের আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় সত্যের দিকে নিয়ে গেলেন মতবিরোধের জটলা থেকে এবং আল্লাহ যাকে চান সেরাতল মুস্তাকীমের পথ দেখান।

২১৪. তোমরা কি মনে মনে অংক কষে রেখেছে যে তোমরা এমনিতেই

অমরলোকে প্রবেশ করবে অথচ পূর্ববর্তীদের উপর যা এসেছিল তা এখনও তোমাদের উপর আসেনি। তাদের উপর কষ্টক্লেশ বিপদ মুসিবত তাদের এমনভাবে প্রকম্পিত করেছিল যে সমকালীন রসূল ও তার ঈমানদার সংগীসাথীরা চীৎকার করে উঠেছিল আল্লার সাহায্য কবে আসবে। আশ্বস্ত হও নিশ্চয়ই আল্লার সাহায্য নিকটেই।

২১৫. লোকের তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমরা কি খরচ করবো? জবাব দাও যা কিছুই কল্যাণকর তোমরা কর না কেন নিজেদের মা-বাপ, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন,ও মুসাফিরদের জন্য করো আর যে কল্যাণকর কাজই তোমরা করবে তা আল্লার গোচরে আসবে

২১৬. তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে যা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে, কোন কোন জিনিস তোমাদের জন্য অপ্রীতিকর কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর, কোন কোন জিনিস তোমাদের কাছে প্রীতিকর মনে হলেও তা তোমাদের জন্য খারাব (প্রকৃত ব্যাপার) আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

ব্যাখ্যা

পঞ্চম রুকু থেকে ষোড়শ রুকু পর্যন্ত বনী ইসরাঈলীদের ইতিহাসের ভালমন্দ দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাদের ভাল যুগ ছিল ইবরাহীম (আঃ) থেকে ইয়াকুব সন্তানদের যুগ, পরে তারা ইব্রাহিমী ও ইসরাঈলী পন্থা কেতাব ও সুন্নার পন্থা পরিত্যাগ করে ফলে কিবতী ফেরাউনী জাতির অর্থাৎ মিশরের সূর্যপূজক রামরাজাদের গোলামে পরিণত হয়ে তাদের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের শিকার হয়। পরবর্তীকালের বনী ইসরাঈলীরা সততার নীতি পরিত্যাগ করে ব্যাহ্যিক ধর্মিকতার বেশ ধারণ করে বেদাতপন্থী ভণ্ড সাধু হয়। দুনিয়ারী জীবনকে তারা পরকালের জীবনের উপর অগ্রাধিকার দেয় এবং সততার পন্থা অনুসরণকারী সংগ্রামী সাধুদের বোকা বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে থাকে কেননা সাধুতার কারণে তারা মাল সম্পদের ক্ষতির সামনে পড়তো। জানমালের এই ক্ষতি স্বীকারকে জানমালের পুজারীরা মূর্খামী মনে করতো। দুনিয়াতে বেশী ধনজন পাওয়াটা কোন সাধুতার পরিচয় নয় বরং এটা বিপত্তিমূলক কারণ কেয়ামতে নেয়ামতের হিসাবের সময় ভণ্ডসাধুরা বিপদে পড়বে আর যারা দুনিয়ার পিছনে না ছুটে সত্যের পিছনে ছুটেছিল তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে এবং হিসাব দিতে হবেনা এমন মালের অধিকারী হবে।

আদি মানবজাতি সাধু সম্প্রদায় ছিল। এটা ছিল সত্যযুগ কিন্তু মানুষের স্বার্থপরতা, অপরের থেকে বেশী পাওয়ার আকাঙ্খা তাদের মধ্যে সবল দুর্বলের ব্যবধান সৃষ্টি করে। সবলরা ভণ্ড সাধু হয়। ফলে একই জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়। এই দলাদলি রোধ করার জন্য আল্লাহ কেতাব ও নবী পাঠান যাতে তারা কেতাব মাফিক নবীর ইনসাফের সামনে মাথা নত করে আবার এক সাধুসমাজে পরিণত হয় কিন্তু সুবিধাভোগীরা নবীদের

ডাকে সাড়া দেয়নি। ফলে তারা সত্যপথ পায়নি। যারা সাড়া দিয়েছে তারা আদি সাধুসমাজের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এজন্য এই সাধুসমাজকে নবীর নেতৃত্বে তাদের মন্দলোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই প্রাণান্তকর সংগ্রামে নবী ও তার সংগীসাথীরা হয়রান ও পেরেশান হয়ে কাতরকণ্ঠে আল্লাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল। আল্লাহ পাক তাদের আসন্ন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটাই ঐশীনীতি। এই কঠিন পর্যায় অতিক্রম না করে কেউ সহজে সত্যিকার সাধু হতে পারবেনা।

সাধুদের ভোগী না হয়ে ত্যাগী হতে হবে। ত্যাগী না হয়ে সাধু হওয়া যাবেনা তা নবীর সহচররা বুঝতেন। তাই তারা মহানবীকে জিজ্ঞাসা করতেন কি খরচ করবো, কোথায় খরচ করবো, কিভাবে খরচ করবো। প্রকৃত সাধু পাওয়ার নয়, দেওয়ার চিন্তা করে, দানধ্যানের চিন্তা করে। নবীর সংগী সাথীরা ব্রাহ্মসমাজের দাবীদারদের সাথে কেতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংগ্রাম করেছিল কিন্তু কেতাব ও সুন্নাহবিরোধী নবীপূজকরা, পূর্বপুরুষ পূজারীরা, প্রাপ্ত ঐতিহ্যের অনুসারীরা তাদের জানমালের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, তারা স্বদেশ থেকে উৎখাত হয়।

মদিনায় ইসমাঈলী ব্রাহ্মসমাজ নয়, ইয়াকুবী ইসরাঈলী সমাজের দাবীদাররা ছিল। এরা নবীপূজক নয়, নবীবিরোধী ছিল। এদের কেতাব ও নবীর নেতৃত্ব মানার জন্য আহ্বান জানান হয় যাতে ধর্মীয় বিরোধের অবসান হয় কিন্তু অন্যায় প্রাধান্য হারাবার ভয়ে আত্মগরিমাবশত তারা সব জেনেশুনেও মহানবীকে মানতে রাজী হয়নি। সত্যশিক্ষার অভাব নয়, আত্মম্ভরিতাই ছিল এর প্রধান কারণ। আত্মম্ভরিতা খামখেয়ালীপনা অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। লোকেরা স্থূলদর্শী হয়ে যায়। বনী ইসরাঈল এমনি হয়ে গিয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ ও ইহুদী সমাজ ভণ্ড সাধুই রয়ে গেল। প্রকৃত সাধু সমাজের আত্মপ্রকাশের জন্য তাই সংগ্রাম জরুরী ছিল কিন্তু সংগ্রাম না করলে সাধুসমাজ প্রতিষ্ঠা হবেনা। আধ্যাত্মিক, সামাজিক বৈষম্য, আর্থিক বৈষম্য দূর হবেনা, গণতান্ত্রিক মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা হবেনা। তাই সংগ্রাম অপ্রীতিকর হলেও কল্যাণকর। আভ্যন্তরীণ আর্থিক সুসংগতি ছাড়া সংগ্রাম সম্ভব নয়। তাই পূর্বের আয়াতে সাধুসমাজকে আপন লোকজনদের দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

দানধ্যান ও যুদ্ধবিগ্রহ লোকের অপছন্দীয়। সেই দান ও যুদ্ধবিগ্রহ কল্যাণকর যা কল্যাণের জন্য হয়। দুনিয়াতে ফাসাদ ছড়াবার জন্যও অর্থ ব্যয় করা হয় তা দান নয়, জনসেবা নয়, দলবাজী করার জন্যও লড়াই করা হয় তা কল্যাণকর নয়। মস্তানদের লোন দেওয়া, অস্ত্র দেওয়া দান নয়, জেহাদ নয়। কেতাব ও সুন্নাহপন্থী সংস্কার আন্দোলনের সংগ্রামীকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করা যথার্থ কল্যাণকর। আত্মহত্যা করা কিংবা হত্যা করা ভাল কাজ নয়, মন্দকাজ কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য, নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য লড়াই করা, মারা ও মরা দূষনীয় নয় বরং গৌরবজনক কাজ। কে কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে তা আল্লাহ ভাল জানেন।

২৭ রুকু

২১৭. লোকেরা হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে। বলে দাও ঃ এই সময়ে যুদ্ধ করা বড় ধরণের অপরাধ কিন্তু তার থেকে আল্লার কাছে বড় অপরাধ লোকেদের একেশ্বরবাদের পথ থেকে বিরত রাখা, এক আল্লার কথা না শোনা, একেশ্বরবাদীদের মসজিদে-মধ্যমণির পথরোধ করা ও তার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা আর সন্ত্রাস তো হত্যার থেকেও জঘন্যতর অপরাধ। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই যাবে এমনকি তাদের ক্ষমতায় কুলালে তোমাদের পরাবর্তন করাবে তবে যে কেউ তোমাদের মধ্যে মুরতাদ হবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে দুনিয়া আখেরাতে তার সমস্ত কাজই বরবাদ হবে। এই ধরণের সব নরাধমই নরকে যাবে এবং সেখানে স্থায়িত্ব লাভ করবে

২১৮. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লার রাহে জিহাদ করেছে তারা আল্লার রহমতের আশা করতে পারে আর আল্লাহ তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাই করবেন না, অনুগ্রহও করবেন

২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও দুটোর মধ্যেই বিরাট ক্ষতি রয়েছে, রয়েছে লাভও তবে লাভের থেকে ক্ষতির পরিমাণ বেশী। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আল্লার পথে কত খরচ করবো? বলে দাও যা কিছু প্ররোজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্ব্যথহীন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যাতে তোমরা বিবেচনা সহকারে কাজ করতে পার

২২০. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই। তারা তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে কেমন ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও তাদের জন্য যাকিছু মঙ্গলকর। যৌথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে তারা তো তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম। কে অনিষ্টকারী কে কল্যাণকারী তা আল্লার অজ্ঞাত থাকবে না। আল্লা চাইলে কঠোরতা আরোপ করতে পারতেন কিন্তু তিনি পরাক্রমশালী হওয়ার সাথে মহাজ্ঞানী

২২১. ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নরীদেরকে বিয়ে করবে না কারণ চিত্তহারী সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারীর থেকে মুমিনা দাসী ঢের ভাল আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশারিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের বিয়ে দিওনা। একজন সম্ভ্রান্ত আকর্ষণীয় মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা মোমেন দাস ঢের ভাল। তারা নরকের দিকে ডাকে আর আল্লাহ সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে তোমাদের ডাকছেন ক্ষমা ও স্বর্গের দিকে। তিনি ইনসানদের সামনে জ্ঞানময় ফয়সালা পেশ করেন যাতে তারা একে জপতে থাকে।

নোট ঃ

যারা হারাম মাসে (রজব, জেলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম এই চারমাস হারাম মাস) তন্মধ্যে মহরমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ এ মাসে সৃষ্টির, মানবজাতির সূচনা সবকিছুই করা হয়। সৃষ্টির মাসে ধ্বংস সবচেয়ে বড় অপরাধ। মহরমে নবীকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল তারা। ভুলক্রমে নবীর অজ্ঞাতে কতিপয় নবীর অনুচরের দ্বারা সাবান ও রজবের সন্ধিক্ষণে কিছু কাফের আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সমান্য ঘটনাকে তিলকে তাল করে মক্কার ব্রাহ্মণ, মদিনার ইহুদী ও মুনাফিকরা পেশ করেছিল অপপ্রচারের স্বার্থে। এই অপপ্রচারের জবাবে বলা হলো হারাম মাসে যুদ্ধ করা অপরাধ কিন্তু এর থেকেও অনেক বড় অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তারা ব্রহ্মাবর্তের লোকেদের ধর্মীয় অধিকার, মানবিক অধিকার, এমনকি নাগরিক অধিকার হরণ করে আল্লাহওয়ালাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকেও বহিষ্কার করেছে, লোকদের আল্লার কথাও শুনতে দেয়নি, আল্লার কথাও শুনতে চায়নি, এই নির্যাতিত আল্লাহওয়ালাদের সামান্য ভুল নিয়ে তারা এত হৈ চৈ করছে কোন লজ্জায়? চালুনির সূঁচের ছেঁদা নিয়ে ঝগড়া করার ন্যায় এ এক অহেতুক হৈ চৈ। তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে মক্কার সর্বত্র অবিচার অনাচার, অত্যাচার বিরাজ করছে, ঈমানদাররা শ্বাসরোধকারী পরিবেশে বাস করছে, সে দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সেবাদাসরাও ক্রীতদাসত্বের জীবনযাপন করছে, তাদের নারীরা ধর্ষিতা ও বেশ্যাপনায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। তারা মানুষকে পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তারা অসহায় মানুষকে জ্যান্তমড়া করে রেখেছে। তারা মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে বারোমাস অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে রেখেছে। তারা মুক্তি সংগ্রামীদের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের পুনরায় সেবাদাস বানাতে চায়। তারপরেও তারা নিয়ম-শৃঙ্খলাভংগের কথা বলে। এদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিহার করে বসে পড়বে, পরাবর্তন করবে, জালেমের জুলুমের ভয়ে তার দোসর হবে, সে অকৃজ্ঞ, মুরতাদ ও কাফের হবে এবং এ ধরনের কার্যকলাপ দুনিয়াতেই লাভজনক হবেনা তো পরকাল। এই নরাধমরা দুনিয়াতে গোলাম ও আখেরাতে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হবে।

সততা ও সাধুতার অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু শান্তিপ্রিয় মুসলমানও এই অপপ্রচারের শিকার হয়ে মুসলমানদের সামান্য অপরাধকে বড় করে দেখতে শুরু করেছিল। তারা ভাবছিল গায়ে গামছা দিয়ে থাকলে বেঁচে যাবে, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাথে সংঘাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে। আল্লাহ বললেন, না কস্মিনকালেও তা হবেনা, তোমরা ইসলাম ছেড়ে তাদের পোষমানা গোলাম হতে চাইলে তা হবে কিন্তু এর পরিণাম দুনিয়াতে খারাব আর আখেরাতেও জাহান্নাম। তাই ঈমান, হিজরত যথেষ্ট নয়, জেহাদ বা মুক্তিসংগ্রাম জরুরী, মসজিদ উদ্ধার, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন জরুরী, জরুরী কেবলা দখল, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ব্রহ্মাবর্তের কর্তৃত্বের আসন থেকে বেদখল করা, শুধু ঈমান এনেছি বলে, দাওয়াতী কাজ করে জান্নাতে যাওয়া যাবেনা। ভুলত্রুটি যা হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন যদি সংগ্রাম করা হয়। তদুপরি জাগতিক সাফল্য ও পারলৌকিক কল্যাণও মিলবে। কাজেই বুঝে কাজ করো হে সাধু সমাজ, শুধু তসবী তেলাওয়াতে কিছু হবেনা। বনি-ইসরাঈল হিজরত করে

জেহাদ না করে ঠকেছে। তারা সুযোগ নষ্ট করেছে, সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করেছে।

মদ ও জুয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে এটাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। তাই এসব পরিত্যজ্য, পরিত্যজ্য ধনতন্ত্রবাদ। পুঁজিবাদই মদ ও জুয়ার পৃষ্ঠপোষক। তাই উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লার রাহে মুক্তি সংগ্রামে খরচ করে দাও। শয়তান জব্দ হয়ে যাবে। আল্লাহ তো দ্ব্যর্থহীন অকাট্যজ্ঞান সাপ্লাই করছেন, তোমরা যদি বিবেচক হও উদ্বৃত্তের সবটা আখেরাতের জন্য পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ, যুদ্ধে লোক মরবে, ছেলেমেয়েরা এতিম হবে তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মত করে নাও, সাধুতা দেখাও। আল্লাহ পাক ক্ষমতাশালী ও প্রজ্ঞাবান। তার কথা শোন যদি তোমরা জ্ঞানী সাধু হতে চাও।

ন্যাংটো সাধু হয়োনা, পোষাক পরা সাধু হও। বিয়ে কর তবে ব্রাহ্মণ্যবাদী মহিলাদের বিয়ে করোনা। এই গিমিকধর্মী নাটুকে, ছলাকলাময়ীদের চিত্তাকর্ষক মনমোহিনী রূপে ভুলোনা, এদের বিয়ে করলে পার্থিব সুবিধা হলেও না। এরা পরকাল ধ্বংস করবে। এরা ইহকালের কাঙাল। হ্যাঁ, ঈমান এনে আবেদা খাতুন হলে দোষ নেই। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষকে মেয়ে দিওনা। সে তোমাদের মেয়েকে শূদ্রাণী বানাবে। জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঈমান এনে আবেদ হলে দোষ নেই। পারিবারিক জীবনে কমন সিভিলকোড, মিশ্র সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথ করে দেবে। কাজেই হে সাধুসমাজ আল্লার সদুপদেশকে জপমালা করে নাও।

কামিনী ও কাঞ্চণ দুনিয়াতে সকল আপদের মূল বিবেচনা করে খোদার জ্ঞানবঞ্চিত বৈরাগ্যবাদী সন্ন্যাসীরা এক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। আল্লাহপাক তাই কাঞ্চণ নীতি সবিস্তারে বর্ণনা করার পর কামিনী নীতি পেশ করেছেন। উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে আল্লাহ মনোনীত পন্থায় আর্থ সামাজিক কাজে ব্যয় না করলে সাধুসমাজ অর্থের খারাবী থেকে রক্ষা পাবেনা এবং সাধু সমাজের শক্তিবৃদ্ধিও ঘটবে না। কাঞ্চনকে তার খারাব দিক পরিহার করে ভালদিকে ব্যবহার করে মানবসমাজকে উন্নত করতে হবে। অনুরূপভাবে কামিনীকে রমণীরত্নে পরিণত করে ঈমানদার আবেদা খাতুনকে বিয়ে করতে হবে তার তথাকথিত কৃত্রিম সামাজিক মর্যাদা থাক আর না থাক। তাই অসাধু ভণ্ডসমাজের মহিলা, লেডি চলবেনা কারণ লেডি মাউন্টব্যাটেনরা, নেহেরুরা কখনই সৎ জীবনযাপন করেনা। আবার মুশরেক পুরুষরাও মেয়েদের কখনও মাসী, কখনও মা, কখনও দেবী বানিয়ে তার মানবিক সত্তা ও অধিকার নষ্ট করে। তাই ঈমানদার দাস আবেদ আবেদা খাতুনদের জন্য ভালো। নফসপরস্ত হলে এ উন্নতমার্গ অবলম্বন করা যায়না, যাবেনা। ঈমান আনার মানেই হলো নফসকে বলিদান করা, আল্লার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে রুহকে শক্তিশালী করে বিজ্ঞসাধু হওয়া। তাই বিবাহিত জীবন প্রকৃত সাধুর জন্য জরুরী।

২৮ রুকু

২২২. তারা আপনাকে মাহিজ (মাসিক) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন এটা 'আবা অশুচিকর, অরুচিকর অবস্থা। অতঃপর এ সময় নেসাদের (রমণীরত্নদের)

থেকে দূরে থাক। এ সময় তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়োনা যে পর্যন্ত না তারা হুর (পবিত্রা) হয়ে যায়। যখন তারা হুরী (মনোহারী, রুচিকর পবিত্রা হয়ে যায় তখন তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাওয়াবিন (যারা পাপাচার থেকে বিরত থাকে) ও তাহেরীনদের (যারা পাপে জড়িত না হয়ে শুদ্ধচিত্ততা পছন্দ করেন) ভালবাসেন ২২৩. রমনীরত্নরা তোমাদের কৃষিক্ষেতের ন্যায়। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতখামারে যাও তবে পরিণামদর্শিতা সহকারে এবং আল্লাকে ভয় করো এবং জেনো রেখো একদিন তোমাদের আল্লাহর সাথে মুলাকাত করতে হবে এবং মুমেন বা মাননেওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ ২২৪. তোমাদের কিরে কসমে আল্লার নামের অপব্যবহার করোনা তাকওয়া ও মানবীয় সংস্কার সংশোধনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার নিয়তে (উদ্দেশ্যে) কেননা আল্লাহ শুনছেন, জানছেন (অর্থাৎ আল্লাহ সামনে রয়েছেন একথা খেয়াল করছোনা কেন?) ২২৫. তবে (ভাবাবেগে) যেসব অর্থহীন শপথবাক্য উচ্চারণ কর তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হবেনা কিন্তু আন্তরিকতাসহকারে গৃহীত শপথের কৈফিয়ত তলব করা হবে। আল্লার গফুরুন হালিম (সহিষ্ণু) ২২৬. যারা সতীসাধীদের সাথে ঈলা (সম্পর্কচ্ছেদের শপথ) করে তাদের চার মাসের (তারাবুজ) অবকাশ দেওয়া হলো যদি তারা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে তাহলে আল্লাহ গফুরুর রহীম (মাফকরনেওয়ালা) ২২৭. আর যদি তারা তালাক দেবার ব্যাপারে কৃতসংকল্প হয় তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ লক্ষ্য রাখছেন, অনুধাবন করছেন (গতিবিধির উপর নজরদারী রয়েছে) ২২৮. তালাকপ্রাপ্তারা তিনবার মাসিক পর্যন্ত বিরত থাকবে আর তাদের রহমতের কক্ষে (গর্ভাশয়ে) যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা যেন তারা গোপন না করে যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়। যদি তালাকদাতারা তাদের মতামত পুনর্বিবেচনা করে তাহলে তাদের ফিরিয়ে নেবার অধিকার রয়েছে অবকাশকালের মধ্যে। অনুরূপ ন্যায়ের দাবী সতীসাধ্বীদেরও তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও অধিকার কিছুটা বেশী। সবার উপরে কর্তৃত্বের অধিকারী হচ্ছেন মহাবিবেচক আল্লাহ।

ব্যাখ্যা

বিয়ে সাধুতার পরীক্ষার জন্য জরুরী। যৌনজীবনে সাধুতা রক্ষা করা কষ্টকর ব্যাপার। দুর্বল সন্ন্যাসী তাই ভয় পায়। সংসার সমরাঙ্গণে প্রবেশ করতে চায়না। আল্লাহ সত্যিকার সাধু ও সাধ্বীদের এ সমরাঙ্গণে বিজয়ীর বেশে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিবাহসংক্রান্ত মৌলিক নীতি ঘোষণার পর যৌনজীবন সংক্রান্ত মৌলনীতি পেশ করেছেন এ রুকূতে। শুধু মাসিক

অবস্থায় সাধু ও সাধ্বী থাকলেই হবে তারপরে পরস্পরের পোষাকের ন্যায় মাধুর্যমণ্ডিত জীবনই সাধুতা ও সাধ্বীত্ব। আল্লাহ এ ধরনের সাধু ও সাধ্বী চান, ফেরেশতা চাননা, নরপশুও চাননা। নাস ও নেসা (মানব-মানবী) কৃষক ও কৃষিক্ষেতের ন্যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। জমি থাকবে চাষী থাকবেনা আবার চাষী থাকবে জমি থকবেনা এ অজন্মার কারণ হবে। জমিতে আগাছা হবে আর চাষীও জংলী হবে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চাষীকে কাজ করতে হবে। সন্তান উৎপাদন ও তাকে ঈমানদার হিসাবে গড়ে তোলা চাষীর কাজ । সন্তান হচ্ছে রুজী বা ফসল। যে চাষী ফসল নষ্ট করে জমিকে কাজে লাগায় না সে নির্বোধ চাষী। যে জমিকে নষ্ট করে, অনুর্বর করে, বন্ধ্যা বাঁজা করে সে কি চাষী? খাসী হওয়া তাই নিরর্থক। যে চাষী লাঙ্গল করে, ফসল হলে ঝামেলা হবে বলে বীজকে পাচিয়ে জমিতে বুনে সে গণ্ডমূর্খ, নফসের গোলাম, আহাম্মক, হেমোকতওয়ালা চাষী, ফসল করবেনা, জমিও ছাড়বেনা। এ সর্বহারা জবরদখলকারী বর্গাদার। এমন চাষীকে মালিক মালেকে ইয়াওমিদ্দিন' পাকড়াও করবেন। তাই সাধুকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে আর যে চাষী মালিকের মর্জীমতো উত্তম ফসল ফলাবে তার জন্য সুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

চাষ করবার জন্য জমি কিনে, জমি কড়া দেখে, জমির সাথে সম্পর্ক রাখবো না বলে আল্লাহর নামে কসম খাওয়াটা অমাজর্নীয় অপরাধ। তাই চারমাসের মধ্যে হয় কসম ভেঙ্গে চাষ করতে হবে, না হয় জমিকে অন্য চাষীর জন্য মুক্ত করে দিতে হবে। জমি মালিকের, চাষীর নয়। চার মাসের মধ্যে চাষে লেগে গেলে আল্লার জমি কেড়ে নেবেন না কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দাতা। জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা মালিক পছন্দ করেন না তবে চাষীর ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য এ অবকাশ রাখা হয়েছে। তালাকের মাধ্যমে এর সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কি অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছে আল্লাহ তা খতিয়ে দেখবেন।

বিবাহিত স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকাটা তাকওয়ার (সাধুতার) পরিপন্থী বিবাহিত মহিলাদের ইসলাহ বা সংস্কার সংশোধন করবো না বলে আল্লার নামে কৃতসংকল্প হওয়াটা সাধুতার খেলাপ। এ সন্ন্যাসীদের আচরণ, সংস্কারকামী বিবেচক বিচক্ষণ সাধু বা মুত্তাকীর কাজ নয়। এ তো অস্ত্ত সন্ন্যাসীর কাজ যারা পারিবারিক সংশোধনের দায়িত্ব নিতে চায়না। যারা দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না বরং এতে আল্লার ক্রোধ জাগ্রত হয় কিন্তু তিনি হালিম বা সহিষ্ণু বলে সব বরদাস্ত করেন। তাই চারমাসের মধ্যে নফসকে কাবু করতে পারলে রেহাই। তবে এমনিতে দুটো স্বাধীন সত্তার মধ্যে যে সংঘাত হয়ে যায় তাতো দাঁত-জীবের মধ্যেও হয় এবং তা ধর্তব্যের মধ্যে নয় তবে দাঁত যদি জিভ কেটে দেওয়ার জন্য জিদ ধরে তা ভাল নয়। তাই আল্লাহ উভয়কে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হতে বলেছেন, সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করতে বলেছেন, তার অবকাশ রেখেছেন। সম্পর্ক জুড়তে চাইলে আল্লাহ জুড়ে দেবেন কারণ তিনি শুধু ক্ষমাশীল নন, রহীম (মোমেনদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহকারী)।

তালাকপ্রাপ্ত হলে তিন ঋতু ইদ্দত পালন করতে হবে। যদি জানা যায় যে পেটে বাচ্চা আছে তাহলে সাধ্বীকে তা প্রকাশ করতে হবে। চাষী ফসলের মায়ায় জমি ছাড়তে চাইবেনা। সন্তান সেতুবন্ধন। যে মানবী এটা বোঝেনা সে মানবী নয়, সাধ্বী নয়, সে নারী (নরকে

যাবার যোগ্যা) সে নিজেকে ও পরিবারকে নষ্ট করনেওয়ালী।

আবেদার রেহেম হচ্ছে রহমানুর রহীমের রহমত বর্ষণের কুদরতী কক্ষ। যে একে নষ্ট করে সে মিকাইলভক্ত, জিব্রাইলের শত্রু, আল্লাহ আখেরাত, ফেরেশতা, নবী ও সাধকদের শত্রু। এদের সকলের অভিশাপ এ অহল্যা ও বেহুলার উপর পড়বে। সতী-সাধ্বী যেন অহল্যা-বেহুলা হওয়া পছন্দ না করে। তাই তালাকদাতা কসম ভেঙ্গে তাকে গ্রহণ করতে চাইলে সে যেন জেদ না ধরে। উভয়ে যেন ন্যায়ের দাবী পূরণ করে তবে পুরুষের যেমন প্রাধিকার রয়েছে তেমনি দায়িত্বও বেশী। তাই তাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লার দাবী সকলের উপরে। তাই তাকে ভয় করে সবাইকে কাজ করতে হবে। নারী পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সমান তবে ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ব্যাপারে পুরুষের প্রাধিকার রয়েছে। এটা নিয়ম-শৃংখলার জন্য প্রয়োজন কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ খোদা আজিজুল হাকিম অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী হওয়ার সাথে বিবেচক ও বিচক্ষণ। সর্বাধিক কল্যাণ কিসে এটা বিবেচনা না করে পুরুষ যদি তার প্রাধিকার আছে বলেই অন্যায় করে তাহলে আল্লার পাকড়াও থেকে সে রক্ষা পাবেনা।

২৯ রুকু

২২৯. তালাক দু'বার অতঃপর হয় কোমলতার দাবী মেনে নমনীয়তার নীতি অনুযায়ী গ্রহণ কর, নয় সর্বোত্তম পন্থায় সম্বর্ধনা সহকারে বিদায় দাও। তাদেরকে যাকিছু দিয়েছ তা ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয় তবে এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে যদি আশংকা হয় যে স্বামী-স্ত্রী তাকওয়া রক্ষা করে একসংগে বসবাস করতে পারবেনা বরং খোদা নির্ধারিত সীমালংঘনের আশংকা রয়েছে তাহলে স্বামী স্ত্রীধনের বিনিময়ে তালাক নিলে পাপ বর্তাবেনা। এগুলো খোদানির্ধারিত সীমা। যে কেউ এ সীমালংঘন করবে সেই জালেম।

২৩০. অতঃপর দু'বার তালাক দেওয়ার পর যদি তৃতীয়বার তালাক দেওয়া হয় তাহলে তার জন্য তার স্ত্রী আর হালাল থাকবেনা যতক্ষণ তালাকপ্রাপ্তা অন্যের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হবে এবং অতঃপর সেও যদি তালাক দেয় তবে উভয়ের জন্য প্রত্যাবর্তনে কোন দোষ নেই যদি তারা খোদানির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে আশ্বস্ত হয়। এগুলো খোদাপ্রদত্ত বিস্তারিত বিধিনিষেধ জ্ঞানবান গোষ্ঠীর জন্য।

২৩১. তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে এবং ইদ্দত পূর্ণত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন নমনীয়তার পন্থা অবলম্বন করে তাদের স্ত্রীত্বে বহাল রাখবে কিন্তু যদি তালাক দিতেই চাও নমনীয়তার সাথে দেবে। প্রতারণামূলক তালাক দিওনা কারণ এটা বাড়াবাড়ি, যেকেউ তা করবে সে স্বীয় সত্তার উপর জুলুম করবে। আল্লার

আয়াতকে খেল-তামাসায় পরিণত করোনা। আল্লাহ তোমাদের উপর যে নেয়ামত দান করেছেন তা সর্বদা স্মরণ রেখো এবং তার সদুপদেশ হলো যে কেতাব ও হিকমত তিনি তোমাদের দান করেছেন তাকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করো এবং ভয়ে ভক্তিতে আল্লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ হয়ো এবং ভালভাবে জেনে রাখো তোমাদের কোনকিছুই আল্লার দৃষ্টি থেকে গোপন থাকবে না।

নোট

দাম্পত্যজীবনে সাধু ও সাধ্বী উভয়ের অধিকার সমান হলেও একজনকে অপরের উপর কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তালাক দেওয়ার ব্যাপারে পুরুষের অগ্রাধিকার রয়েছে কারণ বিয়ের প্রস্তাব সেই দিয়েছিল মোহরাণার বিনিময়ে। নেসার ছিল তা গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার। বিবাহিত জীবনের পর স্ত্রীকে রাখা না রাখার অধিকার তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার সমতার নীতি অনুযায়ী পুরুষের ভাগেই বর্তায়। এই অধিকার প্রয়োগ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন নয় বরং আল্লার আইনের অধীন। তালাক দিতে হবে এহসান বা করুণাসিক্ত হৃদয়ে কঠোর হৃদয়ে নয় এবং বেশী হলেও মাত্র ২বার তাও একাদিক্রমে নয় বরং মাসিক থেকে পবিত্র অবস্থায় এক তালাক প্রদান করতে হবে অন্যান্য সদাচারমূলক পন্থা অকার্যকারী হওয়ার পর (সূরা নেসা দ্রষ্টব্য)। আবার মাসিকের পর বিরোধ-মীমাংসা হয়ে গেলে ভাল আর যদি তা না হয় তাহলে ২য় বার তালাক দেওয়া যেতে পারে। এতে ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার আগে গ্রহণ করা যায়। তাই একাবারে তিন তালাক দেওয়া সাধুতার পরিপন্থী, সুন্নাহবিরোধী বৈদিক কাজ। এই নিয়মনীতির বিরোধী পন্থায় তালাক দেওয়া বেদাহ বা বেদাত বা কদাচার বা বৈদিক পন্থা। সাধ্বীকে তালাক দিয়েও সাধুকে তাকে নিয়ে এক ঘরে বসবাস করতে হবে। উভয়ের ঘর ভিন্ন হলেও হবেনা। এখন সুন্নাহপন্থীরা যদি বৈদিকপন্থা গ্রহণ করে তবে সে দোষ কি শরীয়তের? সাধু যদি এ পন্থা অবলম্বন না করে তবে তাকে উত্তম সাধু বলা যায়না। শুধু তালাকে এ সুন্নাহ অবলম্বন না করার দরুন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রাঃ) বহুগুণ থাক সত্ত্বেও খেলাফতের আযোগ্য ঘোষণা করেন।

অন্ধকারযুগে অর্থাৎ আরবের বৈদিকযুগে তালাকের ব্যাপারে যথেচ্ছাচার চলছিল। লোকে তালাক দিত, তাড়িয়ে দিত আবার রাগ পড়ে গেলে ফিরিয়ে আনতো, আবার তাড়িয়ে দিত। না স্ত্রী না স্বাধীন এই অবস্থায় মেয়েরা জ্যান্তমড়া হয়ে জীবনযাপন করতো, অন্যত্র বিয়ে করতেও পারতোনা। স্ত্রী পণ্যদ্রব্য হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম এই বৈদিক পন্থাকে হারাম ঘোষণা করে। দু'বারের বেশী ফিরিয়ে নেবার অধিকার খতম করা হয়। তৃতীয়বার তালাক দেবার পর সে স্বাধীনা হয়ে যাবে। অন্যত্র বিয়ে করে নেবার অধিকার তার বর্তাবে।

তৃতীয়বার তালাক দিলেও সর্বোত্তম পন্থায় তা দিতে হবে যেমন কাউকে 'ফেয়ারওয়েল' দিয়ে বিদায় করা হয়। তাদেরকে ইতিপূর্বে গহনাপত্র, কাপড়-চোপড়, মোহরানা যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ফিরে নেওয়া হারাম, তবে তৃতীয় তালাকও হতে হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। যদি স্বামী-স্ত্রী, আশংকা করে যে তারা সততার সাথে একে অপরের অধিকার রক্ষা করে চলতে পারবেনা বরং অপরের অধিকারের প্রতি বেঈমানী করে বসবে এবং গোপনে পাপাচারী হতে বাধ্য হবে তাহলে পাপ থেকে বাঁচার জন্য তাদের বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাওয়া ভালো। যাদের হৃদয় দিয়ে ভালবাসা যায়না কেবল আইনের বাঁধনে বাঁধা পড়ে থেকে লাভ নেই। অতঃপর তাদের উভয় পক্ষের সালিশদার গার্জেনরাও যদি মনে করে তারা সাধুতার নীতি অবলম্বন করতে পারবে না তাহলে সাধ্বীর স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার বর্তাবে। আসল জিনিস হলো সাধুতা। বিয়ের জন্য প্রথমে সাধু প্রস্তাবে করেছিল মোহরাণা সহকারে। তখন তা গ্রহণ বর্জনের অধিকার ছিল সাধ্বীর। সাধু সেখানে অসহায় ছিল। সাধ্বীকে ঘটক বা অলীর মাধ্যমে খোসামোদ করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। অনুরূপভাবে খোলা (স্ত্রীর তালাকপ্রাপ্তির) অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে সাধ্বীকে সাধুর দ্বারস্থ হতে হবে এবং কিছু ধন বিনিময় দিয়ে তাকে রাজী করাতে হবে। সাধুকে সংগত বিনিময় নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তার মানবিক স্বাধীনতা হরণ করা চলবেনা। বিরোধ মীমাংসায় উভয় পক্ষের মুরুব্বীরা এমনকি শরীয়তী আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে যাতে কেউ বাড়াবাড়ি না করে। এগুলো হচ্ছে হুদুদুল্লাহ বা আল্লাহ নির্ধারিত ব্যাস বা সীমা। যে কেউ এই ব্যাস বা সীমা অতিক্রম করবে সে হবে বেদব্যাস বা সীমালংঘনকারী বেদে, ঢ্যাম্না বেদো বেপরোয়া বেদুঈন অর্থাৎ শয়তানের শাগরেদ। সে সাধু নয়, বিবাহের বা সংযুক্তির বন্ধন ছিন্নকারী অসাধু। সে সন্ন্যাসী বা মানবতাবাদী নয় বরং খন্নাসের কুমন্ত্রণায় চালিত খন্নাস বা নরশয়তান। সে নিজের ও অপরের উপর জুলুমকারী। আল্লাহপাক মানবতার বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন পুরুষ-রমণীর বন্ধন ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন তবে মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশে কিছু শর্তসাপেক্ষে ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মকানুন রেখেছেন যাতে অনমনীয়তার মধ্যে নমনীয়তাও থাকে কিন্তু এসব আইন কানুনের স্পিরিটের প্রতি খেয়াল না করে যারা কেবল আইনের অক্ষরের অনুসরণ করে তারা সাধুতার সীমালংঘন করে যা ছিল বেদুঈন বা বুদ্দু কালচার। এই কালচার বিবাহিত জীবনের, সভ্য জীবনের পরিপন্থী। এতে বিবাহবিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের পরিণতিতে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হয় এবং কঠোরভাবে একে সাধুতার নীতি হিসাবে চালানো হয়। অবিবাহিত কুমার-কুমারীদের জয়গান গাওয়া হয়, তাদের মানবসমাজের নেতা ও নেত্রীপদে বরণ করা হয়। এভাবে বৈদিক যুগ ফিরে আসে এবং তারা ক্ষমতার আসনে আসীন হয়ে খোদানির্ধারিত বৈবাহিক নীতি পরিবর্তনের জন্য উঠেপড়ে লাগে এবং জেনা-ব্যভিচারের পথকে খুলে দেয়। তারা এক শালীন ব্যবস্থাকে অশালীন ব্যবস্থায় পরিণত করে মানবজীবনকে কলংঙ্কিত করে। তাই সাধুতা ও সেবার ভেকধারী অবিবাহিত বেদাতপন্থীদের, বৈদিক অসভ্যতার অনুসারীদের সাধুতা, সেবা ও নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনবার তালাক দেবার পর আর তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনটা করলে অনাচার, কদাচার করা হবে, স্বেচ্ছাচারিতার যুগ ফিরে আসবে। সাধু ও সাধ্বীর দাবীদার হলে কেউ তা কামনা করতে পারেনা। সাধ্বী অন্যত্র কোন সাধুর পাণিগ্রহণ করবার পর যদি পুনরায় পূর্বোক্ত পন্থায় বিচ্ছেদের শিকার হয় তাহলে পূর্বের কাইয়েম তার জন্য হালাল হতে পারে যদি ব্যাসের মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে আশ্বস্ত হয়। এ আল্লার ব্যাস লংঘন করার পরিণতির ইতিহাস যারা জ্ঞাত সেই বৈদিক যুগের ইতিহাস যারা জানে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে সাধুতার এ নীতি যাতে তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় (বৈদিক যুগের

যৌনজীবন ও কোরানীযুগের যৌনজীবনের তুলনামূলক অধ্যয়ন জরুরী)। বৈদিক সভ্যতা (?) মানবসভ্যতার ইতিহাসের দুর্যোগমূলক অধ্যায়। এ ছিল মানবসভ্যতার অন্ধকারপূর্ণ যুগ। এ যুগে ভারত জম্বুদ্বীপে বা পাপাচারের দেশে পরিণত হয়।আরবে বৈদিক যুগে নারীদের শূদ্রাণী বিবেচনা করা হতো। তাদের মানবিক অধিকার লংঘন করে বিবাহিত জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে তালাক দিয়েও আটকে রাখা হতো যে অসমতামূলক সামাজিক কুপ্রথা ও আইনের বলে সেই বৈদিক আইন ছিল চরম প্রান্তিক। তাই তা নস্যাৎ করা হয়। তিন তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হলেই সতীসাধ্বীর অন্যত্র বিয়ে করার অধিকার বর্তাবে। বর্তমানে ভারতের বৈদিকরা তালাককে স্বীকার করলেও তাকে হিন্দুকোডবিলের মাধ্যমে এতটা কঠিন করে দিয়েছে যে তারা অসাধুতার জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে আটকে রেখেছে। তারা নিজেরাই নিজেদের জুলুমের শিকার। ব্রাহ্মণ, ইহুদীরা ও হনুদরা আল্লার আইনকে, মানবজীবনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে। এমনটা করা থেকে কেবলা পরিবর্তনকারীদের, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ক্যাবলাকান্তদের পথ পুনরায় গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ এর ফল হবে মারাত্মক। আল্লার দাম্পত্যজীবন সংক্রান্ত আইন নিয়ামত বিশেষ যে নিয়ামতের প্রার্থনা নিত্য নামাজে করা হয়। এই নিয়ামতের শোকর করা দরকার। আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে ও কেতাবী আইনের মাধেমে যে মহাবার্তা (মহাভারত) মহামূল্যবান হিতোপদেশ দান করেছেন তা অমৃতোপম। কাশীদাস নয় কাবার প্রভুর দাস হয়রত মোহাম্মাদ (সঃ) তা বারবার বলেও গেছেন। কেতাব, হিকমত সুন্নাহকে তাই সমুন্নত রাখা সাধুদের জন্য জরুরী। কেবলা যাদের কাবা এবং কাবার প্রভুর যারা ভক্ত তাদের আল্লাকে, আল্লার আইনকে মর্যাদা দান করা উচিত। সাধুরা সে কাজ করছে কি করছেনা তা আল্লার অগোচরে থাকবে না। সীমলংঘন করলে আল্লার শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা।

৩০ রুকূ

২৩২. তোমরা তোমাদের সাধ্বী সতীদের তালাক দেওয়ার পর তারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করে দেয় তখন তারা সর্বজনপরিচিত পন্থায় প্রস্তাবিত সাথীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হলে তাতে বাধা দিয়ো না। আল্লাহ ও আখেরাত যাদের লক্ষ্য তাদের জন্য এই উপদেশ। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধচিত্ততার ও সাধুতার পথ। আল্লাহ জানেন, তোমারা জাননা। ২৩৩. যে জনক চায় যে তার সন্তানের জননী দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ করুক সেক্ষেত্রে জননীরা দু'বছর স্বীয় সন্তানদের দুধ পান করাবে। জনকদের এমতাবস্থায় জননীদের খোরপোষাক দিতে হবে কিন্তু কারও উপর তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপানো যাবেনা। সন্তানের জন্য মাকেও কষ্ট দেওয়া যাবেনা, বাপকেও কষ্ট দেওয়া যাবেনা। দুধদানকারিনীর যেমন অধিকার রয়েছে সন্তানের বাপের উপর তেমনি তার ওয়ারিশদের উপরও কিন্তু যদি উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মতিক্রমে দুধ

ছাড়াতে চায় তাহলেও কোন গোনাহ হবেনা। যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাও তাতেও ক্ষতি নেই তবে এজন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে বিনিময় আদায় করতে হবে। আল্লাকে ভয় করো এবং জেনে রাখো সবকিছুর উপর তার নজর রয়েছে। ২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের জীবিত রেখে মারা যায় তাদের জন্য চার মাস দশদিন বিবাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। চারমাস দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তারা স্বাধীনভাবে প্রচলিত পন্থায় জীবনযাপন করতে পারে। এতে তোমাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সকলের কাজকারবার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ২৩৫. ইদ্দতকালে বিধবাদের বিয়ে করার ইচ্ছা গোপনে অথবা ইংগিতে প্রকাশ করলে দোষ নেই। আল্লাহ জানেন তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই কিন্তু কোন গোপনচুক্তি করোনা যা করো প্রচলিত প্রকাশ্য পন্থায় করো তবে ইদ্দত পূর্ণ না হলে বিয়ে করোনা। ভালভাবে জেনো রাখে আল্লাহ তোমাদের মনের খবরও জানেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং মনে রেখো আল্লাহ গাফুরুর হালীম (ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল)।

নোট

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া প্রথম পতির উচিত নয়। এটা সততার পরিপন্থী। এই মনস্তাত্বিক দূর্বলতা থেকে সেই সাধুসমাজের বেঁচে থাকা উচিত আল্লাহ ও পরকাল যাদের লক্ষ্য। এ সাধুতার, শুদ্ধচিত্ততার উচ্চতম মার্গ। বিয়ে করে আল্লার তাকওয়া রক্ষার জন্য ছেড়ে দেওয়া আবার তাকে অন্যত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে দেখেও বাধা না দেওয়া মনকে এতদূর উচ্চমার্গে তোলা বিয়ে না করার থেকে অনেক কঠিন বড় কাজ।

দাম্পত্যজীবনের ফসল হচ্ছে সন্তান। দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুর্বল। তার অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহপাক সর্বাধিক সচেতন। তার দু'বছর দুধপানের অধিকার রয়েছে। দুধপানের মূল্য দিতে হবে পুরুষকে। সন্তানের জন্য পিতামাতা কাউকে তাদের দাম্পত্য জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। মা অন্যত্র বিয়ে করেও পূর্বপতির সন্তানের দুধপানকারিনী হতে পারে তবে সেজন্য সে সংগত মূল্য পাবার অধিকারী হবে সন্তানের পিতা কিংবা তার অংশীদারদের কাছে থেকে। যদি উভয় পক্ষ রাজী হয় তাহলে ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে। দুধ-মা রাখা যেতে পারে তবে মূল্যবহন করতে হবে পিতৃপক্ষকে। পুরুষের যেমন দাম্পত্যজীবনে প্রাধিকার ছিল তেমনি তার দায়িত্ব বেশী দেওয়া হয়েছে। নারীর দায়িত্ব ছিল কম কারণ সে দুর্বল ছিল। তাই তার উপর সন্তানের দায়িত্বের বোঝা চাপান হয়নি। উভয়ের মধ্যে সমতার নীতি বজায় রাখা হয়েছে। আল্লাহ সবল দুর্বল সকলের প্রতি দৃষ্টিমান।

সমাজের মধ্যে শিশুরা যেমন দুর্বল তেমনি দুর্বল স্বামীপরিত্যক্তা ও বিধবারা। স্বামী

পরিত্যাক্তদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, স্বামী-পরিত্যক্তাদের শিশুদের কথাও বলে হয়েছে। শিশুসন্তানের জন্য অধীরা মাকে তার সন্তান তার কোলে রেখে বাপের পয়সায় মানুষ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যেকোন ছেলের দুধমা হবার অধিকার যেমন মেয়েদের আছে তেমনি পূর্ব-পতির সন্তানের দুধ-মা হবার অধিকার তাকে দেওয়া হয়েছে। আবার এতে যদি তার নব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা হয় তাহলে পূর্ব পতির সাথে চুক্তিক্রমে সন্তানকে অন্য দুধ-মার কোলে রেখে সে চলে যাবার অধিকারও রাখে। বাপও তাকেও রাখতে পারে দুধ-মা হিসাবে আবার তাকে বাদ দিয়ে অন্যকেও রাখতে পারে তবে প্রাধিকার তার কিন্তু কেউ যেন কাউকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা না রাখে বরং একে অপরকে অধিকতর উদারতা প্রদর্শন করে। শুধু উভয় লিঙ্গের মধ্যে আদল-ইনসাফ নয়, কোমলতাপূর্ণ ব্যবহারের, অপরকে অধিকতর কল্যাণ পৌঁছাবার কি সুন্দরতম উপদেশ! এই হল মাওয়ায়েজ বা মহা হিতোপদেশ, মহাবার্তা (মহাভারত) বা মহাবাণী (A great Message).

যেখানে শিশুহত্যা, শিশুমেধ ছিল বৈদিক কালচার সেখানে শিশুর জন্য, নারীর জন্য, মা ও সন্তানের জন্য কত ন্যায়-নিরপেক্ষ বিধান। মায়ের জন্য ছেলে অথবা ছেলের জন্য মা কাকেও কোরবানী করা হয়নি। বৈদিক সমাজে বিধবাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তাকে পতির সাথে পুড়িয়ে মারা হতো। তার বাঁচার অধিকার ছিলনা। যে সহমরণ থেকে বেঁচে যেতো সে মরার থেকেও কঠিন জ্যান্তমড়া হয়ে থাকতো। তার ভাল খাওয়াপরার অধিকার ছিলনা। সমাজে তাকে বলা হতো বেহুলা বা অভিশপ্ত। তার মুখ দেখলে পাপ হতো। তাকে বিয়ে-শাদীতে আমন্ত্রণ করা হতোনা। কোন উৎসব আয়োজনে তার অধিকার ছিলনা। পুনর্বিবাহের তো কোন প্রশ্নই ছিলনা কিন্তু গোপনে নরপশুরা ঝি-চাকরানী করে ভোগ করতে ছাড়তো না। তাকে স্বামী পুত্রহীনা অবীরা বা কল্যাণশুন্যা করে রাখা হতো।

কোরান এই বৈদিক নীতি বদলে দেয়। স্বামীর মৃত্যুর চারমাস দশ দিনের পর সে স্বাধীন। তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাবও দেওয়া যায় তবে বিয়ে হবে পূর্বোক্ত সময়-সীমার পর। বিধবাকে অপয়া জ্ঞানে কেউ বিয়ে করতোনা। এখানে সাধুসমাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে তাকে বিয়ে করার কিন্তু গোপনে মধুপান করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আজও বৈদিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। এই মানসিক বৈকল্য বা কৈবল্য আল্লার অজানা থাকবে না। তাই আল্লার আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কাজ করতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহ আইন ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে কঠোর হলেও আইনমান্যকারীদের প্রতি হালীম বা সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি তাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন।

৩১ রুকূ

২৩৬. মোহরাণা নির্ধারণ কিংবা গোপনবাসের পূর্বেই যদি বধূকে তালাক দেওয়া হয় তাহলে তাতে দোষ বর্তাবেনা কিন্তু এমতাবস্থায় সম্মানসূচক কিছু উপহার প্রদান

করতে হবে স্বচ্ছল ব্যক্তিকে তার মর্যাদার অনুরূপ আর অসচ্ছল ব্যক্তিকে তার সংস্থান অনুযায়ী এই সাধুতা বা ভদ্রতা প্রদর্শন করতে হবে। মোহসীনদের উপর এটা একটা বাড়তি দায়িত্ব। ২৩৭. কিন্তু গোপন বাসের পূর্বেই যদি তাদের তালাক দাও অথচ মোহরাণা নির্ধারিত হয়ে গেছে তাহলে অর্ধেক মোহরাণা দিতে হবে। তবে তালাকপ্রাপ্তা যদি নমনীয় নীতি অবলম্বন করে (অর্থাৎ মোহরাণা না নেয়) কিংবা যার হাতে বিয়ের দায় সে যদি উদার হৃদয়ের পরিচয় দেয় (অর্থাৎ সবটাই দিয়ে দেয়) তাহলে তা উত্তম। এটা খোদাকে ভয় করার নীতির সাথে সামঞ্জস্যমূলক। পারস্পরিক ব্যাপারে উদারতার নীতি অবলম্বন করতে ভুলো না। তোমাদের কার্য্যাবলী আল্লাহ দেখছেন। ২৩৮. তোমাদের সালাতগুলোর সংরক্ষণ করো বিশেষ করে সালাতের সার্বিক সৌন্দর্য। আল্লার জন্য দাঁড়াও যেমন নিবেদিতপ্রাণ সেবক দাঁড়ায়। ২৩৯. শত্রুভীতির সময়ে চলন্ত অবস্থায় অথবা যানবাহনে যেভাবেই হোক নামাজ পড়ো আর শান্তির সময় সেভাবে নামাজ পড়ো যেভাবে শেখানো হয়েছে অথচ ইতিপূর্বে এ পদ্ধতি তোমরা জানতে না। ২৪০. তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুর সম্মুখীন হয় আর পিছনে রয়ে যায় বিধবা সতী তাহলে তাদের জন্য কাইয়েমের গৃহে এক বছরের জন্য ভরণপোষণের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত, তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় চলে যায় তাহলে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব নেই, তারা নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পন্থায় যাই করুক না কেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ ২৪১. অনুরূপভাবে তালাকপ্রাপ্তদেরও কিছু না কিছু উপহার দিয়ে বিদায় করা উচিত, আল্লাহ সাধুদের উপর এটা আরোপ করেছেন ২৪২. আল্লাহ এভাবে তার বিধান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পার।

নোট ঃ

পবিত্র কোরান মানবজাতিকে যে সংস্কৃতি দান করেছে তাতে লিঙ্গগত সমতার বিধানই শুধু রাখা হয়নি বরং মহিলাদের বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। মোহরাণা নির্ধারণ কিংবা গোপনবাসের পূর্বেও তালাক দেওয়া যেতে পারে কারণ বিয়ে আসলে পারস্পারিক সন্তোষের উপর নির্ভরশীল। তবে এক্ষেত্রে মহিলার মর্যাদার প্রতি যাতে কোন আঘাত না পড়ে সেজন্যে তাকে উপহার সামগ্রী দান করা উচিত। ভদ্রলোকদের এই ভদ্রতার নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

মোহরাণা ঠিক হয়ে গেছে, বিয়েও হয়ে গেছে কিন্তু বাসর হয়নি এক্ষেত্রেও তালাক

হতে পারে তবে মোহরাণার অর্ধেক দিতে হবে। এই নামমাত্র বিয়ের দরুণ অর্ধেক মোহরাণা প্রাপ্য হলেও ভদ্রতার প্রতিযোগিতায় ভদ্রমহিলা যদি তা ছেড়ে দেয় তাহলে তা হবে উত্তম নীতি। এ হচ্ছে মোহসীনা মহিলার কাজ। পক্ষান্তরে মোহসীন পুরুষ যদি মোহরাণার অর্ধেকের পরিবর্তে সবটাই দিয়ে দেয় তাহলে তা হবে সর্বোত্তম কাজ। এ হোল একে অপরের মধ্যে সাধুতার প্রতিযোগিতা। পারস্পরিক উদারতা একটা বড় গুণ। মানুষের জন্য আইন করা হয়েছে ইনসাফের জন্য কিন্তু ইনসাফের উপর ইহসান অবলম্বন করা উত্তম। এ ধরনের সমাজে নারীবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিতে পারেনা। এ ধরনের মহান সমাজ আমরা গঠন করি কিনা আল্লাহ তা দেখছেন।

মনে সাধুতা না থাকলে, উদারতা সহৃদয়তা মনে বাসা না বাঁধলে কেউ এই বিরাট কাজ করতে পারেনা। এজন্য আল্লার সার্বিক স্মরণে যত্নবান সাধু প্রয়োজন। যে লোকদেখানো নামাজ পড়েছে তার পক্ষে এ সাধুতা প্রদর্শন তো দূরের কথা আদল ইনসাফের দাবীও পূরণ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের উত্তম ব্যবহার তো এমন নামাজীর কাছ থেকে আশা করা যায় যে আল্লাকে নামাজে প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাকে এতটা প্রিয় মনে করে যে আল্লাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অধিকতর কোরবানী প্রদান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। নামাজের মাধ্যমে এই মহৎগুণ অর্জনকারী যুদ্ধের ময়দানে, জীবনমৃত্যুর খেলার সময়ও নামাজ ছাড়তে রাজী হয়না। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পতনযুগে আওরঙ্গজেব আলমগীর এমনটাই করেছিলেন। তাই জিন্দাপীর আখ্যা লাভ করেছিলেন। তাই সর্বাবস্থায় আল্লার সান্নিধ্যলাভে ব্যাকুল থাকতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে অন্তর বাহির আলোকময় হয়ে ওঠে। এতে মানুষ খোদাপ্রদত্ত সব দায়দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষ খোদার প্রকৃত বান্দা বা অনুগত লোক হয়ে যায়।

মৃত্যুর সময় পরিত্যক্ত পত্নীদের সম্পর্কে অসিয়ত করতে বলা হয়েছে যাতে মহিলারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পণ্যে পরিণত না হয়। মৃত্যুর পরে একবছর যাবৎ খাওয়াপরা ও কাইয়েমের গৃহে থাকার অধিকার তার রয়েছে কিন্তু সে যদি পুনরায় বিয়ে করার জন্য চারমাস দশদিন পরে চলে যায় তাহলে সেই বিধবাকে আটক করার কোন অধিকার কারও থাকতে পারে না। এ অধিকার হরণ করলে আল্লার পাকড়াও আসবে কারণ আল্লাহ ক্ষমতাবান ও প্রাজ্ঞ। তালাক প্রাপ্তাদেরও কিছু না কিছু দেওয়া উচিত। মুত্তাকীদের উপর এটা বাড়তি দায়িত্ব, দুর্বলার প্রতি বাড়তি সহৃদয়তা। সংস্কৃতির এই বিস্তৃত বিবরণ এজন্যই তো দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ বিজ্ঞতাপূর্ণ সর্বোত্তম সদাচার প্রদর্শন করে।

যাদের জন্য এত উত্তম হিতোপদেশ দান করা হয়েছে তারা ইহুদীদের ন্যায় এ মহান গ্রন্থ পড়েই না আর যারা পড়ে তারা কেবল আওড়ায়, নামাজ পড়াও প্রদর্শনীমূলক, ত্যাগ কোরবানী তো দূরের কথা মাউনও দিতে চায়না, যাকাত ওসরও না বরং ঈমান বেঁচে দুনিয়া লাভের জন্য হন্যে হয়ে বেড়ায়। এমনকি নিজের পরিবার পরিজনদের প্রতিও সুবিচার তারা করে না। সুতরাং আসমান যমীনে তারা কোথাও সুবিচার পেতে পারে না।

৩২ রুকু

২৪৩. তুমি কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ যারা সংখ্যায় হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে মৃত্যুর ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। আল্লাহ তাদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করেছিলেন। অতঃপর তিনি সে মৃতজাতিকে জীবনদান করেন। আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই করুণাশীল কিন্তু অধিকাংশ লোকই তার করুণাকামী নয়,

২৪৪. (হে সাধুসমাজ) আল্লার পথে সংগ্রাম করো এবং ভালভাবে জ্ঞাত হও আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

২৪৫. তোমাদের মধ্যে কে আল্লাকে করজে হাসানা দিতে তৈরী যা আল্লাহ বর্দ্ধিত আকারে প্রত্যার্পণ করবেন। হ্রাস বৃদ্ধি তো আল্লার হাতে এবং তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. তোমরা কি মুসার পরবর্তী বনি ইসরাঈলী নেতৃত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেছ? তারা তাদের নবীর কাছে বাদশাহী প্রার্থনা করেছিল আল্লার পথে লড়ায়ের জন্য। নবীর জিজ্ঞাসা ছিল হুকুম দিলে তোমরা ভাগবেনা তো? প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিল তাকি হয় আমরা আল্লার পথে লড়বো না যখন আমাদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সন্তানাদি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কিন্তু যখন তাদের লড়াই করার হুকুম দেওয়া হলো তখন তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই সরে পড়লো। আল্লাহ সেই জালেমদের জানেন।

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বললে আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ মনোনীত করেছেন। তারা প্রতিবাদ করে বললো আমাদের উপর তার বাদশাহী করবার অধিকার থাকতে পারেনা বরং আমরা তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকারী। সে তো মালসম্পদেও ঐশ্চর্যশালী নয়। নবী বললেন আল্লাহ তাকেই তোমাদের উপর নির্বাচিত করেছেন এবং তাকে ইলমী ও জিসমানী তাকত দান করেছেন এবং আল্লাহ তার রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করবার অধিকারী। আল্লাহ অত্যন্ত উদার এবং তার সিদ্ধান্তও জ্ঞানময়।

২৪৮. তাদের নবী তাদের বললেন তার বাদশাহীর আমলে তোমরা সেই সাবুত ফিরে পাবে যাতে রয়েছে তোমাদের রবের তরফ থেকে সান্ত্বনার সামগ্রী, মুসা ও হারুনের পরিবারের অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন যা এখন ফেরেশতাদের সংরক্ষণে রয়েছে। যদি তোমরা মোমেন হও এ তোমাদের জন্য দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

নোট ঃ

দানে রুজী বাড়ে, মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়, নামাজে মন প্রশান্তি লাভ করে আর অর্থগৃধ্নুতায় মন মরে যায়, টানাটানি পড়ে যায়। ভয়ের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। জাতি কেবলা হারিয়ে বৈকল্য, বা কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়ে ক্লীব হয়ে যায়। নেতৃত্বহীন এই ভীরু কাপুরুষের দল মৃত্যুর ভয়ে, জালেমের জুলুমের ভয়ে সংখ্যায় হাজার হাজার হওয়া সত্ত্বেও সংগ্রাম করতে পারেনা। ফলে বনী ইসরাঈলীরা মিশরের বাদশাহী হারিয়ে গোলাম হয়। হযরত মুসার নেতৃত্বে তারা মিশর থেকে হিজরত করে ফিলিস্তীনে আসে এবং তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীন দখলের নির্দেশ দিলে তারা জেহাদ করতে রাজী হয়নি তখন আল্লাহ তাদের মৃত জাতিতে পরিণত করেন। পরে এই জাতিকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করেছিলেন হযরত মুসার পর। এই ইতিহাস থেকে মহানবী ও তার অনুচরদের সবক নিতে বলা হয়েছে। তারা উদারতার অভাব ও বখিলতার কারণে নেতৃত্ব হারিয়েছে। তারা এই কর্মনীতির সংশোধন করে পুনরায় নেতৃত্বে হাসিলের জন্য ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও সংগ্রামে করতে রাজী হয়নি। কারণ এতে অধিকতর ত্যাগ ও কোরবানীর ঝুঁকি ছিল। তারা অধিকতর ভোগ্যপণ্যের দাবীদার ছিল। এটা ছিল তাদের অধঃপতনের কারণ। মুসলমানদের এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তারাও মহানবীর নেতৃত্বে হাজার হাজার না হলেও স্বল্পসংখ্যক লোক হিজরত করে এসেছে। তারা যেন জেহাদ ও কোরবানীবিমুখ না হয়। সংস্কার আন্দোলন যেন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে দ্বিধাগ্রস্থ না হয়। কেবলা পবির্তনের অর্থ যেন তারা বোঝে। তারা যেন বনী ইসরাঈলীদের মতো ক্যাবলাকান্ত না হয়। তারা আল্লার রাস্তায় দান করে লড়াই করলে মাতৃভূমি, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও দৌলত সবই লাভ করবে। দুনিয়া তো থাকার জায়গা নয় বরং আল্লার পথে সবকিছু কোরবান করে কামাই করে যাবার জায়গা।

মুসার (আঃ) সময়ের বণী ইসরাঈলদের পর মুসার পরবর্তী বণী ইসরাঈলী নেতৃত্বের নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। নবীর নেতৃত্ব, আল্লার বাদশাহী বা খেলাফত তাদের পছন্দ ছিলনা, তাদের পছন্দ ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের অধীনে তারা লড়াই করবার বায়না ধরেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়েনি। পরিণতি খারাপ হয়েছিল। মুসলমানরা যেন কেবলা পরিবর্তনের পর যুদ্ধের হুকুম প্রাপ্ত হয়ে নবীনেতৃত্বের পরিবর্তে ভিন্নতর নেতৃত্বের কামনা না করে। এটা সর্বনাশের পথ। ইসরাঈলীরা নবীনেতৃত্ব মানেনি, মুসলমানরা মেনেছে, সুতরাং তা যেন মানার মতো মানে। যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে।

বনী ইসরাঈলীরা বাদশাহী চেয়েছিল তাদের মধ্যেকার বড়লোকের, গরীব লোকের নয়। তাই তালুতকে তাদের কথামতো বাদশা বানিয়ে দিতে তারা চটে গেল যেমন হযরত আদমকে (আঃ) খলিফা বানাতে শয়তান চটে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হেমাকত বা আহাম্মুকী বাসা বেঁধেছিল। নেতৃত্বের জন্য ঐশ্চর্য নয়, ইলম বা জ্ঞান, জিসম বা বলিষ্ঠ দেহমন প্রয়োজন। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী ও উদার হওয়ার কারণে গাধাওয়ালা তালুতকে ধনশালীদের উপর

নেতা করে দিয়েছিলেন কিন্তু দৌলতদার গাধারা তা বুঝতে পারেনি। তাই নবী সামুয়েল তাদের কাছে আরেকটা আশাব্যঞ্জক ভাবী প্রত্যাশার বাণী শুনিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে এই যে তারা তাদের হারানো তওরাতের মূল কপি, মুসা হারুণের উত্তরাধিকার তালুতের আমলে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। কাজেই তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে কিন্তু এও নগদ পাওনা ছিলনা, ছিল আগামীতে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মাত্র। বিনা পরীক্ষায় আল্লাহ কাউকে বড় কিছু দেন না।

৩৩ রুকু

২৪৯. তারপর তালুত যখন বাহিনীসহ অগ্রসর হল তখন সে বললো আল্লাহ এক নদীতে তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ পানি পান করবে সে আমার দলে সামিল হতে পারবেনা। যে আমার নির্দেশ মানবে সে আমার দলে থাকবে তবে এক আধটু পান করলে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হবেনা কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ছাড়া সবাই ফেল করলো। অতঃপর তালুত ও তার সাথী অনুগতবাহিনী যখন নদী পার হয়ে গেল তখন তাদের একদল (বড় ব্যর্থ দল) যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য বলে দিল জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই।

কিন্তু যারা আল্লার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিল সেই আল্লাহ পাগল লোকেরা ভিন্নকথা বললো, কতবারই না এমন হয়েছে যে স্বল্পসংখ্যক লোক আল্লার হুকুমে বড় দলের উপর বিজয়লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সংগে থাকেন।

২৫০. অতঃপর তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের মোকাবেলায় বের হলো তখন তারা দোয়া করলো হে আমাদের রব আমাদের সবর দান করো, আমাদের পদদ্বয়কে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর বিজয় দান করো।

২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে কাফেরদের পরাজিত করলো আর দায়ুদ জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ দায়ুদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর সেইসংগে এমনকিছু শিখালেন যা তিনি শেখাতে চাইলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দল দিয়ে আর এক দলকে দমন না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী ফাসাদে ভরে যেতো কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর করুণাশীল।

২৫২. এগুলো সবই আল্লার নিদর্শন যা যথাযথভাবে তোমার নিকট পেশ করা হয়েছে। তুমি রসুলদের (প্রেরিত পুরুষদের) অন্তর্গত।

ব্যাখ্যা

পরীক্ষায় ধনপতির দল ব্যর্থ হলো কেবল স্বল্পসংখ্যক ঈমানাদারদের দলই উত্তীর্ণ হলো। তারা জালুত বাহিনীর প্রতাপ দেখেও ভীত হলোনা, তারা বললো জয়-পরাজয় ধনবল জনবলের ব্যাপার নয় বরং আল্লার ইচ্ছায় ছোট দল বড় দলের উপর বিজয় লাভ করে। এটা ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে। প্রয়োজন আল্লা-অন্তপ্রাণ মুজাহিদ। এই ছোট মুজাহিদবাহিনী সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করে জালুত ও তার বাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হলো আর আল্লার হুকুমে আবার ছোটদল বড়দলের উপর বিজয়লাভ করলো। দায়ুদের হাতে জালুত নিহত হলো। মেষপালক দায়ুদ গাধাওয়ালার জামাই হয়ে রাজ্যের মালিক হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রপরিচালনার জ্ঞান দান করলেন, দান করলেন অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞান। এভাবে আল্লাহ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন অন্যথায় দুষ্টের দলের অত্যাচারে সবকিছু লাণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো। বিশ্ববাসীর উপর আল্লার করুণা রয়েছে বলে এমনটা হয়না অথচ নাদানরা আল্লার কাছে নত হয়ে তার করুণা প্রার্থনা করেনা, তার করুণা পাওয়ার যে তদবীর তিনি বলে দিয়েছেন তবুও তারা তা অনুধাবন ও প্রয়োগ করেনা। নবী রসুলদের কথা শুনতে চায়না। তাদের প্রার্থনামত নেতা পাঠালেও তাকে মানতে চায়না বরং নিজেরাই ধনৈশ্বর্যের কারণে নিজেদের বড় মনে করে জ্ঞানী ও কর্মঠ গরীবদের নেতৃত্ব মেনে নিতে চায়না অতঃপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলেও পরীক্ষায় ফেল করে। তাদের কথাবার্তা হঠকারিতামূলক। তাই কাজের সময় তারা ফেল করে কারণ আল্লার সাথে তাদের সম্পর্ক অল্প। আল্লার সাথে সম্পর্কশীল লোকেরা অল্প হলেও হঠকারী হয়না, নেতার হুকুম তামিল করে। ফলে এই নিম্নশ্রেণী থেকে আল্লাহ পাক যোগ্যতা সম্পন্ন নেতা পয়দা করেন এবং তারা রাষ্ট্রক্ষমতা ও তার পরিচালনার যোগ্যতালাভ করেন। তারা কখনও অহংকারে লিপ্ত হয়না বরং শোকরগোজার হয়।

হযরত তালুত ও দায়ুদের এই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে মহানবী ও তার সংগীসাথীদের বনী ইসরাঈলীদের ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। ইতিহাসের এই ঐশী পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত মহানবীকে শোনান হলো এবং বলা হলো তিনি রসূলদের অন্তর্গত। রসূলরা সংগ্রামী মহানায়ক। তারা ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের জন্য আসেন। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী এই রসূলদের পরিচয় প্রদানের জন্য এর পর থেকে তৃতীয় পারা শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয় পারা যা এখানে শেষ হয়েছে তার নাম ছিল সায়াকুলু। এই ২য় পারা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম বিমুখ ভোগীদের, মুর্খদের অহংসর্বস্ব ভণ্ডসাধুদের যারা কেবল শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা দাবী করে। তাদের এই দাবী তাদের কোন কাজে আসেনি বরং তাদেরকে আরও কলংকিত করেছে। কিন্তু তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন খোদাপরস্ত বিনম্র প্রকৃত নিষ্ঠাবান সংগ্রামী সাধুরা যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তিলকার রসূল হতে তার বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ্য করুন।

সায়াকুলে বণী ইসরাঈলীদের যে যুগের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে দ্বাপর যুগ বা দু-যুগ পরবর্তী যুগ। প্রথম যুগ ইবরাহীম (আঃ) থেকে ইউসুফের (আঃ) যুগ। এটা সত্যযুগ হযরত মুসার (আঃ) যুগ হচ্ছে ত্রেতা যুগ। আর হযরত দায়ুদের (আঃ) যুগ হচ্ছে দ্বাপর বা তৃতীয় যুগ। অতঃপর হযরত মোহাম্মদের (দঃ) যুগ আখেরী যামানা বা কলিযুগ।

৩য় পারা

তিলকার রুসুল

২৫৩) এই রসূলদের একজনকে আর এক জনের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন অবশেষে ঈশা ইবনে মরিয়মকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মা দিয়ে সাহায্য করেছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তাদের পরে তাদের কর্মকাণ্ড দেখার পর লোকেদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের কোন মানে ছিলনা কিন্তু তৎসত্বেও তারা মতবিরোধ করলো কেউ মানলো, কেউ মানলো না এবং আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরের রক্ত পান করতো না কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

নোট ঃ

রসুলরা যামানার বিভ্রান্তি দূর করতে আসেন। প্রকৃত সাধুতা প্রতিষ্ঠা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। যে যুগে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয় তা অপনোদন করার জন্য সেই বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাঁদের পাঠানো হয়। ফলে তাঁরা এক এক বৈশিষ্ট্য লাভ করেন কিন্তু তাদের সকলের মিশন ছিল এক — প্রকৃত সাধুতা শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠা করা। তাই রসূলদের উত্তরাধিকারত্ব লাভকারীদের পারস্পরিক বিরোধের কোন অবকাশই ছিলনা কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসূলদের উম্মতরা তাদের অর্ন্তধানের পরে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে। আল্লাহ চাইলে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে এক রাখতে পারতেন কিন্তু এটা তার নীতি নয়। তিনি মানুষকে ভালমন্দ বাছায়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন, কেতাব ও নবী দিয়ে ভালোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিষ্টকে দিয়ে দুষ্টকে দমন করেছেন। লোক স্বেচ্ছায় আল্লার কেতাব ও নবীদের অনুবর্তী হলে পারস্পরিক মতবিরোধের মীমাংসা না হওয়া এবং তা নিয়ে রক্তপাতের ঘটনা ঘটতে পারতো না কিন্তু লোকেরা কেতাব ও সুন্নার তাবে (অধীন) হতে প্রস্তুত ছিলনা। তারা বাহ্যত কেতাব সুন্নার তাবে হয়ে খোদাপরস্তীর বদলে নফসপরস্তী করে চলছিল। তাই বনী-ইসরাঈলরা নবীর অনুচর হয়েও বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। শেষ নবীর উম্মতও এ থেকে রেহাই পাবেনা যদি না নিষ্ঠাপূর্ণভাবে কেতাব-সুন্নার অনুবর্তী হয়। মানুষকে জোরপূর্বক হেদায়েত দান আল্লাহ কিংবা রসূলদের কাজ নয়।

৩৪ রুকু

আয়াতুল কুরশী বা কিসসা কুর্শীকা

২৫৪) হে ঈমানদারগণ আমি তোমাদের যা কিছু রেজেক দিয়েছি তার থেকে ফেকো সেই দিনটি আসার আগে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না, না বন্ধুত্ব, না সুপারিশ। যে কুফরীর পথ অবলম্বন করে সেই জালেম

২৫৫) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবন্ত চিরতত্ত্বাবধানকারী, তন্দ্রা ও নিন্দ্রা যাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনা। আসমান যমীনের সবকিছুই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করে সাধ্য কার? তিনি তাদের সামনে -পিছনে যা আছে তা জানেন। তাঁর জ্ঞানের যতটুকু তিনি মানুষকে দেন তার বেশী কিছু তো মানুষ পায় না, তাঁর কুরশী আসমান যমীনব্যাপী এবং এগুলোর হেফাজতে তাঁর কোন ক্লান্তি-শ্রান্তি আসেনা। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মহামহিম।

২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তী নেই। সুপথকে কুপথ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অমান্য করে আল্লাকে মান্য করবে সে অবিচ্ছিন্ন মজবুত অবলম্বন পেয়ে যাবে, সে ফাঁসবে না। আল্লাহ তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারীর (অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি) শুনতে পান এবং তাকে চিনতে তাঁর অসুবিধা হয়না।

২৫৭) আল্লাহ মান্যকারীদের অলী (অভিভাবক) তিনি তাদের (অজ্ঞানতার) অন্ধকার থেকে চেতনার (আলোর) দিকে পরিচালিত করেন। যারা অমান্যকারী (আল্লাকে) তাদের আওলিয়া (অভিভাবকবৃন্দ) তাগুত যারা চেতনাহীনতার দিকে পারিচালিত করে অচৈতন্যতার অন্ধকারে ছেড়ে দেয়। তারা নূরের জগত থেকে নারের জগতের বা চির নরক লোকের অধিবাসী হবে।

নোট ঃ

রসূলদের কাজ সংস্কার আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করে মকসুদে মঞ্জিলে পৌঁছে দেওয়া। ৩৩ রুকুতে বলা হয়েছে মহানবী রসূলদের অন্তর্গত। ঈমানদাররা তাকে কেবলা পরিবর্তনকারী রসূল হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর সংগ্রামী তহবিলে অকাতরে অর্থ দান করে ঈমানদারদের এখন প্রমাণ করতে হবে যে বেচাকেনার কাজ তারা যা করবে তা এখানেই করতে হবে, বন্ধুতা ও সুপারিশের ফায়দা এখানেই লভ্য। এখানে সুপরামর্শ

ও সহযোগিতা কার্যকর হবে। আখেরাতের ক্ষেত হচ্ছে এইটা। যা কিছু করার এখানে কর। যে রসূলের নেতৃত্ব মানে না ও তাঁর সহযোগিতা করেনা অথচ রসূল আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নির্দেশে পরিচালিত সেই প্রকৃত জালেম, নিজের ক্ষতিসাধনকারী, ইহকালে সুপথে চালিত নবী যিনি নেয়ামতপ্রাপ্ত তার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহ যিনি চিরজীবন্ত, চির তত্ত্বাবধানকারী যিনি ছাড়া সুনীতি প্রদানকারী কেউ নেই, যিনি সৃষ্টির অতন্দ্র প্রহরী, আসমান-যমীনের অধীশ্বর, যার পরামর্শের প্রয়োজন হয়না যিনি মানুষের হিতাহিত জ্ঞাত, হিতাহিতের জ্ঞান মানুষ তার কাছ থেকে ছাড়া কারও কাছ থেকে লাভ করতে পারেনা, আসমান-যমীনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে যিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত নন সেই মহামহিমের প্রতিনিধি হচ্ছেন মহানবী।

আল্লাহ ডিক্টেটর নন। মতামতের স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োগ করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুপথ ও কুপথকে পৃথক করা হয়েছে। আর্য-ব্রাহ্মণ, ইহুদী-খৃষ্টানরা সত্য-মিথ্যার যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল তাকে সংস্কার করে প্রকৃত দ্বীন পেশ করা হয়েছে দ্বিতীয় পারায়। সংমিশ্রণের মূল উৎস ছিল তাগুত। তাগুত থেকে গাইয়ে বা ভ্রান্তির ভ্রষ্টতা এসেছিল। আল্লাহ তা দূর করে রুশদো বা সুস্পষ্ট সংস্কৃতায়িত সুপথ প্রদান করেছেন। এই সুপথ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া খোদার নীতি নয়। নবীকে সে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁকে বাস্তবে সুপথের পথিক হতে বলা হয়েছে। এখন যে কেউ নবীর মতো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে, তাগুতকে অস্বীকার করে সুস্থ মনে কাবার প্রভু আল্লাহকে, তার সংস্কৃতায়িত জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে সে অত্যন্ত মজবুত অবলম্বন পেয়ে যাবে। স্বয়ং আল্লাহ যার অবলম্বন সে আল্লাহকে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে পেয়ে যাবে। তার প্রার্থনা আল্লার দরবারে গৃহীত হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবেন। আল্লাহর বান্দা যখন প্রদর্শিত পথে সাধুতাপূর্ণ জীবনযাপন করবে তখন সে হঠকারিতামুক্ত হয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মতো জ্ঞানালোকে পথ চলতে পারবে। তার করণীয় কি তা বুঝতে তার অসুবিধা হবে না, কেননা সে কেতাব পড়া লোক, কেতাবের ধারক ও বাহক।

পক্ষান্তরে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা সহজাত জ্ঞান-বিবেকের বিপরীত পথ অবলম্বন করায় সহজাত জ্ঞান-বিবেকও লোপ পায়। অতঃপর শয়তান ও শয়তান প্রভাবিত নফ্সের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেতাব ও সুন্নাহ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে ক্রমাগত বিপর্যয়ের জালে জড়িয়ে পড়ে ইহকালে খতম হয় ও পরকালে নরকানলে দগ্ধীভূত হবে। জ্ঞানহারা, দৃষ্টিহারা হয়ে সে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে। তাগুতকে মানা ও আল্লাহকে মানা লোকের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে পরবর্তী রুকুতে।

রুকু ৩৫

২৫৮) তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা জ্ঞাত নও যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে হুজ্জুত-হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। কেননা আল্লাহ তাকে মুলুক দান করেছিলেন। জবাবে

ইব্রাহীম বলেছিল জীবন-মৃত্যুর মালিক যিনি তিনিই আমার রব। প্রত্যুত্তরে সে বলেছিল জীবন-মৃত্যু আমার হাতে। (পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে) ইব্রাহীম বলেছিল আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। সেই কাফের ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ যালেমদের জ্ঞানের পথ দেখান না।

২৫৯) আর একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ভগ্ন ঘরবাড়ী দেখে (হতাশ হয়ে) বলেছিল, আল্লাহ কিভাবে এ মৃত বসতিকে পুনর্জীবিত করবেন। আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে শতাব্দীকাল মৃত হয়ে পড়ে রইল অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কত দিন পড়েছিলে? জবাব এল একদিন বা তারও কম। বলা হ'ল শতাব্দীকাল তোমার উপর দিয়ে গত হয়ে গেছে। নজর দাও তোমার খাদ্য ও পানীয়ের উপর, তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি অতঃপর দেখ তোমার গাধাকে (তার পাঁজর মাটি হয়ে যাচ্ছে) মানুষের জন্য তোমাকে একটা (বাস্তব) দৃষ্টান্ত করে দিলাম। তারপর দেখ কিভাবে অস্থি-পাঁজরে মাংস-চামড়া গজিয়ে দিই। তখন সে বলে উঠল আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২৬০) স্মরণ করো ইব্রাহীমের ঘটনা যখন সে বলেছিল হে আমার রব আমাকে দেখাও কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করেন। বললেন, 'তুমি কি আস্থা রাখনা? অবশ্যই আস্থা রাখি, কল্বের ইতমিনান বা হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যই (এই আবেদন)। বললেন চারটে পাখী নাও ও তাদের পোষ মানাও এবং তাদের টুকরো সমূহকে এক একটি পাহাড়ের উপরে রাখো, তারপর তাদের ডাকো তারা তোমার কাছে চলে আসবে। ভালভাবে জেনে রাখো আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।

নোট ঃ

ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তর্ক করেছিল সেই নমরুদ বা নারদ (অগ্নিশর্মা) তাগুতকে আউলিয়া বানিয়ে ছিল। তাই তাগুতকে, তার অনুসরণকারীকে রব না বানিয়ে বরং সে সব অস্বীকার করে ইবরাহীম আল্লাহকে রব বানানোয় তেলেবেগুনে জ্বলে গিয়েছিল নারদ। তার হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা আর হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সামান্য প্রজা আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তিও করেন নি। তার সাথে ইবরাহীমের 'রব' নিয়ে বিরোধের কোন মামলা ছিলনা। ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি মেনে নিলে কোন বিপত্তি দেখা দিত না কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ স্বৈরাচারী সম্রাটের দেমাগকে বিগড়ে দিয়েছিল। সে ইবরাহীমের সাথে তাঁর রবকে নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হলো। হযরত ইবরাহীম নক্ষত্রপূজারী ক্ষত্রিয় সম্রাটকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে মেনে নিতে রাজী হলেন না। মুলুকের মালিক নমরূদ ছিল কিন্তু

এটা তো ছিল আল্লার দান। মুলুক আল্লার। আল্লাহ মালেকুল-মুলুক। নমরূদ তাগুতের গোলাম, নক্ষত্র ও নফসের গোলাম হওয়ার কারণে নিজেই নিজেকে ভূদেবতা, ভূপতি ভাবতে শুরু করেছিল অথচ দুদিন আগে তো সে দুনিয়ায় ছিলনা। যে তাকে জীবনদান করলো সে তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেনি। জীবনই এমনি এমনি, রাষ্ট্রই এমনি এমনি সে পেয়েছে। এতে কারও প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই এবং সবাই যখন গ্রহনক্ষত্র ও গ্রহনক্ষত্রপূজারী সম্রাটকে মানে ইবরাহীমের তা মানা উচিত। কিন্তু ইবরাহীম কেবলা পাল্টে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যিনি আমাকে জীবনদান করেছেন, পরিশেষে মৃত্যুও ঘটাবেন তিনিই রব (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা)। নারদ তাতেও নিরস্ত হলো না। সে হঠকারিতা প্রদর্শন করে বললো জীবনমৃত্যু তার হাতে, সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। একথা বলে সে আরও বিপদজালে জড়িয়ে পড়লো। হযরত ইবরাহীম বললেন তোমার সূর্য্যঠাকুর আল্লার হাতের মুঠোয় বন্দী, তুমি তো কোন ছার? হঠবুদ্ধি সব শেষ হয়ে গেল, সে কোন জবাব দিতে পারল না। সে স্বৈরাচারমূলক পন্থা প্রয়োগ করলো। ফলে হযরত ইবরাহীম আল্লার হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমাম হবার সুযোগ পেয়ে গেলেন আর নমরূদের দেশ ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রামণের সম্মুখীন হলো।

হযরত ইবরাহীম জীবনমৃত্যুর মালিককে চিনতে পেরেছিলেন জীবন-মৃত্যুর মালিক মুলুকের মালিক একথাও বুঝেছিলেন, বুঝেছিলেন যমীনের ন্যায় গ্রহনক্ষত্রসহ আসমানের মালিকও আল্লাহ। আল্লাহপাক এভাবে তাকে অজ্ঞতার থেকে বিজ্ঞতার দিকে নিয়ে এলেন এবং নারদ তাগুতের গোলাম হওয়ার জন্য রাষ্ট্রনায়ক হয়েও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেল। বোধের জাগরণ ও বোধের অবলুপ্তি আল্লাহ ও শয়তানের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ঃ দৃষ্টান্তের ব্যক্তি ও বস্তী দুটোই অজানা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা জীবন হরণ করতে তো পারে কিন্তু জীবন দিতে পারেনা। মৃত ব্যক্তি, প্রাণী ও জাতিকে নবজীবন দান করা একান্তভাবে আল্লার আয়ত্তাধীন। মৃত ব্যক্তি নয়, মৃত জাতিকেও আল্লাহ জীবন্ত করেন কিন্তু তাগুতের গোলামরা ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংস করে কিন্তু পুনর্জীবিত করতে পারেনা। আল্লাহ কিভাবে করেন এক নবীর মাধ্যমে তা প্রদর্শন করেন।

হযরত ইবরাহীমের কাছেও জীবনমৃত্যুর রহস্য রহস্যই ছিল। তিনি এ রহস্য অবগত হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। যেহেতু তিনি তাগুতকে অস্বীকার করে চিরজীবিত চিরপ্রতিষ্ঠিতের পথ ধরেছিলেন তাই তিনি এ রহস্যও তার কাছে উন্মোচন করেছিলেন, তিনি নূর প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ অসীম জ্ঞানের মালিক। তাঁর জ্ঞান তিনি যাকে দেন সে পায় আর এ জ্ঞান তিনি তাকে দান করেন যে জানে যে জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ। তাই বান্দা যা জানে না তা জানার জন্য তাঁরই দিকে রুজু হয়। আল্লাহ অজ্ঞাতের মর্মজ্ঞান তাকে দান করেন আর মূর্খকে দান করেন ধনৈশ্বর্য, ক্ষমতা তার বরবাদির জন্য আর জ্ঞানী বান্দাকে দান করেন অধিকতর জ্ঞান অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা ও তার অসারতা উপলব্ধির যোগ্যতা। ফলে সে রাজা হয়েও ফকীর, মানবতার সেবক, রুকু ও সেজদাকারী। পশুপাখীও তার বশ হয়ে যায়। আল্লাই কুরশীর মালিক, কোরেশরা কুরশীর মিথ্যা দাবীদার যেমন মিথ্যা দাবীদার ছিল নমরুদ। তাই মহানবী তথা মোমেনদের সমগ্র ব্যাপারে সম্পর্কে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি সহকারে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে। নমরুদ নয় ইবরাহীম বিজয়ী হয়েছেন। অনুরূপভাবে

কোরেশ নয় কোরেশবিরোধীরা যারা এক আল্লাহর পূজারী তারাই কুরশী পাবে কারণ আল্লাহর কুরশী আসমান-যমীন জুড়ে বিস্তৃত। দুনিয়ার কুরশী তিনি সেই মোমেন বান্দাকে তার খলিফা হবার জন্য দান করেন। বান্দা খেলাফত ছেড়ে মুলুকিয়াতের দিকে গেলে অজ্ঞানতার দিকে পা বাড়ায় এবং আল্লাহ তাকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান যে সে টেরও পায়না।

৩৬ রুকু

২৬১) যারা নিজেদের মাল-সামান আল্লার পথে ফিঁকে দেয় তাদের দৃষ্টান্ত সেই শষ্যবীজের মতো যার সাতটা শীষ বের হয় আর প্রত্যেকটি শীষে একশতটি শষ্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। আল্লাহ মুক্তহস্ত ও মহাজ্ঞানী।

২৬২) যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লার পথে খরচ কোরে দানের ফখর কোরে লোককে কষ্ট দেয়না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবরে কাছে। তাদের জন্য রয়েছে বরাভয়।

২৬৩) যারা পেলনা তাদের প্রতি করুণাসিক্ত হৃদয়জুড়ানো সহানুভূতিসূচক কথা, তাদের কড়া কথায় রুষ্ট না হয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন এমন দান সদকার থেকে ভালো যা মানুষকে পীড়িত করে। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি তো সহনশীল।

২৬৪) হে ঈমানদারগণ তোমাদের দান-খয়রাতের সাথে যেন অনুগ্রহের মর্মজ্বালা না থাকে। এ ধরনের লোকদেখানো দানীরা আল্লাহ ও আখেরাতকে অমান্যকারী। এর দৃষ্টান্ত হলো একটা পাথরখণ্ড যার উপর পানির আস্তরণ ছিল কিন্তু বর্ষণের প্রাবল্যে তা ধুয়ে গেল, রয়ে গেল শুধু পাথরখণ্ড। এ ধরনের ব্যয়ে তকদীর গড়ে না। আল্লাহ কাফেরদের সুপথ প্রদর্শন করেন না।

২৬৫) পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান কোরে নফস-কুশী করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত যেন মনোরম বাগ-বাগিচায় বারিবর্ষণ, প্রবল বর্ষণে দ্বিগুণ ফসল, হালকা বর্ষণেও যথেষ্ট। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা যাচাই করেন।

২৬৬) তোমরা কি পছন্দ করবে এমন বাগান যার নীচে দিয়ে ঝরণা প্রবাহিত হয়, খেজুর-আঙুরে সব রকমের ফলে বাগান পরিপূর্ণ, এহেন অবস্থায় উষ্ণ বায়ুপ্রবাহে বাগান ছারখার হয়ে গেল আর মালিক বৃদ্ধ, ছেলেরা নাবালক। এভাবেই আল্লাহ সবকিছু খোলসা করে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করো।

নোট ঃ

৩৪ রুকুর প্রথমে বলা হয়েছিল দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত যা করবার এখানে করে নাও। আখেরাতে ফসল ফলাবার কোন অবকাশ নেই। এখানে ফসল কর আর আল্লার দিকে পরকালের জন্য ফিঁকে দাও। আল্লাহপাক উদারহৃদয় মুক্তহস্ত তিনি একে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। দান ও উৎসর্গ হতে হবে স্রেফ আল্লার জন্য তাতে নামের বাসনা-কামনা থাকবে না তবেই সে উৎসর্গ ও নিবেদন গৃহীত হবে, প্রতিদান মিলবে। তারা অভয়প্রাপ্ত হবে, বরও পাবে।

সম্পদের আকর্ষণ মানুষকে আল্লাহ থেকে, বান্দা থেকে দূরে রাখে। ধনের এ মোহ ক্ষতিকর। এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে ঐশীপ্রেম ও মানবপ্রেম প্রয়োজন। এজন্য আল্লার প্রেমে কাঞ্চনকে আল্লার রাহে উৎসর্গ করার মনোভাবে পয়দা করতে হবে। এ ধন আল্লার মালের মুখাপেক্ষী বান্দাকে দিতে হবে। আল্লাকে খুশী করার আকাঙ্ক্ষায় । ধন-বৈষম্য হ্রাস করার পথ হচ্ছে ঐশীপ্রেম ও মানবপ্রেম। যাদের দিতে পারা গেলনা অথচ তারা পাবার হকদার তাদের জন্য অপরিসীম দরদ প্রয়োজন। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ক্ষমাপ্রদর্শন ও সহানুভূতি প্রকাশ জরুরী। দানের মাধ্যমে এ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত না হলে সাধুর সবই ব্যর্থ। দাতার ব্যবহারে যদি গ্রহীতার মনক্ষুণ্ণ হয় তাহলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে সখ্যতা ইসলাম চায় তা লাভ হয়না। স্রেফ ধন দান নয় ইসলাম চায় প্রেমদানও। ধনবৈষম্য হ্রাস, মানুষে মানুষে মহব্বত পয়দা করা ও ঐশীপ্রেম জাগ্রত করাই হচ্ছে দানের মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ যিনি সম্পদের আসল মালিক, যাঁর কাছে রয়েছে সম্পদের ভাণ্ডার তিনি তো সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে মানুষ নিজে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হোক আল্লাহপাক এটা চান। মানুষ সংকীর্ণ হৃদয়, দিতে চায়না, তার এই দুর্ব্যবহার নির্বুদ্ধিতা মহান আল্লাহ সহ্য করেন। সহনশীলতা তাঁর গুণ। সম্পদ দান করে মানুষ কল্যাণ লাভের প্রতিযোগিতা না করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হলেও সহসা আযাব দেননা তাদের বোধোদয়ের আশায় নতুবা শাস্তি এসে যেতো।

অনুগ্রহ প্রকাশের অধিকার একমাত্র আল্লার, বান্দার এ অধিকার নেই কারণ সম্পদের আসল মালিক তো আল্লাহ। তাই বান্দা যখন দাতা সেজে পরের ধনে পোদ্দারী করে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রদশনী করে, গ্রহীতার মর্যাদাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে তখন সে আর বান্দা থাকেনা, আল্লাহ হয়ে যায়, আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়। আখেরাত তার লক্ষ্য থাকেনা। তার দানের লক্ষ্য হয় দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা। সে আসলে আল্লাহ ও আখেরাতকে অস্বীকারকারী, অমান্যকারী, দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মোশরেক ব্রাহ্মণ্যবাদী আবুজেহেল। মোল্লাতন্ত্রী মুসল্লীর যাকাত, দান-খয়রাতও এই পর্যায়ের (দ্রষ্টব্য সূরা মাউন বা যৎকিঞ্চিতের তাৎপর্য)। এ ধরনের দানে মানবসমাজের কোন কল্যাণ হয় না। পাথরখণ্ডের উপর পানি বর্ষণে যেমন ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়ে দাঁত বেরোনা পথের হয়ে যায় এক্ষেত্রে রিয়া প্রদর্শনকারী দানীর অবস্থাও অনুরূপ হয়ে যায়। তার মনুষ্যত্বের নেকাব খুলে যায়। এতে দাতার তকদীর গড়ে না, মানবসমাজেরও কল্যাণ হয়না। দানের এই পদ্ধতির ফলেই ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়নি। আল্লার দ্বীন গ্রহণ না করার ফলে তাগুতের এই অনুসারীদের আল্লাহপাক পথ দেখালেন না।

দানের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে নফসকুশী বা আমিত্বের বিলাপ। এ ধরনের দানীকে

জান্নাত বা পাদদেশে প্রবহমান নদী বিশিষ্ট পার্বত্য বাগবাগিচার সাথে তুলনা করা হয়েছে যা ফলভারে নত ও নয়নমোহন। প্রবল বর্ষণে সিক্ত বাগান আরও ডগমগ আরও ঝলমল করে ওঠে। হালকা বর্ষণও যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। যার বাগান থেকে পানি ও ফল-ফলাদি অন্যের কাজে আসে সেই বাগানই উত্তম। মোমেন দানের দ্বারা দুনিয়ায় এ ধরনের জান্নাত বা বাগ-বাগিচা হয়ে যাক আল্লাহপাক এটাই চান। যে নিজেকে এভাবে জান্নাতে বসাবে সে জান্নাত পাবে। এর নাম হলো খয়রাত, কল্যাণ, সদকা, নিজেকে উৎসর্গ করা। এর নাম নহর, আনহার।

এ ধরনের বাগান যেন নফসের গরম বাতাসে ঝলসে না যায় সে সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। দুনিয়ায় শুধু নফসের চাষ করলে আখেরাত ফাঁকা। আর নতুন বাগান পাওয়া যাবেনা আবাদ করার। তাই এখানেই নিজেকে বাগান বানিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

৩৭ রুকু

২৬৭) হে ঈমানদারগণ তোমরা যে পবিত্র অর্থ উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে নির্গত করেছি তা আল্লার পথে খরচ কর, খরচ করার জন্য খারাব জিনিস বাছাই করোনা অথচ ঐ খারাব জিনিসই কেউ যদি তোমাদের দেয় তা নিতে তোমরা রাজী হবে না যদি চোখ বন্ধ করে না নাও। তোমাদের জানা উচিত আল্লাহ গণি (ধনী) ও মহান মর্যাদার মালিক।

২৬৮) শয়তান তোমাদের দারিদ্রের দিকে ডাকে এবং লজ্জাকর কাজের প্ররোচণা দেয়। আল্লাহ তোমাদের ডাকেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের দিকে। আল্লাহ বিশালতার মালিক (বিশাল ভাণ্ডারের অধীশ্বর) ও মহাজ্ঞানী

২৬৯) আল্লাহ যাকে চান জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা দান করেন। যে প্রজ্ঞালাভ করে সে বিরাট কল্যাণ লাভ করে। গভীর চিন্তার অধিকারী প্রজ্ঞাবান জ্ঞানীরাই এসব নিয়ে জ্ঞান-গবেষণায় লিপ্ত হয়।

২৭০) তোমরা যা কিছু ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে খরচ করেছো এবং যা কিছু নজরনিয়াজ মেনেছো নজরানা স্বরূপ তা আল্লার অগোচরে থাকবে না আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা দাও তাও ভালো, আরও ভালো যদি তোমরা গোপনে অভাবীদের দাও। এতে তোমাদের অনেক পাপরাশি মুছে যায়। তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ তার খবর রাখনেওয়ালা

২৭২) মানুষকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার উপরে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করো তা তোমাদের আসল সত্তার জন্য ভালো। তোমরা আল্লার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন স্বার্থে ব্যয় করো না। যারা আল্লাকে রাজী করানোর জন্য ব্যয় করবে আল্লাহ তার পুরো বদলা দেবেন, তোমাদের উপরে জুলুম করা হবে না।

২৭৩) (আল্লাহর নামে প্রদত্ত) অর্থের প্রধান হকদার আল্লার পথে সংগ্রামী নেতা, জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সময় দেবার ফুরসত যার নেই। তাদের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে জাহেলরা তাদের স্বচ্ছল বলে মনে করে কিন্তু (জ্ঞানীরা) তাদের দেখলেই চিনতে পারে, তারা মানুষের পিছনে ঘুরে বেড়ানোর লোক নয়। এই আল্লাহওয়ালাদের পিছনে যে কল্যাণ তোমাদের দান করা হয়েছে তার যা কিছুই খরচ করবে তা আল্লার অজ্ঞাত থাকবে না।

নোট ঃ

মূল কেতাবে যে শব্দ আছে তা হচ্ছে 'তাইয়েবা'। আমরা তার অর্থ করেছি পবিত্র অর্থ। প্রতিদিন নামাযে আমরা আল্লার কাছে নতজানু হয়ে বলি 'আত্তাহিয়াতো, আসসালাতো, আত তাইয়েবাতো'। আমাদের সমস্ত জীবন, আশা-আকাঙ্খা, হালাল উপার্জন আল্লার কাছে নতজানু হয়ে নিবেদন করি। নিবেদনের অর্থ হালাল হতে হবে। অর্থ যদি শোষণ করা হয়, হারাম হয় তাহলে সে অর্থ দান কোরে না আর্থিক সমতা আসবে না সখ্যতা আসবে, না আল্লার রেজামন্দি আসবে। তাই দানের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য 'হালালান তাইয়েবা' বা পবিত্র উপার্জন। এই পবিত্র উপার্জন থেকে যাকাত ও ওশর দিতে হবে। যাকাত ও ওশরের মাল উৎকৃষ্ট হতে হবে। মালের মধ্যে নিকৃষ্ট মাল দেওয়াকে আল্লার হুবে (প্রেমে) দান বলা যাবেনা। আল্লাকে যারা নজরানা হিসাবে নিকৃষ্ট মাল দেয় তারা কতই না নিকৃষ্ট। আল্লাহ এজন্য যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে 'খবিসা'। যারা 'খবিসা' মাল দেয় তারা খব্বিস ছাড়া আর কি হবে? রাবিস থেকে খাবিস শব্দ এসেছে বলে মনে হয়।

আল্লাহ তো কারও মুখাপেক্ষী নন, মালের তো তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন অভাবী মানুষের। অভাবী মানুষের জন্য নিকৃষ্ট মাল আর নিজের জন্য উৎকৃষ্ট মাল আল্লাহপাক পছন্দ করেন না। ৪০ ভাগের এক ভাগ, দশ ভাগের এক ভাগ উৎকৃষ্ট মাল যারা দিতে রাজী হয়না তারা যে খব্বিস তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাকাত-ওশর ও অন্যান্য দান খয়রাত হলো জানমালের নিরাপত্তা। মুসলমানরা যখন এই কর্তব্য অবহেলা করে তখন তারা মহাখব্বিস গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজীর বর্গী বাহিনীর হাতে চল্লিশ নয়, চার ভাগের এক ভাগ চৌথ ও দশভাগের এক ভাগ

সরদেশমুখী দিতে বাধ্য হয়। বৌদ্ধরা এই ভুল করার দরুণ উড়িষ্যার বৈদিক ব্রাহ্মণদের হাতে সর্বস্ব খোয়াতে বাধ্য হয় (দ্রষ্টব্য রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ) আজ মুসলমানরা যে পূজোর চাঁদা দিতে বাধ্য হচ্ছে তা কুফরী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাকাত-ওশর দিয়ে সংগ্রামে না করার ফল।

আল্লাহপাক হামিদ—প্রশংসিত সত্তা। তাঁর সাথে বান্দার আচরণ হওয়া উচিত প্রশংসনীয় আচরণ। ২৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে প্রশংসনীয় আচরণ সদাচার শয়তান পছন্দ করেনা। সে পছন্দ করে কদাচার। পাশের প্রতিবেশী, অভাবী অনটনে মরে মরুক, আল্লার পথের পথিক চুলোয় যাক আমরা হালাল কামাই আর খাই, দিলে কমে যাবে, গরীব হয়ে যাবে শয়তান, খন্নাস, খব্বিস এই অসওয়াসা জাগায়। সে বখিলী ও সঞ্চয়, সূদে খাটানোকে বুদ্ধিমত্তা বলে প্ররোচণা দেয়। যারা এই কদাচার পরিহার করে সদাচারী হয় আল্লাহপাক তাকে তার পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করেই দেবেন না, নেকীও দেবেন কারণ তিনি হামিদ। তাই বান্দার সাথে প্রশংসনীয় আচরণ করতে চান। শয়তান বখিল। তার অনুচররাও বখিল। তাদের খালি ফুরিয়ে যাবার ভয়। তাই উত্তর-দক্ষিণ আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়। সূদে টাকা দেয় তাও রাজনৈতিক গোলামীর স্বার্থে, সূদের হারও কমাতে চায়না, আবার বাচ্চা হলে সব খেয়ে ফুরিয়ে দেবে তাই বাচ্চা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। মেয়ে মানুষকেও এন.জি.ও.-তে পাঠাবার নির্দেশ দেয়। বিয়ে নয়, জেনায় উদ্বুদ্ধ কোরে স্বামী-সন্তানের হাত থেকে তাকে মুক্ত কোরে 'বসে'-র বশীভূত হওয়ার নির্দেশ দেয়। কত লজ্জাকর আচরণ।

পক্ষান্তরে আল্লাহপাকের আচরণ কত মহান! তিনি শোষক নয় এমন সৎ বান্দার সৎ উপার্জন গরীব বান্দাকে দিয়ে তার অভাব মেটান যাতে সে অসামাজিক লজ্জাকর কাজ করতে প্রবুদ্ধ না হয়, যাতে সে উপার্জনের কাজে লাগতে পারে, যাতে সে দেনাগ্রস্ত না হয়। ধনী-গরীবের সহমর্মিতা সহযোগিতার দ্বারা তিনি সামাজিক ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির এমন অদৃশ্য ব্যবস্থা করেন যে ধনীর ধন বেড়ে ক্রমাগত গরীবের পকেট ভরতে থাকে। আল্লাহপাক উদার ও মহাজ্ঞানী হওয়ার জন্য এরূপ হয়। যে খব্বিস হয় না তৈয়েব হয় সেই আসলে আল্লার জ্ঞানে জ্ঞানী। যে আল্লার মহাজ্ঞানকে গ্রহণ কোরে তৈয়েব হয় সে আসলে খয়ের বা কল্যাণ লাভ করে যা শুধু দুনিয়ায় নয় আখেরাতেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মোমেন সমাজবিজ্ঞানীই এই মহাজ্ঞানময় সমাজবিজ্ঞানের নির্দেশ কার্যকর করতে পারে। লোকেরা হেদায়েত না হওয়ার জন্য নিজেদের দায়ী করেনা বরং এজন্য আলেম সমাজকে দায়ী করে। লোকেদের হেদায়েত না হওয়ার জন্য তারা ব্যতীত অপর কেউ দায়ী নয়। আল্লাহ পাপী-তাপীকে খাওয়াবে কিন্তু হেদায়েত দেবেন কেবল পুণ্যবানদের।

বাধ্যতামূলক যাকাত-ওশরের পর যারা আল্লাহকে অতিরিক্ত নজর নিয়াজ দান কোরে তাঁর নেকনজর হাসিলের আশায় সে আরও উত্তম। কিন্তু যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনার দাবী করেও আল্লার এ মহানির্দেশকে উপেক্ষা করে তারা জালেম ছাড়া আর কিছু নয়। তারা আল্লার সাহায্য পাবেনা বরং লাঞ্ছিত ও অভাবগ্রস্ত হতে থাকবে।

প্রকাশ্য ও গোপন উভয় দানই ভালো তবে গোপন দান অধিকতর ভালো কারণ তা

মানসিক সংকীর্ণতা দূর কোরে উদারহৃদয় ও মুক্তহস্ত হবার তওফিক দান করে। আমরা কি করি না করি আল্লাহ তা লক্ষ্য করছেন।

সেবা ও ত্রাণের মৌলপ্রেরণা ধর্মান্তরকরণ বা দলবৃদ্ধি যেন না হয় যেমন আজকাল ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও খৃষ্টান মিশনারীরা করে থাকে। তাদের অনুকরণ করা সুপথপ্রাপ্ত কল্যাণকামীর কাজ নয়। আর্থিক ত্যাগ-কোরবানীর দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করাই হলো আসল উদ্দেশ্য। মৌল প্রেরণা হওয়া উচিত আল্লার নেকনজর লাভ। যে আল্লার নেকনজর লাভের জন্য মুক্তহস্তে খরচ করবে তার পুরাপুরি বদলা সে পাবে। সে গায়েবের আল্লার গায়েবী নির্দেশ অনুযায়ী চলবে সে তার যথাপ্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না। তার আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হবে।

৩৮ রুকু

২৭৪) যারা দিনেরাতে (প্রাকাশ্যে-গোপনে) আল্লার রাস্তায় খরচ করে তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান, তারা ভীতও হবেনা, শংকিতও হবেনা

২৭৫) কিন্তু যারা সূদ খায় তারা কখনও প্রতিষ্ঠিত হবেনা শয়তানের প্ররোচণায় মালের নেশায় অর্থ-পাগল হওয়া ছাড়া। এমনটা হওয়ার কারণ হলো তারা ক্রয়-বিক্রয়কে (ব্যবসাকে) সূদের মতো গণ্য করে অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যে তাঁর রবের প্রদত্ত মহা হিতোপদেশ প্রাপ্ত হবে সে যদি বিরত হয় (হারাম থেকে) তাহলে তা অতীতের ব্যাপার। তার সিদ্ধান্তের ভার আল্লার কিন্তু যে তারপরও এ ধারা অব্যাহত রাখলো সে নরকানলের স্থায়ী বাসিন্দা হবে।

২৭৬) আল্লাহ রিবা বা সূদকে নির্মূল করেন আর সদকাকে (দানখয়রাতকে) উঠতি (উত্থান শক্তি) দান করেন। আল্লাহ কোনও কাফের, পাপাচারীকে পছন্দ করেন না।

২৭৭) অবশ্য যারা ঈমান আনে, সংস্কার সংশোধন করে, নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের তরফ থেকে প্রতিদান এবং তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন দুশ্চিন্তা

২৭৮) হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং বাকি সূদ ছেড়ে দাও যদি তোমরা মোমেন হও, যদি তোমরা না ছাড় তাহলে আল্লাহ ও রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধকে (মাথায়) চাপিয়ে নাও। যদি তোমরা সূদ ছেড়ে দাও তাহলে রশুন (আসল) পাবার অধিকারী হবে। জুলুম করোনা, জুলুমের শিকারও হবেনা

২৭৯) যশুরকে (শোষণে-জীর্ণ-শীর্ণকে) স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও কিন্তু এটা যদি সদকা করে দাও তাহলে তা আরও ভালো যদি তোমরা (হকীকত) জান।

যেদিন তোমরা আল্লার দিকে ফিরে আসবে সেদিনের বিপদাপদ থেকে বাঁচো। সেদিন প্রত্যেকেই তার উপার্জনের ফল (কর্মফল) ভোগ করবে এবং কারও উপর জুলুম করা হবেনা।

নোট ঃ

আল্লার রাস্তায় দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করনেওয়ালারা আল্লার প্রিয় মোহসীন (প্রেমিক) হয়ে যায়। বাংলার হাজী মোহাম্মদ ছিলেন এমনই মোহসীন। কাঞ্চণের সদ্ব্যবহার মানুষকে মানবতার শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যায়। যারা আল্লাকে প্রিয় করে আল্লাও তাদের প্রিয় করেন। প্রেমিকের কোন ভয় থাকেনা প্রেমাস্পদের কাছে। তাই অর্থ মাত্রই অনর্থ নয়, অর্থে পরমার্থও লাভ হয়।

পক্ষান্তরে অর্থ তাদের জন্য অনর্থ হয় যারা তার অপব্যবহার করে রিবা খায় অথচ অর্থ দিয়ে বিররা (নেকী, পরমার্থ) হতে পারতো। বাইয়ুন (বেঁচাকেনা) বিররা (নেকী) রিবা (বদি, পাপ) তাই এক নয়। ব্যবসা ও সূদ দুই পরস্পর বিপরীত জিনিস। একটা হালাল অন্যটা হারাম। হালাল-হারামের পার্থক্য জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় শয়তানের কারণে। সে মানুষকে অর্থগৃধ্নু, অর্থপাগল বানিয়ে দেয়। তার ঈশজ্ঞান, চৈতন্য শক্তি লোপ পায় (দ্রষ্টব্য সর্বগ্রাসী অক্টোপাশ, মওলানা মওদূদীর সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং) তাই কেতাব এসে যাবার পর মহাজনদের পাগলামী পরিহার করা উচিত তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হবেনা, আখেরাতের আদালতে চুড়ান্ত ফয়সালা হবে কিন্তু নির্দেশ আসার পরও যারা ধৃষ্টতা দেখাবে সেই নরশয়তান মহাজনদের জন্য ভয়াল জাহান্নাম নিশ্চিত। বেণে-মহাজনরা জনগণকে জোঁকসম চুষে। তারা মহাজন নয়, হীনজন, পাগল, শকুনি, শাইলক, ভাঁডু দত্ত, হারামখোর।

সূদ বরকতশূন্য। এ জাতিকে অহল্যা, পাষাণমনা কোরে নারীকে করে বেহুলা আর সদকা বা দান-খয়রাত জাতীয় জীবনকে স্বচ্ছল সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্যবসা হল মধ্যম প্রকৃতির যদি যাকাত দেওয়া হয়। আল্লাহর দান পেয়ে যারা উদ্বৃত্ত সম্পদ যাকাত, ওশর ও সাদকায়ে ব্যয় করেনা তারা কাফের বা অকৃতজ্ঞ। যারা সূদ খায় তারা শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, সমাজ বিরোধী, যারা সমাজ বিরোধিতা পরিহার কোরে সামাজিক বিধিনিষেধে আস্থাবান হয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়ে নামাযের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সদাচার বা সমানাধিকার কায়েম করবে ও যাকাতের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সুবিচার কায়েম করবে সেই সদাচারীদের অভয় দান করা হয়েছে, বরেরও (পুরস্কার) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর সূদ নিষিদ্ধ হয়। আসল নিয়ে সূদ ছেড়ে দিতে বলা হয় অন্যথায় ইসলামী রাষ্ট্রের আইন তার বিরুদ্ধে যাবে। সূদ হচ্ছে জুলুম। এই জুলুমের প্রতিকার হচ্ছে আইনী প্রতিরোধ ও সাজা। আসল দিতেও অস্বচ্ছলকে অবকাশ দিতে বলা হয়েছে। আসলও মাফ করে দিলে আরও ভালো। এসবই হল আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম। কদাচার থেকে

বেঁচে থাকলে মানুষ কেয়ামতে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে যাবে। আর কদাচার পরিহার করে সদাচার করলে শুধু বেঁচে যাবে না পুরস্কৃতও হবে। আর্থিক অনাচার থেকে বাঁচার সুন্দরতম পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এখানে। এরই ভিত্তিতে অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হকের আমলে ঋণ সালিশী-বোর্ড গঠিত হয়।

৩৯ রুকু

২৮২) হে ঈমানদারগণ পারস্পরিক মেয়াদী ঋণের দলিল লিখিত হওয়া উচিত। আদল-ইনসাফ সহকারে দলিল লিখিত হতে হবে। আল্লাহ যাকে লেখার যোগ্যতা দিয়েছেন সে লিখবে। ঋণগ্রহীতা লেখার বিষয়গুলো বলে দেবে। আর আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে। যা চুক্তি হয়েছে তার যেন খেলাফ করা না হয়। কিন্তু দেনাদার যদি বুদ্ধিহীন অথবা কম বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, লেখার বিষয় বলতে অক্ষম হয় তাহলে তার গার্জেন ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দুজন সাক্ষী রাখ। আর দুজন পুরুষ না মেলে তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী হলেও চলবে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষী এমন লোকদের মধ্যে হতে হবে যারা সাক্ষী হিসাবে লোকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা রাখে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হলে তারা যেন তা অস্বীকার না করে। ছোট বড় যাই হোক মেয়াদী ঋণের দলিল লেখার ক্ষেত্রে গড়িমসি কোরো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এটাই অধিকতর ইনসাফমূলক পদ্ধতি। এতে সাক্ষ্য প্রমাণ করা সহজ হয়। সংশয়-সন্দেহের বিপদ কম হয়, তবে নগদ ব্যবসায়িক লেনদেন না লিখলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্যবসায়িক চুক্তির সাক্ষী রাখ। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিও না। নিশ্চয়ই এসব গোনাহর কাজ। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদের সদাচার শিক্ষা দেন। তিনি সবকিছুই জানেন। ২৮৩) মুসাফির অবস্থায় দলিল লেখার জন্য লেখক না পাওয়া যায় তাহলে বন্ধক রেখে কাজ নাও। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অন্যের উপরে আস্থা রেখে কাজ করে তাহলে আস্থাভাজন ব্যক্তি যেন তার আমানতদারী রক্ষা করে ও আল্লাহকে ভয় করে। সাক্ষ্য গোপন কোরোনা। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয় কলুষিত। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত।

নোট ঃ

পূর্বেই বলেছি সাধু-সন্ন্যাসীরা কামিনী আর কাঞ্চনকে ভয় করে। সেজন্যে সংসার

সমরাঙ্গণে তারা দৃঢ়পদে প্রবেশ করতে পারে না। দানে ধন বাড়ে, সূদে ধন কমে। সূদের ফলেই সমাজ তাবাহ্ বরবাদ হয়ে যায়। ব্যবসায় সমাজের কল্যাণ হয় যদি তা থেকে যাকাত ও অন্যান্য দান খয়রাত বের করা হয়। উদ্বৃত্ত অর্থে দান করা, ব্যবসা করা বৈধ। কিন্তু সূদে দেওয়া বৈধ নয়। অর্থ বিনাসূদে ঋণ দেওয়া একটা ভালো কাজ। এর খারাবী দূর করার জন্য লিখিত দলিল ও সাক্ষী থাকলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবেনা। তাই দলিলের লেখক ও সাক্ষী হতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি একটা দ্বিপাক্ষিক আমানত। মানব সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার এটা একটা বন্ধন। এ বিবাহবন্ধনের মত পবিত্র। এ তাই ইবাদত, নিছক বেণে ব্যাপার নয়। চুক্তির শর্ত হতে হবে ন্যায়ভিত্তিক। যাদের ন্যায়বোধ দুর্বল তাদের গার্জেন থাকা আবশ্যক। চুক্তির সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষীদের একজন অন্তত পুরুষ হতে হবে। যাকে তাকে সাক্ষী করা যাবে না। সমাজে তার সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। সাক্ষীকে কষ্ট দেওয়া একটা সামাজিক অপরাধ। দলিল লিখতে কাল হরণ করা উচিত নয়। ব্যবসায়িক দলিল অবশ্যই লিখিত হতে হবে। মেয়েছেলেরাও সাক্ষী হতে পারে, তবে সেখানে দুজন মহিলা প্রয়োজন। সতর্কতার কারণে এই বিধি। মহিলাদের মর্যাদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। লেখক ও সাক্ষী সমাজের বন্ধু। তাদের যেমন কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাদেরও তেমনি লিখতে ও সাক্ষী দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়।

মানুষ অতি সাধুতা দেখাতে অবশেষে লেনদেনের দলিল করতে চায় না। লেনদেনের দলিল করাতে চায় না। আবার পরে অতি বদমাশির আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে। তাই দলিল লেখার উপর এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে ঝামেলা না হয়। বন্ধকী ঋণও খারাপ নয়। আমানতে খেয়ানত করা উচিত নয়। সাক্ষ্য গোপন করাও উচিত নয়। এটা গোনাহ। আল্লাহ গোনাহগারদের পছন্দ করেন না। খোদাপ্রদত্ত আর্থিক বিধিনিষেধ তাকওয়া সহকারে মেনে চললে গোনাহ্ তো হবেই না বরং নেকী হবে। ব্রাহ্মণ বেণেরা ধর্মকে ব্যবসা বানিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহপাক ব্যবসাকেই ধর্ম বানিয়ে দিলেন। মূল্যবোধের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেল।

৪০ রুকু

২৮৪) আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে একথা মান কি মাননা তার হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। যাকে ইচ্ছা আযাব দেবেন। তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার মালিক। ২৮৫) রসূল তাঁর রবের তরফ থেকে যাকিছু তাঁর উপর নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে মোমিনরাও। তারা সবাই আল্লাহকে ফেরেশতাদেরকে কিতাবসমূহকে ও রসূল সমূহকে মনে প্রাণে মানে। তারা বলে আমরা এক রসূলকে অন্য রসূল থেকে পৃথক করিনা। তারা আরো বলেছে আমরা শুনেছি, আনুগত্য প্রকাশ করেছি।

হে আমাদের রব আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কারো উপর ক্ষমতার অধিক বোঝা চাপান না। সে যা (ভালাই) কামাই করবে তার আর সে যা (মন্দ) কামাই করবে তাও তার। হে আমাদের রব যেসব গোনাহ খাতা আমরা করে ফেলি তুমি ধরো না। তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না যা আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। সে বোঝাও আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়োনা যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের উপর সদয় হন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা। কাফেরদের মুকাবেলায় আপনি আমাদের মদদ করুন।

নোট ঃ

আসমান জমীনের রব আল্লাহ। তিনি সবকিছুর মালিক। মানুষ একথা গভীর আন্তরিকতা সহকারে মেনে তার দাবী পূরণ করে কিনা তার হিসাব দিতে হবে। যে মানবে সে বেঁচে যাবে। সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যে মানবে না সে সাজা প্রাপ্ত হবে। তিনি সর্বশক্তিমান। পাপীরা তাই বাঁচতে পারবেনা। গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক পাপাচারীরা, ক্ষত্রিয়রা দুনিয়ায় বড় স্বেচ্ছাচারী হয়, ক্ষমতার দাপট দেখায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মাছিবৎ মারা পড়বে। তারা আল্লাহর বিকল্প সেজে যজ্ঞশালা থেকে, মেলা থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত জনগণের উপর ধর্মের নামে, ন্যায়-সত্যের নামে ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছিল। তাদের বোঝার চাপে মানুষ 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছেড়ে ছিল। কিন্তু আল্লাহপাক মানুষের উপর বড় করুণাসিক্ত। তিনি মোশরেক ইহুদীদের কদাচারের বোঝা দূর কোরে সদাচারের কত সহজ পন্থা বলে দিলেন। আগে রামের পাপে শ্যামকে দণ্ড দেওয়া হত। এখন আর তা হবে না, দুনিয়াতেও না, পরকালেও না। যার পাপ তাকেই পাকড়াও করা হবে, গুষ্ঠিসুদ্ধকে পাকড়াও করা হবে না। যতটুকু অপরাধ ততটুকুই শাস্তি দেওয়া হবে। লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হবেনা। কর্মফল বংশানুক্রমে হবে না। তিনি অপরাধের সঠিক পরিমাপ করা ও সঠিক শাস্তিদানের দিক থেকে অতুলনীয়। তিনি অনুগত বান্দার পাপরাশি উপেক্ষা করতেও উদার হৃদয়। পাপ থেকে কেউ মুক্ত নয়। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের অসীম ক্ষমতা তার আছে।

রসূল আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী বান্দা হওয়া সত্বেও আল্লাহর সব নির্দেশের অনুগত, অনুগত রসূলকে মান্যকারী সব মোমেন বান্দারা। এক আল্লাহকে মানা, তার ফেরেশতাসমূহ, কেতাবসমূহ ও রসূলসমহূকে মানার ব্যাপারে তারা অগ্রবর্তী। তারা এক রসূলকে মানে, অন্যরসূলকে মানে না এমন নয়। ব্রহ্মা থেকে মহম্মদ সব রসূলকে তারা মানে। তারা ঐশী উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতাকে বহনকারী, বিভিন্ন যুগের রসূলদের সুন্নাহ বা সদাচারের অনুসারী। কোন যুগের বেদাহ বা কদাচারের অনুসরণ তারা করে না। তারা

বাকারা বা গোপূজা, পশু পুজা, লিঙ্গ পূজা, বৃক্ষ পূজা, নর পূজা, দেশ পূজা কোন বেদাহকেই প্রশ্রয় দেয় না। কারণ সব বেদাহ হচ্ছে দালালা বা পথভ্রষ্টতা। আর পথভ্রষ্টতার পথ চলে গেছে নরকলোকে। তারা ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান ঈসা ও মুহাম্মাদের সুন্নাহ (এক আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কেতাব, রসূলদের) মান্যকারী। তারা ইঠকারী নয়, বেদাতী নয়। বৈদিক অবিবাহিত সন্ন্যাসী নয়, ক্ষত্রিয়ের উপদেষ্টা, কু-মন্ত্রণাদাতা নয়। কেতাব ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে বেদাহভিত্তিক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচনাকারী নয় যা কুটিল মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শয়তানের কুমন্ত্রণায় লিখিত বেদাহ ও মনুসংহিতার মান্যকারী নয়, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে বিভেদকারী নয়, সব দেশের সব কালের সব সদাচারীদের সাথে তারা একাত্মতা প্রকাশকারী। এতবড় ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও তারা অহংকারী নয় বরং সদাবিনীত ক্ষমাপ্রার্থনকারী, সদাশিব। সনাতন ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকারীরা পূর্ববর্তীদের উপর প্রধান্য দাবী করে না। বরং নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভেবে কম্পমান এবং ক্ষমাপ্রার্থনায় রত। তারা পূর্ববর্তীদের প্রাধান্য স্বীকারকারী। মহানবী স্বয়ং বার বার বলেছেন, আমাকে ইউসুফ, মুসা, ইউনুসের সাথে তুলনা কোরো না। আমাকে তাদের বড় বল না। তিনি তো ইব্রাহিম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী রসূলের অনুসরণকারী। তিনি কোন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেননি। তাঁর অনুসরণকারীরাও এ দাবী করেনি যে, তারা ইব্রাহিমের, মুসা, ঈসার অনুসরণকারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের যে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল সে কঠিন পরীক্ষায় তাদের না ফেলা হয় সেই আর্জি পেশ করতেই তারা ব্যস্ত ছিল। তাদের আবেদন—আমাদের জন্য পরীক্ষা সহজ করা হোক, সাধ্যমত সহজে উত্তরণযোগ্য পরীক্ষা নেওয়া হোক। আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হয়ে কনসেসন প্রদান করুন, প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন, করুণা করুন, কেতাব-সুন্নাহর পথে ধরে রাখুন। শয়তানের কাব্যকবিতা বেদ-পুরাণ, নোভেল-নাটক, উপন্যাসের বানোয়াট চরিত্র অনুসরণকারী তথাকথিত আধ্যাত্মিক নেতা ও শাসকদের চাপ থেকে রক্ষা করুন, তাদের মুকাবেলায় সংগ্রামের ময়দানে টিকে থাকার যোগ্যতা দান করুন। এ যালেমদের মুকাবেলা তারা করতে অক্ষম। তাই তারা মহাশক্তিশালী রক্ষাকর্তার কাছে আবেদন জানায় তিনি যেন এই যালেমদের মুকবিলায় তাদের সাহায্য করেন। তারা নিজস্ব ক্ষমতায় মোকাবিলা করতে অক্ষম। পূণ্যবলে স্বর্গেও যেতেও সক্ষম নয়। তাঁর দয়া ও নেকনজরই ভরসা। তিনি মওলা, খুবই উত্তম মওলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।